“জাল, জুয়োচুরি, মিথ্যেকথা
এই তিন নিয়ে কলিকাতা”

।। শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ।।

সম্পাদনা ও টীকা

কৌশিক মজুমদার

কলিকাতা

শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক ৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন
হইতে প্রকাশিত ও এস পি কমিউনিকেশন দ্বারা মুদ্রিত

কলকাতার রাত্রি রহস্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মেঘনাদ গুপ্ত রচিত

রাতের কলকাতা-র সটীক সংস্করণ

সম্পাদনা ও টীকা

কৌশিক মজুমদার

অলংকরণ

শান্তনু মিত্র

Kolkatar Ratri Rahashya

by

Hemendra Kumar Roy

রাতের কলকাতা © হেমেন্দ্রকুমার রায় পরিবার

সৌজন্যে : সলিল চট্টোপাধ্যায়

টীকা © কৌশিক মজুমদার

প্রথম বুক ফার্ম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ : কৌশিক মজুমদার, কামিল দাস

পেজ লে-আউট : প্রদীপ গরাই

গ্রন্থ সহায়তা : বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

হেমেন্দ্রকুমার গবেষক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়-কে

প্রকাশকের জবাবদিহি

মেঘনাদ গুপ্ত রচিত ‘রাতের কলকাতা’ বইটির সটীক সংস্করণ ‘হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কলকাতার রাত্রি রহস্য’ নামে প্রকাশ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ‘বুক ফার্ম’ প্রকাশনার। মূল বইয়ের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাস বিকৃত করার কোনো অভিপ্রায় আমাদের নেই, তাই এই জবাবদিহি।

দুটি নির্দিষ্ট কারণে ‘বুক ফার্ম’ প্রকাশিত এই বইটি ও তার লেখকের নাম মূল বইটির থেকে আলাদা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, স্বর্গীয় প্রদীপ ভট্টাচার্যর ‘উর্বী প্রকাশন’ থেকে প্রকাশিত মেঘনাদ গুপ্ত-র ‘রাতের কলকাতা’ বইটি (প্রথম প্রকাশ ২০১৫) এখনও পাওয়া যায়। ‘বুক ফার্ম’ প্রকাশিত সটীক সংস্করণের বইটিতে ব্যবহৃত টীকা ও ছবি উর্বী প্রকাশনের বইতে অনুপস্থিত। তাই দুটি পৃথক প্রকাশনীর বইকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে নামের এই পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, গবেষকরা তথ্য ও যুক্তি সহ প্রমাণ করেছেন মেঘনাদ গুপ্ত স্বয়ং সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ছদ্মনাম। সেকারণে ‘বুক ফার্ম’ সংস্করণের বইটির লেখক হিসেবে মেঘনাদ গুপ্ত-র বদলে সরাসরি হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পাঠকরা তাঁদের প্রিয় লেখকের বইটিকে সহজেই চিনে নিতে পারেন।

পরিশেষে ডেল্টা ফার্মা, উর্বী প্রকাশন, কৌশিক মজুমদার, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু মিত্র, কামিল দাস ও পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভূমিকা

আমরা কিছু বই পড়ি বিনোদনের আশায়। কিছু বই পড়া হয় নতুন কিছু জানতে আর বুঝতে। কিন্তু এমনও কিছু বই হয়, যারা বিনোদন জোগানোর ফাঁকেই পুরোনো সব কিছুকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। গতিময় গদ্যের সঙ্গে থাকা সরস ও তথ্যনিষ্ঠ টীকা সেই পাঠকে এক অন্য মাত্রা দেয়। ইনফোটেইনমেন্টের এই ঘরানাটি একদা বাংলায় খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বহু ধ্রুপদি বইয়ের সটীক সংস্করণ সেই বইকে নতুন পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে এবং গবেষণার ক্ষেত্রটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আজ থেকে প্রায় এক-শো বছরেরও বেশি আগের একটা শহর, যার চেহারা, ধরন, জনবিন্যাস, মায় অর্থনীতি আর রাজনীতি আমূল বদলে গেছে, তাকে নিয়ে লেখা একটা বই পড়তে কেমন লাগে? সেই সময় যৌবন আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো একজন মানুষ রাতের কলকাতা, বিশেষত তার 'নিষিদ্ধ' এলাকাগুলোতে ঘুরেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একটি বই লিখেছিলেন। বইয়ের নাম 'রাতের কলকাতা' হলেও লেখক অবভিয়াস ছদ্মনাম নিয়েছিলেন, মেঘনাদ গুপ্ত। বইটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে জানতে চেয়েছেন, কে ছিলেন এই মেঘনাদ গুপ্ত? এমন শক্তিশালী লেখনী যাঁর, তাঁকে কেন আত্মগোপন করতে হয়েছিল ছদ্মনামের আড়ালে? পরে প্রাবন্ধিক ও গবেষকেরা মেঘনাদকে সামনে এনেছেন।

এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে। কিন্তু লেখক স্পষ্ট করেই দিয়েছেন, যখন তিনি 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের আশায় কলকাতার পথেঘাটে নিশিযাপন করেছেন, তখন তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। অর্থাৎ এগুলো ১৯১২-র আগেকার অভিজ্ঞতা! কিন্তু লেখকের বর্ণনা এমনই তীক্ষ্ণধার, ক্ষেত্রবিশেষে সরস, এবং গতিময়, যে পড়তে গেলে মনে হয়, বুঝি-বা গতরাতের রিপোর্ট পড়ছি কোনো ওয়েবপেজে। কে এই লেখক মেঘনাদ গুপ্ত? জানুয়ারি ২০১৫ সালে উর্বী প্রকাশনের প্রথম সংস্করণে সম্পাদক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় যুক্তিজালের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন, এই বইটির লেখক মেঘনাদ গুপ্ত আসলে হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর ছদ্মনাম। যাঁরা হেমেন রায়-কে স্রেফ একজন শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে চেনেন তাঁরা এই বইটি পড়ে আকাশ, বা টেনিদা-র ভাষায় স্পুটনিক থেকে পড়বেন। কিন্তু 'নাচঘর' পত্রিকার রসজ্ঞ সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমারকে যাঁরা চেনেন, এমনকী 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' প্রভৃতি ক্লাসিক পাঠের অভিজ্ঞতা থাকলে শিশু সাহিত্যের রসবেত্তাও এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেবেন এককথায়। ঠিক কী লিখেছেন তিনি? বিষ্ণু বসু-র 'ভূমিকা' আর লেখকের প্রস্তাবনার পর শুরু হয়েছে এই নাতিদীর্ঘ বইয়ের মূল অংশটি। রাতের যেকোনো শহরই দিনের তুলনায় অন্যরকম, এবং কিছুটা বিপজ্জনক। কিন্তু রাতের কলকাতা কতটা অন্যরকম আর কতটা বিপজ্জনক, তা বোঝানোর জন্য লেখক কিছু এলাকা বেছে নিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ পেশ হয়েছে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলোতে— প্রথম দৃশ্য: শহরের সাধারণ ছবি। দ্বিতীয় দৃশ্য: কলকাতার পথ। তৃতীয় দৃশ্য: চীনে-পাড়া। চতুর্থ দৃশ্য: গণিকা পল্লি। পঞ্চম দৃশ্য: নিমতলার শ্মশান। ষষ্ঠ দৃশ্য: হোটেল। সপ্তম দৃশ্য: কলকাতার উৎসব রাত্রি। অষ্টম দৃশ্য: অন্ধকূপের বাসিন্দা। নবম দৃশ্য: রঙ্গালয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শিক্ষিত বাঙালিকে যে মূল্যবোধ তথা নীতিবোধ লালনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার প্রভাবে অনেক জায়গাতেই লেখাগুলোয় অমৃতর তুলনায় গরলের আধিক্য

ঘটেছে। আধুনিক মানসিকতায় এগুলো বদহজমের কারণ হতে পারে। তবে লেখনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই বইয়ে ঘটনার ঘনঘটা আর চরিত্রচিত্রণের চকমকি ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে। সেটি হল পতিতা ও নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য লেখকের আন্তরিক সহানুভূতি। সত্যি বলতে কী, এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ, এবং নানা জায়গায় হওয়া কথোপকথনের একেবারে 'ভার্বাটিম' উদ্ধার, এই দুটি কারণের জন্যই বইটি অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই বইটি পড়তে গিয়ে খুব সমস্যা হয়েছিল। সরস গদ্যে ধরা পড়া বাস্তব জীবনের রোমাঞ্চ চাপা পড়ে যাচ্ছিল স্থান, কাল ও পাত্রদের চিনতে না পারায়। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। 'রাতের কলকাতা' পাঠকের সামনে আসছে নতুন নামে, লেখকের সত্যিকারের নাম বহন করে এবং বিপুল পরিমাণে টীকায় সমৃদ্ধ হয়ে। সেই টীকাগুলো পড়েছি, তাই দায়িত্ব নিয়ে একটা কথা বলতে পারি। কলকাতার অলিগলিতে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস, একটা হারিয়ে যাওয়া সময়, এডওয়ার্ডিয়ান মানসিকতা আর প্রত্যক্ষ বাস্তবের সংঘাতে দীর্ণ এক লেখকের টানাপোড়েন— এগুলো এর চেয়ে ভালোভাবে কম বইই তুলে ধরতে পেরেছে। এই বিশেষ সটীক সংস্করণটি পড়লে আমাদের মনের ভুবন বিস্তৃততর হতে বাধ্য। তাই 'বুক ফার্ম' থেকে প্রকাশিতব্য, ডক্টর কৌশিক মজুমদারের টীকায় সমৃদ্ধ এই বইকে 'এই এক নূতন' বলে স্বাগত জানানোর পরামর্শই দেব আমি।

ঋজু গাঙ্গুলী

সম্পাদকের কথা

হেমেন্দ্রকুমার রায় যে ‘কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য’ একখানা বই লিখেছিলেন, সেটা আমার জানা ছিল না। জানিয়েছিলেন হেমেন্দ্র গবেষক শ্রীদেবাশীষ গুপ্ত। কিন্তু বইটা হাতে নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। উঠল আরও বেশ কিছুদিন পরে, যখন বন্ধু তথা প্রকাশক শান্তনু ঘোষ এক বিশেষ কাজে বইটা আমায় পাঠায়। নাম ‘রাতের কলকাতা’। স্বনামে বইটি লেখেননি লেখক। লিখেছেন ছদ্মনামে। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা টীকা অংশে আছে, তাই শুরুতে আর বললাম না।

পড়তে গিয়ে চমকে উঠলাম। কলকাতার অন্ত্যজ শ্রেণিদের নিয়ে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বা অনিন্দিতা ঘোষের কাজ সুবিদিত। কিন্তু সে নিতান্ত গবেষকের চোখে। একেবারে চোখে দেখা বর্ণনা প্রায় নেই বললেই চলে। উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের শুরুর সময়ে কলকাতার গণিকা, অপরাধ বা পাপের বেসাতির খবর জানার মূল উৎস এখনও বটতলার চটুল বইগুলো, যাদের নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু সে-লেখা নিতান্ত ফিকশন। তাতে সত্য মিথ্যের মিশেল আছে। কিন্তু এই বইখানা একেবারে খাঁটি নন ফিকশন। আর সেখানেই এই বইয়ের গুরুত্ব। হুতোম যেমন উনিশ শতকের কলকাতার দারুণ এক ছবি ফুটিয়েছেন তাঁর নকশায়, এই বইও সেই মর্যাদা পাবার যোগ্য। খুব কাছে হয়তো-বা আসতে পারে ‘সচিত্র গুলজার নগর’, ‘কলিকাতা কমলালয়’ বা ‘পুরাতন পঞ্জিকা’-র মতো বই।

বইটি দেখে যতটা উত্তেজিত হলাম, নিরাশ হলাম প্রায় ততটাই। বইটি বেশ ক্ষীণতনু। শুরুতে দুইখানি ভূমিকা বাদে একটিও টীকা বা প্রয়োজনীয় ছবি নেই। এই বই ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই টীকা এবং ব্যাখ্যা দাবি করে। হেমেন্দ্রকুমার যখন এই বইটি লিখছেন, তখনকার কলকাতা আর আজকের কলকাতা এক নয়। লপেটা, গ্যাসের আলো, ছ্যাকড়া গাড়ি, হেজেলিন, আবু হোসেন শব্দগুলো তখন বাঙালির রোজকার শব্দবন্ধে থাকলেও এখন তারা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। প্রয়োজন মুগাহাটা, গ্যাঁড়াতলা, মালাপাড়া গলি বা চণ্ডুখোরের আস্তানার মতো স্থানের বিস্তারিত আলোচনাও। ঠিক এই কারণে উপযুক্ত টীকা এবং চিত্রসহ বইটিকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে অগ্রজ অরুণ নাগের প্রায় মিথ হয়ে যাওয়া ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’-কে সামনে রেখে প্রায় একলব্যের মতো টীকাদান করে গেছি। যদিও সে এক অসম্ভব উচ্চতা, তবু বড়ো কিছু ভাবতে গেলে বড়োদেরই তো সামনে রাখতে হয়, তাই না? টীকাদানের ক্ষেত্রে যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাদের বিস্তারিত তালিকা এই বইয়ের শেষে দেওয়া হল। ছবির ক্ষেত্রে সুকুমার রচনাবলি থেকে লাইফ ম্যাগাজিন, অসিত পালের বই বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অনলাইন আর্কাইভ, একাধিক সূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একটি অতি দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীসুস্নাত চৌধুরী। বেশ কিছু টীকাতে উল্লেখযোগ্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন রণিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত জানাই বইটির সমস্ত টীকার প্রুফ সংশোধনও তাঁরই করা। প্রচ্ছদ রূপায়ণে সহায়তা করেছেন তরুণ শিল্পী কামিল দাস। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

টীকা দানের ক্ষেত্রে প্রতিটি টীকা যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তাদের আয়তনবৃদ্ধি ঘটে কয়েকটি অণু প্রবন্ধের আকারও নিয়েছে। একইসঙ্গে একেবারে পরিচিত শব্দের টীকা দিয়ে বইটিকে অযথা ভারাক্রান্ত না করার একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা আমার প্রথম থেকেই ছিল। ফলে হরেদরে হাঁটুজল হয়ে বইয়ের আকার খুব বেশি বাড়তে পারেনি। প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে সংগতি রেখে ছবি এঁকেছেন শিল্পী শান্তনু মিত্র। তাঁর আঁকা ছবি এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ।

মেঘনাদ গুপ্ত বা হেমেন্দ্রকুমারের লেখা 'রাতের কলকাতা' এক বিরল শ্রেণির বই। প্রতিটি ভাষায় এমন বই একটি দুটিই লেখা হয়, বা হয়ও না। এ বই প্রায় ফটোগ্রাফের মতো এক-শো বছর আগের কলকাতার রাত্রি রহস্যকে ফুটিয়ে তুলেছে নিখুঁতভাবে। এই অসামান্য বইটির সটীক সংস্করণ পাঠকসমাজে কলকাতা চর্চায় উৎসাহ বাড়ালে এই কাজ সত্যিকার সাফল্য পাবে।

কৌশিক মজুমদার

জানুয়িার, ২০২০

সূচিপত্র

দুটি কথা

আনুমানিক ১৯০০-১৯২৩ সালের কলকাতার প্রেক্ষাপটে শ্রীমেঘনাদ গুপ্ত রচিত করেন 'রাতের কলকাতা'। এই গ্রন্থে বিশ শতকের প্রথম দু-দশকের কলকাতার বিভিন্ন চিত্র যেমন চীনে পাড়া, গুন্ডাজগৎ, ভিক্ষুক জগৎ, নৈশ শ্মশান চিত্র, কফিখানা ও গণিকা জীবনের লেখা লেখনীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। ওই সময়কালে এ ধরনের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রাতের কলকাতার ছবি লেখনীর মাধ্যমে পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টা অবশ্যই লেখকের মানসিক দৃঢ়তা, বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব এবং লেখনীর ক্ষমতার প্রতিফলন। এই বিষয়বস্তুকে নিয়েই পরবর্তীকালে ড পঞ্চানন ঘোষাল ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থাদি লিখেছেন। সেদিক থেকে 'রাতের কলকাতা'কে বাংলায় রচিত এ ধরনের গ্রন্থাদির পথিকৃৎ বলা চলে। প্রথমত, স্বর্গত সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর মতে,

হেমেন্দ্রকুমার রায় মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে *রাতের কলকাতা* নামে একটি বই লিখেছিলেন। কলকাতা শহরের নৈশ জীবনের বাস্তবচিত্র আঁকা হয়েছে। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কারণ অভিভাবকেরা যাতে জানতে না পারেন বইটি তাঁরই লেখা। মেঘনাদ গুপ্ত অবশ্য ছদ্মনামের ছদ্মনাম। হেমেন্দ্রকুমারও ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম হয়তো অনেকেই জানেন না, প্রসাদ রায়।

(সূত্র শতদল গোস্বামী, দেশ, ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৮)

দ্বিতীয়ত, স্বর্গত লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিশু মুখোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছিলেন যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে 'রাতের কলকাতা' রচনা করেন। হেমেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র প্রদ্যোৎকুমার রায় আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পিতার বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন যে হেমেন্দ্রকুমার লেখার খাতিরে Firsthand Information-এর খোঁজে বিশ শতকের প্রথম একটি যষ্টি হাতে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও রাতের কলকাতার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন। আমি নিজেও ওঁর বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষাশৈলী ও ধরনের সঙ্গে রাতের কলকাতার ভাষাশৈলীর প্রচুর সাদৃশ্য পেয়েছি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই পুস্তকটিও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। আশা রাখি, এ গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা তৎকালীন রাতের কলকাতা-র বিচিত্র অন্ধকার জগতের প্রাঞ্জল ও রোমহর্ষক অজানা ছবির সন্ধান পাবেন।

পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়

জানুয়ারি, ২০১৫

সৌজন্যে : উর্বী প্রকাশন প্রকাশিত মেঘনাদ গুপ্তর 'রাতের কলকাতা' বইটির ভূমিকা থেকে সংগৃহীত।

ভূমিকা

রাতের কলকাতা বইখানি হাতে আসে হঠাৎই। এটির কথা আগে শোনা ছিল কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি। গত জানুয়ারিতে ঢাকায় আলাপ হয় হায়াত মামুদের সঙ্গে। তাঁর বিশাল গ্রন্থাগারে পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা এই বইটি ছিল। স্বভাবতই খুব আগ্রহ দেখাই। সেদিন সন্ধ্যাতে আবার দেখা হবার কথা আমার ও হায়াত ভাইয়ের। দেখা হতেই তিনি একটি প্যাকেট তুলে দেন হাতে, খুলে দেখি পুরো বইটির জেরক্স কপি। ব্যাপারটায় স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুলে যাই। সে-রাতেই পড়ে ফেলি বইখানা। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাতের কলকাতার কত ধরনের চেহারা ছিল তারই অতি নিপুণ ও বিশ্বস্ত কিছু ছবি লেখক মেঘনাদ গুপ্ত উপহার দিয়েছিলেন আমাদের পূর্বজদের। মনে হল এ বই বিস্মরণের যোগ্য নয়।

লেখকের ব্যক্তি পরিচয় আমার জানা নেই। আর কোনো বই তিনি লিখেছিলেন কিনা তাও জানি না। দরকারও নেই। কেননা এ বইটি নিজেই স্বপ্রকাশ। শুধু বিস্ময় লাগে কতটা বিপদ ও ঝুঁকি নিয়ে লেখক ঘুরে বেরিয়েছিলেন কলকাতার বিচিত্র মহলে শুধু শহরটির রাতকে নানাভাবে দেখবার জন্য। তাঁর বিচরণের পরিধি গুন্ডাদের আখড়া, গণিকালয় থেকে শুরু করে কলকাতার থিয়েটার পর্যন্ত। এমনকী চীনেপাড়া ও শ্মশানকেও বাদ দেননি তিনি। এবং যেসব চালচিত্র এঁকেছেন বিভিন্ন মহলের তার মধ্যে আছে বস্তুর অনুপুঙ্খতা, গভীর সহৃদয়তা, আবেগদীপ্ত অথচ নিরাসক্ত বর্ণনার পারিপাট্য।

কলকাতা পালটে যাচ্ছে। পুরোনো পাড়ার চেহারা আর নামগুলো ক্রমশ বর্জিত হচ্ছে। হয়তো বা অনিবার্য। তবু মেছোবাজার, রুপোগাছি, চীনেপাড়া প্রভৃতির নাম এখনও তো কলকাতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত। চীনেপাড়াটাই তো আর আগের মতো নেই। 'ক্যান্টন' রেস্টুরেন্ট একসময় বাংলা নানা গল্প উপন্যাস বিশেষ করে গোয়েন্দাকাহিনিতে ঘুরে ফিরে দেখা দিত। এখনও আছে রেস্তরাঁটি কিন্তু হৃতগৌরব দুর্দশাগ্রস্ত দালানটি এখন আর একই সঙ্গে ভীতি ও সম্ভ্রমের সঞ্চার করে না।

বইখানিতে যেমন আছে কিছু রোমহর্ষক বাস্তব ঘটনার রুদ্ধশ্বাস বিচরণ— গণিকালয়ে একজন নিহত ব্যক্তির শবদেহ নিয়ে বিপদে পড়ার উপক্রম অথবা এক ধাপ্পাবাজ বুড়োর কবলে পড়ে ক্ষতবিক্ষত লাশ নিয়ে শ্মশানযাত্রার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা— তেমনি রয়েছে সমাজের যারা উপেক্ষিত অবহেলিত তাদের প্রতি সুগভীর সমবেদনা। সেকালের নাট্যশালার অভ্যন্তরীণ চেহারাটিকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অবিচলিত নৈপুণ্যে।

তিনখানা গ্রাম থেকে একদিন গড়ে উঠেছিল যে মহানগরী তার প্রতি ঘরেতে আছে আলো অন্ধকারের বিচিত্র খেলা। এখনও আছে। তার আলোর দিকে তাকিয়ে দেখি রামমোহন বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনের ইতিবাচক চেহারা, রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী আধিপত্য। আরও বহু মনীষীর নানা ধরনের সৃষ্টিকর্ম। আবার এরই ফাঁকে ফোঁকরে জমে আছে কত ধরনের ক্লেদ রিরংসা ও নিষ্ঠুরতা। দুটি ছবিই যেন এ মহানগরীর পরিপূরক। কলিকাতা কমলালয়, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কলিকাতার লুকোচুরি, কলকাতার হাটহন্দ প্রভৃতি বইতে কলকাতার সমাজচিত্রের যে বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে তারই ধারাবাহিকতায় রয়েছে রাতের কলকাতা। কলকাতা মহানগরীর সামাজিক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।

যদি এ ধরনের প্রকল্প নিয়ে এগোতে চান কেউ তাহলে অবশ্যই তাঁকে উপকরণ জোগাবে অন্য অনেক বইয়ের সঙ্গে মেঘনাদ গুপ্তের লেখা এ বইটি।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হলেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে অনুমান করা চলে লেখক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এ শতকের গোড়ার দশকে। কেননা লেখকের ভাষা অনুযায়ী তখনও কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আজ আমার উপনীত হয়েছি বিশ শতকের উপান্তে। কিন্তু কলকাতার আদত চেহারা খুব একটা পালটেছে কি? পালটালেও তা পরিমাণগত, গুণগত নয়। সম্প্রতি একজন লেখক রাতের কলকাতা-কে অশ্লীল ও বটতলার বই বলে চিহ্নিত করেছেন। বইটি তাঁর পড়া নেই, থাকলে জানতেন তাঁর ধারণা কত ভুল। বইখানি এ ধরনের বহু ভুল ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করবে।

কলকাতা বরাবরই খুব জ্যান্ত নগরী। একে নিন্দা করা যায়, গালাগাল দেওয়া যায়, কিন্তু অবহেলা করা যায় না। কলকাতার ত্রুটি খুঁজে থাকেন বহু দেশি-বিদেশি, আবার ভালোও বাসেন। অনুরাগে বিরাগে মেশানো কলকাতার যে চরিত্র নানাভাবে আমাদের উদবেলিত করে। তারই একটি অতি ক্ষুদ্র প্রকাশ ঘটেছে রাতের কলকাতা বইটিতে। তবে ক্ষুদ্র হলেও বইটি যে তুচ্ছ নয় একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন সকল পাঠক।

বিষ্ণু বসু

এপ্রিল, ১৯৯১

সৌজন্যে : ডেল্টা ফার্মা প্রকাশিত *রাতের কলকাতা* বইটির ভূমিকা থেকে সংগৃহীত।

প্রস্তাবনা

রাতের কলকাতা কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য লিখিত হল।

সেকেলে কলকাতার দৃশ্য আছে হুতোম প্যাঁচার নক্সা[১]-য়। আমার এ বইখানিও নকশা[২] এবং এতে আছে একেলে কলকাতার সময় বিশেষের ছবি। আমার তুলিতে হুতোমের তেমন পাকা রং নেই, লোকের ভালো না লাগাই সম্ভব! ভরসা খালি এইটুকু যে, দুধ না পেলে অনেকে ঘোল খেতেও রাজি আছেন।

আর কিছু না হোক এই নকশা অনেকেরই ছানি-পড়া চোখে অব্যর্থ ঔষধের কাজ করবে। কলকাতার রাত্রি রহস্য সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি যারপরনাই ঝাপসা। রাতের কলকাতা তাঁদের চোখ সাফ করে দেবে। ছেলে-মেয়ের বাপরা বুঝবেন, আসল বিপদ কী এবং কোনখানে। তাঁদেরই অসাবধানতায় কুসংসর্গে পড়ে অপ্রাপ্তবয়স্করা নরকে আসা-যাওয়া করবার সুযোগ পায়।

তবু আমি সম্পূর্ণ ছবি দিইনি। ছবির সবটা আঁকতেও পারতুম, কিন্তু সে সম্পূর্ণতা এমন কল্পনাতীতরূপে ভয়ানক, যে আঁকতে প্রবৃত্তি হল না। অল্প যেটুকু দেখিয়েছি, তাই-ই হয়তো নীতিবাগীশের ধাতে সহ্য হবে না। কী করব, উপায় নেই, আরও রেখে-ঢেকে বলা অসম্ভব। এ শ্রেণির নকশা এর চেয়ে শিষ্ট ভাবে ও শ্লীল ভাষায় লেখা চলে না। তবু আমি হুতোমের চেয়ে সবদিকেই— কী ভাষায় আর কী বিষয়ে— ঢের বেশি সাবধান হয়েছি। আমাকে স্থানীয় আবহাওয়া ফোটাবার জন্য মাঝে মাঝে গ্রাম্য কথাও ব্যবহার করতে ও নরকের পর্দা তুলতে হয়েছে এবং স্থানে স্থানে অল্পস্বল্প আদিরসকেও[৩] একেবারে পরিহার করতে পারিনি। কিন্তু এরকম গ্রাম্য কথা, নরকের দৃশ্য ও আদিরস একালকার উচ্চশ্রেণির কথা-সাহিত্যের মধ্যেও যথেষ্ট আছে— অধিকন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকরা আমার চেয়েও ঢের বেশি অগ্রসর হয়েছেন। আজকালকার উপন্যাস ও থিয়েটারি নাটকগুলির তুলনায় রাতের কলকাতা যে বাইবেলের মতো পবিত্র, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। পাঠক লক্ষ করলে আরও দেখবেন যে, পাপকে আমি পাপ বলেই বরাবর চিনিয়ে দিয়েছি, তার প্রতি সকলের ঘৃণা ও বিরক্তি আকর্ষণেরই চেষ্টা করেছি, আধুনিক অনেক উপন্যাসের মতো পাপের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি উৎপাদনের প্রয়াস এ পুস্তকের কোথাও নেই। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাতের কলকাতা-কে একজন পাঠকও অশ্লীল বলে ভাবতে পারবেন না। এ পুস্তকের কোথাও অন্যায়রূপে অশ্লীলতার সমাবেশে পাঠকের মনকে উত্তেজিত করবার চেষ্টামাত্র নেই।

যেসব ব্যাপার এতে আছে, তার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখেই লেখা হয়েছে। শোনা কথায় নির্ভর করলে আরও অনেক ব্যাপার লেখা যেত, আমি তা করিনি। আমি গোয়েন্দার মতো পথে পথে ঘুরে এইসব বিবরণ সংগ্রহ করেছি এবং গণিকা পল্লির উপাদান সংগ্রহে অনেক প্রথম শ্রেণির 'বিশেষজ্ঞ'-রও সাহায্য পেয়েছি। পাঠকদের মধ্যেও যদি কোনো বিশেষজ্ঞ থাকেন, আশা করি তিনি বিচার করে দেখবেন যে, আমার পরিচিত 'বিশেষজ্ঞ'-দের দেওয়া উপাদানগুলি নির্ভরযোগ্য কিনা! এখনও অগুনতি উপাদান আমার হাতে রইল— যার মধ্যে কলকাতার আরও ঢের বিশেষত্ব আছে। পাঠক সমাজে আগ্রহের সাড়া পেলে সেগুলি নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আবার দেখা দেব।[৪] নইলে এইখানেই ইতি।

মেঘনাদ গুপ্ত[৫]

প্রথম দৃশ্য

শহরের সাধারণ ছবি

কলকাতা!

—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর[১.১], ভারতের সর্বপ্রধান নগর, প্রাচ্যের প্যারি, সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র, বাঙালি গর্বের নিধি, নব-সভ্যতার জন্ম-পীঠ, প্রাসাদকীর্ণ কলকাতা!

দিবারাত্র তার পথে পথে জনতার স্রোত বইছে; মান্ধাতার পালকি[১.২], গোরুর গাড়ি[১.৩] আর মানুষ-গাড়ির[১.৪] পাশে পাশে পরম আধুনিক বৈদ্যুতিক ট্রাম, বাস ও মোটরগাড়ি ছুটছে এবং তার দেহে ছায়া ফেলে আকাশে উড়ছে উড়োজাহাজ; চশমা-নাকে, লপেটা-পায়ে, টেরি-মাথায়, ছড়ি-হাতে কাপুড়ে-বাবু[১.৫]; কালো অঙ্গে ফিটফাট বিলাতি পোশাক 'ইঙ্গ-বঙ্গ' পুঙ্গব; নানান অদ্ভুত আকারের টুপি আর হরেক রকমের জামাকাপড় পরে পারসি, গুজরাটি, মারাঠি, শিখ, পাঠান, কাবুলি, নেপালি, ভুটানি, পাঞ্জাবি, মগ[১.৬], জাপানি, চীনে ও মাড়োয়ারি প্রভৃতি নিখিল প্রাচ্যের মনুষ্য-নমুনা; ইংরেজ, স্কচ, আইরিশ, ফরাসি ও আমেরিকান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির উগ্র মূর্তি আবার সেই সঙ্গে অর্ধনগ্ন উড়িয়া আর পূর্ণনগ্ন নাগা সন্ন্যাসীর দল[১.৭]— মানবতার এমন অপূর্ব জগাখিচুড়ি পৃথিবীর আর কোথাও গেলে চক্ষে পড়বে না! একদিকে বড়ো বড়ো রং-বেরঙের আকাশছোঁয়া অট্টালিকাশ্রেণি, তারই ছায়ায় ছায়ায় হেলে-পড়া, ঘুঁটে দেওয়া মেটে দেয়াল[১.৮] অগণ্য কুঁড়েঘর এ দৃশ্যও অন্যত্র দুর্লভ! রাজপথের একদিকে মূর্তিমান ঐশ্বর্যের মতো শকটারোহী, নির্বিকার, সুসজ্জিত, জগতের দুঃখ-দারিদ্র্যে অচৈতন্য লক্ষ্মীর বরপুত্ররা এবং অন্যদিকে প্রকাশ্য রাস্তার ধুলায় ছেঁড়া কাঁথা পেতে চিরদারিদ্র্যের উপাসক, কোটরগত-চক্ষু, অস্থিচর্মমাত্রসার দীন ভিখারির দল নাভিশ্বাস টানতে টানতে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে আছে— আবার তাদের স্তিমিত নেত্রের সামনে দিয়ে চলেছে সারে সারে ঢাক-ঢোল-ভোঁপু বাজিয়ে, ফুলের গন্ধ বিলিয়ে, কোঁচানো চাদর উড়িয়ে নিশ্চিন্তপ্রাণ বরযাত্রীর দল— নিয়তির এ হেন নির্দয় পরিহাসলীলা আর কোথায় গেলে দেখা যায়? জীবন ও মৃত্যু এখানে একত্রে বাস করে, এক ডালের মধু ও কাঁটার মতো!

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও কলকাতার সম্বন্ধেই বলেছেন—

এই কলিকাতা— কালিকা ক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত।
হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, মুসলমানের মৌলা আলি,
চারি কোণে সাধু পীর চারিজন মুস্কিলাসান চেরাগ জ্বালি।
সকল ধর্ম মিলেছে হেথায় সমন্বয়ের মন্ত্র-সুরে,

স্বাগত সাধক-ভক্ত-বৃন্দ মরতের বৈকুণ্ঠপুরে।[১.৯]

বাস্তবিক, কলকাতাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই মনে হয়, এ নগর সাধুর তীর্থক্ষেত্র, ধার্মিকের সাধন-নিকেতন, পবিত্রতার পুণ্য আশ্রম! হিন্দুর কালী, তারা, মহাদেব, শনি, জগদ্ধাত্রী, জগন্নাথ, শীতলার মন্দির[১.১০], বৌদ্ধের বিহার, জৈনের পরেশনাথ দেবালয়[১.১১], ক্রিশ্চানের গির্জা, মুসলমানের মসজিদ— এর চারিদিকে ধোঁয়ামাখানো আকাশের গায়ে নানা আদর্শের শিল্প বিচিত্র মাথার পর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি পদেই একটি-না-একটি মন্দির ও তার সামনে দলে দলে ভক্তের ভিড় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকালে-সন্ধ্যায় পূজার্চনা, শঙ্খঘণ্টার রোল, ঝমাঝম দর্শনীর ধ্বনি! অধিকাংশ হিন্দু দেব-দেবীরই অবস্থা যে বেশ উন্নত, সেটা মন্দিরের মর্মরমণ্ডিত সুচিকন গৃহতল, দেব-দেবীর সমুজ্জ্বল স্বর্ণালংকার ও সেবাইতদের ভোগপুষ্ট নধর দেহগুলি দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু বাইরেকার এই ধর্মের বর্মের তলায় কত যে অন্যায়, কত যে জঘন্যতা ও যে পাশবিকতা আত্মগোপন করে আছে, তীক্ষ্নদৃষ্টি না থাকলে কেউ তা দেখতে পাবে না! একদিকে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী[১.১২] ও আর একদিকে কালীঘাটের কালিকাদেবী[১.১৩] কলকাতার ঘাঁটি আগলে থাকলে কী হবে তাঁদের দিব্যদৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করে শয়তান তার শত পাপসঙ্গীকে নিয়ে, নিত্যই তো শহরের মধ্যে এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,
বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা!

সেকালে এখানে যেমন বাঘের মতন মানুষ ছিল, একালেও তেমনি মানুষরূপী বাঘের অভাব কলকাতায় নেই। এই সব মানুষ-বাঘের দল এখন বরং বেশি ভারী হয়েছে। তবে এরা বীরত্বে বা তেজে নয়— হিংসায় এবং পশুত্বেই বাঘের মতন। এই বাঘ-বাঘিনির দল সারা কলকাতায় ছড়িয়ে আছে, দিনেদুপুরে দলে দলে তারা আমাদের মধ্যে বিচরণ করছে। শিকারের খোঁজে সর্বদাই ওত পেতে প্রস্তুত হয়ে আছে অদৃশ্য মড়কের মতো! আমরা তাদের চিনি না, তারা কিন্তু আমাদের নাড়ি-নক্ষত্রের সব খবর রাখে নখদর্পণে! রাত্রে যখন কলকাতার বুকের উপরে প্রগাঢ় তিমিরের পর্দা নেমে আসে, এই বাঘ-বাঘিনিরা তখন অতর্কিতে, নানা কৌশলে আমাদের আক্রমণ করে। বনের বাঘ চায় মানুষের রক্ত-মাংস, কিন্তু এরা চায় আমাদের আত্মার সারাংশ! আর, একবার যার আত্মা তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে, আর তার বাঁচোয়া নেই। পল্লিগ্রামের নিশ্চিন্ত-প্রাণ পিতামাতারা আপনাদের সুকুমার মতি সন্তানদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন— মানুষ হবার জন্যে। কিন্তু বাঘ-বাঘিনির পাল্লায় পড়ে প্রায়ই তাদের মনুষ্যত্ব নিঃশেষে নিহত হয় এবং দেশে ফিরে যায় তারা এক একটি আস্ত জানোয়ার বা ভূত হয়ে।

কলকাতার বাইরের চাকচিক্য, শোভা-সৌন্দর্য, আলোক-হাস্য, ধর্মের ভাণ, গির্জা-মন্দির-মসজিদের জটলা দেখে কেউ যেন না ভোলেন। চেরাগের তলাতেই কত জমাট অন্ধকার আছে, আজ আমরা সেই গোপন দৃশ্যেরই কতক কতক খুলে দেখাব। আমরা

সকলে সারাজীবন এই কলকাতার কোলে বসে কাটিয়ে দিই, এই কলকাতার অঙ্কেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের লীলা, কলকাতার বাসিন্দা বলে আমাদের মন গর্বে ও গৌরবে স্ফীত, কিন্তু কলকাতার যথার্থ স্বরূপ আমাদের মধ্যে কয়জনে দেখেছে? কলকাতার এই দুর্গম ও ভয়াবহ প্রাসাদ-অরণ্যে, নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে কয়জন ভ্রমণ করবার সাহস রাখে? আমাদের আশেপাশে নিত্য কত 'রোম্যান্স', কত চিত্তোত্তেজক ঘটনা, কত বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তা দেখবার আগ্রহ কয়জনের আছে? সকালে খবরের কাগজের রিপোর্ট— তার মূল্য কতটুকু? মারাত্মক বিপদ মাথায় নিয়ে, বারংবার গুন্ডার ছুরি এড়িয়ে, 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর 'স্পিরিট' সার্থক করবার জন্যে একাকী আমি, একগাছা ছোটো কিন্তু শক্ত লাঠিমাত্র সম্বল করে, সন্ধ্যা থেকে শেষরাত পর্যন্ত কলকাতার পথে পথে নিশাচরের মতো নিয়মিতরূপে ভ্রমণ করেছি—দুর্নীতির ছোঁয়াচ লাগবার ভয় না রেখে অনেক অস্থানে-কুস্থানে ঢুকতেও ইতস্তত করিনি। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সমস্ত এই ছোটো পুস্তকে ধরবে না। তবে কতক কতক আভাস ও ইঙ্গিত দিয়ে যাব, পাঠকদের ভালো লাগলে, ভবিষ্যতে কলকাতার আরও নানা রূপ সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলকাতার পথ

কলকাতার ধূলিধূসর, ধুম্রমলিন ললাটের উপরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে আসছে।

এই সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয় কলকাতার আসল জীবন। দিনের বেলায় কলকাতার জনঅরণ্যে, কর্মব্যস্ততায় বা কেরানিদের আনাগোনায় এমন কিছু দেখা যায় না, যাতে রহস্যের আভাসমাত্র আসে। সন্ধ্যা থেকেই রহস্যের সূচনা— বিশেষ করে শনিবারের সন্ধ্যায়। পথে পথে তখন একে একে গ্যাসের আলো[২.১] জ্বলে ওঠে, মাথার উপরকার স্তব্ধ আকাশের বুকে কালো রেখা কেটে প্যাঁচার ঝাঁক ঝটপট করে উড়ে যায় এবং অলি-গলির আনাচেকানাচে অন্ধকার থেকে কালো কালো কুৎসিত মুখ উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে। এখন সাধুর বিশ্রামের সময় এবং শয়তানের জাগরণ লগ্ন।

পথে এখন শ্রান্ত কেরানিদের ক্লান্ত মুখ আর দেখা যাচ্ছে না এবং কলকাতার যে-সব পথ দিনের বেলায় লোক আর গাড়ির ভিড়ে শব্দিত ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সে পথগুলি এখন স্থির ও বিজন হয়ে আছে। রাত নয়টার পরে ক্লাইভ স্ট্রিট[২.২], স্ট্র্যান্ড রোড[২.৩], হাইকোর্টের[২.৪] আশেপাশের রাস্তা ও রাধাবাজার[২.৫] ও মুগাঁহাটা[২.৬] প্রভৃতি পল্লিতে গেলে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। আরও একটু রাত হলে এ অঞ্চলে চলতে গেলে গা ছমছম করে ও নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই বুক চমকে ওঠে। কোথাও লোকজন নেই— আছে খালি নীরবতা ও অন্ধকার! পথগুলো যেন ভূতুড়ে পথ — প্রেতলোকের রহস্য যেন তাদের চারিদিকে স্তম্ভিত হয়ে আছে!

কিন্তু চিৎপুর রোডের উত্তরাংশ এখনও ঘুমায়নি— যদিও তার দৃশ্য গেছে বদলে। তার পথিকদের চেহারায় আর ব্যস্ততা বা কর্মশ্রান্তি বা মলিনতার কোনো চিহ্নই নেই— তাদের দেখলেই বোঝা যায়, তারা বেরিয়েছে অবসর যাপনের আনন্দের সন্ধানে। দিনের বেলায় এরাই যে ময়লা, ঘামে ভেজা জামাকাপড় পরে এই পথ দিয়েই আধসিদ্ধ ভাত-তরকারি-ভরা পেটে ছ্যাকড়াগাড়ির[২.৭] ঘোড়ার মতো আপিসের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, তারপর সারাদিন কলম পিষে, বড়োবাবুর বকুনি ও সাহেবের হুমকি হজম করে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ির পানে ফিরে এসেছে, এদের দিকে তাকিয়ে এখন আর হলপ করে কেউ সেকথা বলতে পারবে না। কাল রবিবার, সকালে উঠে আর আপিসের তাড়া নেই, সকলের মুখ তাই নিশ্চিন্ত আনন্দে উদ্ভাসিত! ছোটো-বড়ো করে ছাঁটা চকচকে চুলে বাঁকা টেড়ি কাটা, ‘হেজেলিন স্নো’[২.৮] মেখে মুখের রং তাজা, অনেকের চোখে শখের চশমা, ঠোঁটে সস্তাদামের সিগারেট, গায়ে মিহি কাপড়ের চুড়িদার পাঞ্জাবি, পরনে দেশি তাঁতের ফিনফিনে কোঁচানো কাপড়, বাঁ-হাতে ‘রিস্ট ওয়াচ’, ডান হাতে রুপো বাঁধানো ছড়ি, আঙুলে আংটি ও পায়ে নানা আকারের শৌখিন জুতো! কেউ কেউ পকেট ভরে টাকা নিয়েছে এবং রৌপ্যের ‘গন্ধ’ পেয়ে সুখের পায়রারাও অমনি বন্ধুত্বের ভান দেখিয়ে তাদের সঙ্গী হয়েছে। বিডন স্কোয়ারের মোড়ে[২.৯] ফুলওয়ালার কাছ থেকে দলের বড়োবাবুরা কয়েক ছড়া করে বেলফুল কিনলেন। একছড়া খুলে তখনই নিজের হাতে জড়িয়ে নিলেন

— বাকিগুলি যথাসময়ে কোনো বারান্দা বিলাসিনীর সাধের খোঁপায় গিয়ে উঠবে। ... দু-ধারের বারান্দার দিকে নির্লজ্জ ও সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে বাবুরা তাড়াতাড়ি ছুটছেন— এখনই আটটা বেজে যাবে, তার আগেই 'মামার দোকানে'[২.১০] ঢুকে সুরা দেবীকে ক্রয় করা চাই। —এই আবুহোসেনরা[২.১১] আজ একদিনেই হয়তো আপিসের সারা মাসের শ্রমলব্ধ অর্থকে ফুর্তির স্রোতে অতলে তলিয়ে দেবে, শেষরাতে বা কাল সকালে এরা যখন অবসাদে এলিয়ে পড়ে, অনিদ্রায় ও নেশায় টকটকে রাঙা চক্ষু নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ির দিকে ফিরবে, তখন এদের ট্যাঁক হাতড়ালে কেউ একটা আধলাও আর আবিষ্কার করতে পারবে না!

রাস্তা দিয়ে গাড়ির পর গাড়ি ছুটেছে— টমটম, ল্যান্ডো, ফিটন, পালকি গাড়ি, মোটরবাস ও সবচেয়ে বেশি 'ট্যাক্সি'। কোনো গাড়িতে সুবর্ণ-গর্দভরা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বসে আছে— তাদের মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, দুনিয়ায় যেন তারা ছাড়া আর মানুষ নেই— পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারা যেন কীটপতঙ্গেরই সামিল, তারা গাড়ির তলায় চাপা পড়লেও সংসারের কিছুমাত্র লোকসান হবে না! এইসব লক্ষ্মী প্যাঁচা দিবানিদ্রায় দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জেগে ওঠে ওই চামচিকে-বাদুড়-প্যাঁচাদেরই মতো, এবং রাত্রিবেলায় বাড়ির বাইরে বাঁধা নির্দিষ্ট সুখ-নীড়ের দিকে ধাবিত হয়— নিয়মিতরূপে সেখানে না গেলে এদের একঘেয়ে জীবনের অবসাদ কিছুতেই ঘুচতে চায় না। ...অনেক গাড়ির আরোহীরাই মাড়োয়ারি। ছাতু খেয়ে কাঠখোট্টার মুল্লুকে মানুষ হয়ে এই জীবগুলি বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় করে প্রথম বাংলাদেশে এসে আড্ডা গেড়ে বসে। তারপর গেল যুদ্ধের সময়ে 'স্পেকুলেশন'-এর মহিমায় অকস্মাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যের বোঝায় অতিরিক্ত ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই ভার এখন তারা চটপট কমিয়ে ফেলবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিলাসী বাঙালির আদরের শহর কলকাতা— হাল-ফ্যাশানে প্রাচ্যে অগ্রগণ্য। বাঙালি বাবুদের দেখাদেখি মেড়ুয়ারাও ছাতুর স্বাদ ভুলে 'সভ্য' হয়ে উঠছে— মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলা বুলি, পরনে বাংলা পোশাক! অনেকেই টিকি ছেঁটেছে বা সংক্ষিপ্ত করে এনেছে— মাথায় দশ আনা ছ-আনা[২.১২] চুলের বাহার! বাঙালি আবুহোসেনরা তাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে— কারণ শহরের ভালো ভালো ডানাকাটা পরির দল আজ ছাতুখোরদের সোনার টিকিতে বাঁধা! তারা নতুন বড়োমানুষ, কথায় কথায় টাকা বৃষ্টি করে— বাবুদের সাধ্য কী তাদের সঙ্গে পাল্লা দেন! কিন্তু বাবুর দলকে আমি অভয় দিচ্ছি! দু-দিন সবুর করলেই মেওয়া ফলবে! মাড়োয়ারিরা বাঙালি বাবুদের উপরে টেক্কা মারবার জন্য যেরকম উঠে পড়ে লেগেছে, টাকা নিয়ে যেরকম ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে— তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, রসাতলে যেতে তাদের আর বেশি দেরি লাগবে না। ফিরিঙ্গিদের[২.১৩] নকল করে যেমন অনেক নব্য বাবু চুলোয় গিয়েছেন, বাবুদের নকল করতে গিয়ে মাড়োয়ারিরাও তেমনি গোল্লায় যাবেই যাবে।

ট্যাক্সিতে চড়ে যাচ্ছে অধিকাংশ হঠাৎ-বাবুর দল। বাপ-মায়ের লোহার সিন্দুকে বা গয়নার বাক্সে সকলের অগোচরে হাত চালিয়ে, বা 'হ্যান্ড নোট' কেটে বা অন্য উপায়ে এদের অনেকে হঠাৎ কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে— এখন তারই সদব্যবহার করতে চলেছে। দিনকতক পরেই এদের ট্যাঁক ফের গড়ের মাঠ হবে, তারপর হয়তো একদিন দেখা যাবে, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে না পেরে অনেকেই আদালতে গিয়ে শুষ্ক মুখে আসামি হয়ে দাঁড়িয়েছে!

সোনাগাছি[২.১৪] বা রুপোগাছির[২.১৫] কাছে গিয়ে অধিকাংশ গাড়িই খালি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে যারা নামছে তাদের ভিতরে কেবল সুবর্ণ-গর্দভ, মাড়োয়ারি বা হঠাৎ-বাবুরাই নেই— একটু কাছে এগিয়ে এলেই দেখবেন, অনেক বিখ্যাত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, উকিল, অ্যাটর্নি, ডাক্তার, এম.এল.সি[২.১৬], নন কো-অপারেটর[২.১৭], বক্তা, পণ্ডিত সম্পাদক ও সাহিত্যিকও এই দলে আছেন! এমনকী, শহর থেকে বারবনিতা উঠিয়ে দেবার জন্য যেসব সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি প্রকাশ্য সভায় প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বাহাদুরি নিচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ যে এ দলে নেই, এমন মিথ্যাকথাও আমি বলতে পারব না। আমার নৈশ-ভ্রমণে আমি হিন্দু, ক্রিশ্চান, মুসলমান ও ব্রাহ্ম সমাজের অনেক বড়ো বড়ো মাথাওয়ালা লোককে স্বচক্ষে এইসব স্থানে দর্শন করেছি! প্রথম প্রথম অবাক হতুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতুম না। এখন দেখে দেখে আর অবাক হই না—কারণ এখন আর চোখের উপরে নয়, কলকাতার বাসিন্দাদের তথাকথিত সাধুতার উপরেই আমি সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। কোথায়, কবে, কাকে দেখেছি, সে কথা আমি অবশ্য এখানে বলতে চাই না— কিন্তু একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে কলকাতার অধিকাংশ লোকই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বারবনিতার ঘরে আসা-যাওয়া করে। সমাজে এরা কেউ ধরা পড়ে না— এদের মুখোশ এমনি নিখুঁত!

রাত যত বাড়তে থাকে, কলকাতার সমস্ত অংশ যত স্তব্ধ হয়ে আসে, চিৎপুরের উল্লাসধ্বনি ততই উচ্চতর হয়ে ওঠে! তখন দেখা যাবে, আশপাশের অলি-গলি থেকে সারি সারি ট্যাক্সি বেরিয়ে এসে চিৎপুর রোডের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ময়দানের দিকে ছুটছে! অধিকাংশ গাড়ির আরোহীই তখন চুচ্চুড়ে মাতাল এবং প্রায় প্রত্যেক গাড়িতেই একটি বা দুটি স্ত্রীলোক পুরুষদের কোলে বা বুকের ওপর খোঁপায় মালা জড়িয়ে নেশায় এলিয়ে পড়ে আছে! গাড়ির ভেতর বসেই সবাই বিকট স্বরে হইহই করছে, কেউ সচিৎকারে প্রেম জানাচ্ছে, কেউ অশ্লীল ভাষায় গান গাইছে, কেউ নেশার খেয়ালে আবোল-তাবোল বকছে! কোনো কোনো গাড়িতে আবার হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানও চলছে এবং সেসব গান হচ্ছে এই ধরনের—

আমার ভালোবাসা আবার কোথায় বাসা বেঁধেচে!
মাসে মাসে বাড়চে ভাড়া,
বাড়িউলি দিচ্ছে তাড়া,
গয়লাপাড়ার ময়লা ছোঁড়া প্রাণে মেরেচে!

প্রকাশ্য রাস্তায়, সকলের চোখের সামনেই, খোলা গাড়ির ভিতরে স্ত্রী-পুরুষে চুম্বন-আলিঙ্গনও বাদ যায় না।

কলকাতার নানা পথের ওপরে যেসব কালী বা অন্যান্য দেবতার মন্দির আছে, সন্ধ্যারতির সময়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে একটি বিষয় লক্ষ করবেন! মন্দিরের সামনে স্ত্রী-পুরুষের জনতা। দু-চারজন খাঁটি ভক্ত এবং গরিব ভদ্রঘরের মেয়েও সেখানে থাকেন বটে —কিন্তু বাদবাকি বেশিরভাগই শিকারি পুরুষ, ভদ্রঘরের কুচরিত্র স্ত্রীলোক বা বারবনিতা। কোনো কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের মাথার ওপরে হয়তো অভিভাবক নেই, এবং তারা যে কারণেই হোক বাজারের বারনারীর মতো প্রকাশ্যে রূপ-যৌবন বিক্রি করতে পারে না।

তারা এইসব মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় দেব-দর্শনের ছলে আসে। রতনে রতন চেনে! কোনো শিকারি পুরুষের সঙ্গে আধ-ঘোমটার ফাঁকে চোখাচোখি হলেই তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তারপর তারা যখন ঘরের দিকে ফেরে, তখন প্রায়ই দেখা যায় তাদের পেছনে পেছনে মধুলুব্ধ ভ্রমরেরও অভাব নেই! সময়ে সময়ে বড়ো বড়ো পাকা শিকারিরাও ভ্রমে পড়ে গৃহস্থের সতী কুলবধূর পেছনে অনুসরণ করে। পরিণাম— লগুড়ের রসাস্বাদ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়ন। কিন্তু এত লাঞ্ছনাতেও হতভাগ্যদের চৈতন্য হয় না— মন্দির-দ্বারে পরদিন ঠিক আবার নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ধরনা দেয়। এক শ্রেণির পুরুষ আছে, সাধারণ বারবনিতার চেয়ে এইরকম অপ্রকাশ্য কুলটাদেরই তারা বেশি পছন্দ করে। বারবনিতারাও এই-প্রকৃতির পুরুষদের চরিত্র বোঝে। তাই তাদেরও অনেক মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখবার অছিলায়, মুখে ঘোমটা টেনে গৃহস্থের বউ সেজে পুরুষদের চোখে ধুলো দিতে ছাড়ে না। ...এই নারীর পেছন নেওয়া অভ্যাসের ফলে মাঝে মাঝে কতক বিয়োগান্ত প্রহসনের অভিনয় হয়। অনেক সময়ে এক নারীর পেছনে একাধিক রূপ-রসিকের সমাগম হয়। তখন প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছাঁটবার মতলবে হরেকরকম কৌশল অবলম্বন, চোখরাঙানি, মারামারি কিছুই বাদ যায় না। মানুষের ভেতরে এখনও কুকুর-বিড়ালের স্বভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

শেষরাত্রে গঙ্গার ধারে এই ধরনের আর এক দৃশ্য দেখা যায়। রাতশেষে অন্ধকারে মুখ ঢেকে অনেক পরপুরুষ-দৃষ্টি-ভীত কুলনারী প্রাতঃস্নানে যান। তাঁরা যে সবাই সতী-সাবিত্রী তা নয়। তাঁদের ভেতরেও অনেক ভেজাল আছে— তারা এই সুবর্ণ সুযোগের সদব্যবহার করতে ছাড়ে না। শিকারি পুরুষরাও এ সন্ধান রাখে। তারাও দলে দলে এই সময়ে বেরিয়ে পড়ে, এবং ওত পেতে বসে থাকে। অনেকের সন্ধানে খালি বাড়ি আছে। হস্তগত শিকারকে নিয়ে পুরুষরা এইসব বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢোকে। মাঝে মাঝে সুচরিত্র তরলমতি মেয়েরাও এদের প্রলোভনে পড়ে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করে— কেউ কেউ আর ইহজীবনে বাড়িতে ফেরে না। সঙ্গে পুরুষ-রক্ষক না থাকলে, শেষরাতে বাড়ির মেয়েদের কখনো গঙ্গাস্নানে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

বড়োবাজারের দিকে গঙ্গাতীরেও পশ্চিমা মেয়েদের জন্যে খালি বাড়ি আছে শুনেছি— কিন্তু আমি নিজের চোখে তা দেখিনি। এসব বাড়িতে মেয়েদের জন্যই নাকি বাহির থেকে পুরুষ সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমা যুবতীরা নাকি এখানে এসে সংগৃহীত পুরুষদের সহবাসে আপনাদের বাসনা চরিতার্থ করে যায় এবং বলাবাহুল্য যে, এজন্যে তাদের টাকা খরচও করতে হয়। কিন্তু শোনা-কথায় নির্ভর করে এ সম্বন্ধে আমি আর বেশি কিছু বলতে পারি না। ব্যাপারটা সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে— তবে কলকাতায় অসম্ভব বলে কিছু নেই।

অসম্ভব নয় বলছি এইজন্যে যে, এর চেয়েও উদ্ভট কাণ্ড আমি বাঙালি-পাড়ায় ঘটতে দেখেছি। এই কদর্য 'রোম্যান্স'-এর নায়িকা হচ্ছেন, কলকাতার কোনো প্রাচীন ও বিখ্যাত ধনী পরিবারের এক মহিলা। অল্পবয়সেই তাঁর স্বামী পরলোকে যান— বিধবা পত্নীর মাথার ওপরে আর দ্বিতীয় অভিভাবক না রেখে। গঙ্গার কাছাকাছি কোনো পল্লিতে এই মহিলা একাকিনী প্রকাণ্ড এক অট্টালিকায় বাস করতেন, একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে। এঁর লালসা মেটাবার পদ্ধতি ছিল যেমন কুৎসিত, তেমনই অভিনব। শেষরাতে উনি গাড়িতে চড়ে সঙ্গে জন কয়েক বিশ্বাসী দারোয়ান নিয়ে 'গঙ্গাস্নানে' যেতেন— যদিও স্নান করতেন না! আগেই বলেছি, এসময়ে শ্রেণিবিশেষের পুরুষও শিকারের খোঁজে বেরোয়। এই রূপসি যুবতী সেই শিকারিদের ওপরেই শিকার করতেন! যাকে দেখে তাঁর পছন্দ হত, তাকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। কেউ কেউ প্রকাণ্ড গাড়ি ও দারোয়ান দেখে তাঁর সঙ্গে আসাটা নিরাপদ বিবেচনা করত না— এহেন রূপসির লোভ ছেড়েও প্রাণপণে পালাতে চাইত— ভাবত বোধ হয়, এ হচ্ছে কোনো বিপজ্জনক ফাঁদ! সেক্ষত্রেও কমলি কিন্তু তাদের ছাড়ত না[২.১৮]। মহিলার ইঙ্গিত পাবামাত্রই দারোয়ান সেই কাপুরুষ প্রেমিককে ছোঁ মেরে গাড়ির ভেতর টেনে তুলত! গাড়ি যখন প্রকাণ্ড অট্টালিকার ফটকের মধ্যে ঢুকত, বন্দি বেচারি তখন ভয়ে কাঠ হয়ে ভাবত— আজ সে নিশ্চয়ই গুম খুন হবে। ... ওই মহিলাটি একসময়ে প্রায়ই অজানা প্রেমিকের জন্য এমনই অপূর্ব অভিসার-যাত্রা করতেন। এখন তিনি শান্ত হয়েছেন— কারণ তাঁর পুত্র সাবালক।

ঢং, ঢং, ঢং! ঘড়িতে রাত তিনটে বাজল। এই সময়ে সে-রাতের মতো ফুর্তিতে ক্ষান্তি দিয়ে অধিকাংশ শখের বাবুই বাড়িমুখো হন। চিৎপুরের চারিদিক ঘন ঘন মোটরের ভেঁপুতে শব্দিত হয়ে ওঠে। অনেকেই ট্যাঁকের শেষ কড়িটি পর্যন্ত সে রাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে সমর্পণ করে আসে, তাদের আজ শ্রীচরণ-ভরসা বই আর গতি নেই। পানের 'পিক' লাগা এলোমেলো জামাকাপড়, উশকোখুশকো চুলে, নেশায় জবাফুলের মতো টকটকে চোখে, গ্যাসপোস্টে ক্রমাগত ধাক্কা খেয়ে টলতে টলতে 'রাতের পাখি'রা বাসায় ফেরে— পথের মোড়ে মোড়ে তখন পাহারাওয়ালারা বাড়ির রোয়াকে বসে বসে ঝিমোয় — হঠাৎ পদশব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে জেগে, 'কোন শ্বশুরা রে!' — বলে হুমকি দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং অনেককেই ধরে গুঁতো মারতে মারতে থানায় টেনে নিয়ে যায়!

যেখানে পাহারাওয়ালা নেই, সেখানে আচম্বিতে আকাশ থেকে সদ্য-পতিতের মতো এক-একটা কালো-মুশকো লম্বা-চওড়া জোয়ান মূর্তি আবির্ভূত হয়! তারপর মাতালদের নেশা ছুটতে না ছুটতে তাদের শাল-আলোয়ান বা রেশমি-চাদর, ঘড়ি বা চেন যা কিছু পায় টেনে ছিনিয়ে নিয়ে যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল তেমনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়! যারা তাদের বাধা দেবার সাহস রাখে তাদের পুরস্কার— একখানা ধারালো ও চকচকে ছয় ইঞ্চি ইস্পাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়! এমনই সব বিপদ এড়িয়ে রাতের যে পাখিগুলি শেষটা নিজেদের ডেরায়— পতিব্রতা সতীরা যেখানে সারা রাত অশ্রুজলে শয্যা সিক্ত করেছে— গিয়ে আবার হাজির হতে পারে, তারা যথার্থই ভাগ্যবান! অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, অপমান— এমনকী প্রাণনাশের ভয় পর্যন্ত না রেখে যারা নিত্য এহেন জীবনযাপন করে, তারা যে কোন ধাতুতে তৈরি মানুষ সেটা একবার ভেবে দেখুন!

কলকাতার ফিরিঙ্গি পল্লির দৃশ্য রাত্রে ভিন্নরকম। সেখানকার প্রকাশ্য জীবনলীলা দেখা যায় প্রধানত চৌরঙ্গি[২.১৯], কার্জন পার্ক[২.২০], ইডেন গার্ডেন[২.২১], গড়ের মাঠ[২.২২] ও ঘোড়-দৌড়ের মাঠের[২.২৩] ভেতরে। বাঙালি পাড়ার সঙ্গে এ অঞ্চলের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে— এখানে সাধারণত হট্টগোল ও মলিনতা নেই। মানুষগুলিও যেমন সুন্দর ফিটফাট, পাড়াও

ঠিক তেমনি। চৌরঙ্গির ধারে ধারে অগণ্য দোকান ও হোটেল আলোকমালা পরে পথিককে যেন সাদর আহ্বান করছে। হোটেলগুলির ভিতরকার দৃশ্য দেখলে মনে হয়, যেন সমুজ্জ্বল পরিস্থানের এক-একটি টুকরো কোনো গতিকে হঠাৎ খসে এখানে এসে পড়েছে! এত আলো। এত লতাপাতা ফুল! এত সাজসজ্জা! চোখ তৃপ্ত হয়ে যায়। তালে তালে মধুর স্বরে ঐকতান বাজছে, জীবন্ত ছবির মতো সুন্দর লোকগুলি আনাগোনা করছে, কোথাও একটু বেসুরো আওয়াজ নেই; সমস্তই ধরাবাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পাদিত হচ্ছে! বাঙালি এমনভাবে জীবনকে উপভোগ করতে জানে না।

এ অঞ্চলে পথের ধারে ধারে বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের আলোকোজ্জ্বল অট্টালিকাগুলির সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। সে ভিড়ের ভেতরে বাঙালি, মাড়োয়ারি, মুসলমান ও ইউরোপীয় অনেক জাতের লোকই দেখা যায়। মাঝে মাঝে কাঁটা-জঙ্গলে ফুটন্ত গোলাপের মতো, দলে দলে কালো চেহারার মধ্যে আলো করা রূপ ও পোশাক নিয়ে শ্বেতাঙ্গসুন্দরীরা নয়ন-মনকে মোহিত করে দেন। অধিকাংশ রঙ্গালয়ের সামনে প্রায়ই রূপপিপাসী বাঙালি যুবকরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। মোটরের পর মোটর আসছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে বিলাতি রূপসি রং-বেরঙের নানান হালফ্যাশনের পোশাক পরে নামছে এবং যুবকরা হতাশ অথচ সতৃষ্ণ নয়নে তাদের পানে তাকিয়ে আছে! কিন্তু হায়, এ যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তো স্পষ্টই বলে গেছেন, কেবলমাত্র নয়ন দিয়ে যোলো বছরের জ্যান্ত মেয়ে ‘আহার’ করা সম্ভব নয়! এবং রবীন্দ্রনাথও এদেরই মনের কথা এই দুই পঙক্তিতে ব্যক্ত করেছেন—

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল,

সেকি, আমার পানে ভুলে পড়িবে না![২.২৪]

আধুনিক বিলাতি রূপসিদের নৈশ পোশাক একান্ত মারাত্মক। একে তো তাঁদের রং ফাটা বেদানার মতো অপূর্ব, তার ওপরে সেই যৌবনপুষ্ট তনুলতার ঊর্ধ্বাংশ একেবারেই উন্মুক্ত — অনেকেরই দুধের মতো ধবল উচ্চ বক্ষ বিচিত্র নগ্ন সৌন্দর্যে দর্শকের চক্ষুকে রীতিমতো স্থির করে দেয়! খুনিরা মানুষের দেহকে হত্যা করে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গসুন্দরীরা হত্যা করে মানুষের মনকে! আইন অনুসারে এঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। যুবকরা সাবধান, ফিরিঙ্গি পাড়ার এসব আলেয়ার আলোর দিকে তাকানো মিছে— কারণ এরা দেখা দেয়, ধরা দেয় না! ...এই ভিড়ের মধ্যে এক শ্রেণির বঙ্গবালাও বিচরণ করেন— তাঁদের পোশাক কিম্ভূতকিমাকার— দেশি-বিলাতি ফ্যাশনের ‘ঘণ্ট’ বিশেষ! তবে অনেকেই বোধ হয় এই ভেবে দুঃখ পান যে, কেন এঁরা এখনও বুকের কাপড় খুলে পথে বেরোতে শেখেননি? আমাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে খুব সম্ভব এমন দুঃখ প্রকাশেরও অবকাশ থাকবে না— ‘আসিবে, সেদিন আসিবে!’

সন্ধ্যাবেলায় এখানে এরকম খালি ফিটন গাড়ি পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার সহিস, কোচম্যান, ঘোড়া ও আকার কিছুই ছ্যাকড়াগাড়ির মতো নয়। এসব গাড়ি রহস্যপূর্ণ। আপনি যদি রসিক হন, তবে এই গাড়িগুলিকে দেখলেই চিনতে পারবেন। এর ভেতরে উঠে বসুন, চালক আপনাকে বিনাবাক্যব্যয়ে শ্রেণিবিশেষের শ্বেত-রূপসির কাছে নিয়ে যাবে। তারা শুভ্র টাকার বিনিময়ে আপনার কয়লা-কালো রং ভুলে অনায়াসে দেহকে বিকিয়ে দেবে। তবে আপনার দেহে ফিরিঙ্গি পোশাক থাকা চাই। সন্ধ্যার মুখে অনেক বাঙালির ছেলেকে এই উদ্দেশ্যে এখানে ঘুরুর-ঘুরুর করতে দেখবেন!

বিলাতি রূপজীবিনীরা সন্ধ্যার সময়ে পথের ওপরেও আবির্ভূত হয়। কিন্তু সাধারণ ভদ্র মেমদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য, চক্ষু কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হলে ধরা যায় না। তবে একটু লক্ষ করলেই সাধারণ বারবনিতার বিশেষত্ব তাদের খেলো অথচ রংচঙে পোশাকে, অবসাদগ্রস্ত চোখে, অত্যধিক পাউডার-রং মাখা মুখে আর হাবভাব চলাফেরার মধ্যেই নিশ্চিত রূপে প্রকাশ পায়। গড়ের মাঠের কোণে 'কার্জন পার্কে' খানিকক্ষণ বসে থাকলেই প্রায় এদের দেখা মেলে! 'ইডেন গার্ডেন'ও এদের একটি মস্ত শিকার স্থান। সেখানে রাতের আবছায়ায় প্রায়ই ঝোপেঝাপে পরপুরুষের সঙ্গে আলুথালু বেশে ফিরিঙ্গি রূপসিদের আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

গঙ্গার ঘাটে শেষরাত্রে একশ্রেণির 'ভদ্রনারী'-র ব্যবহারের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, সাহেব পাড়াতেও সেই দলের ফিরিঙ্গি বা ইহুদি প্রভৃতি জাতের মেয়ের অভাব নেই। তবে সন্ধ্যার সময়েই তারা বেরোয় পুরুষের মাথা খেতে। তাদের অনেকে টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করে, অনেকে টাইপরাইটার চালায়, অনেকে বিলাতি দোকানে 'শপ-গার্ল'-এর কাজ করে। অনেকের আবার স্বামীও আছে! যারা স্বাধীন, তারা পথ থেকে শিকার সংগ্রহ করে চুপিচুপি বাড়ি ফিরে যায়। যারা স্বাধীন নয়, তাদের জন্য পুরুষকে খালি বাড়ি বা অন্য কোনোরকম বন্দোবস্ত করতে হয়। টাকা পেলে এরা সাদা-কালো চেহারা বাছে না, সকলের সঙ্গেই সমানভাবে আনন্দ করবে। সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার-বায়োস্কোপে যাবে, হোটেলে গিয়ে খাবে, মোটরে উঠে 'জয় রাইড' করবে। হয়তো ক্রমাগত গৌরবর্ণকে উপভোগ করে করে শ্যামবর্ণ এদের কাছে লোভনীয় বলে বোধ হয়। সাধারণত এরা গাড়ির ভেতরেই পরপুরুষের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে। রাত্রিবেলায় গড়ের মাঠের আড়ালে আবছায়ায় এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠের আনাচেকানাচে গেলে এই জাতীয় অনেক স্ত্রীলোকের লীলাখেলা স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। শ্বেতাঙ্গ পাহারাওয়ালারা এদের উপরে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মাঝে মাঝে এরা গাড়ির ভেতরে পরপুরুষের সঙ্গে অকথ্য অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। তখন এদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আমি একবার এই দলের একটি নারীর দুর্গতি দেখেছিলুম। 'স্ট্র্যান্ড'-এর ওদিকে গাড়ির ভেতরে সে ধরা পড়েছিল। পুরুষটি ছিল গোরা। সে তো গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কামান থেকে নির্গত গোলকের চেয়েও বেগে প্রাণপণে চম্পট দিলে— ধরা পড়ল স্ত্রীলোকটি। 'সার্জেন্ট'-এর নির্দয় প্রহারে তার শ্বেতমুখ একেবারে রক্তাক্ত হয়ে উঠল।

কড়েয়া ও ওয়াটগঞ্জে পৃথিবীর নানা জাতীয় বারবনিতা বাস করে। কিন্তু সেখানকার পথের দৃশ্যে বিশেষ কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যায় না! সে অঞ্চলের জীবন-নাট্য অভিনীত হয় প্রাচীরের আড়ালে। বাঙালি সেখানে খুব কম যায়। সাধারণত জাহাজি গোরা, কেল্লার সৈনিক, চীনা, জাপানি ও নিম্নশ্রেণির মুসলমান প্রভৃতি জাতি সেখানকার নৈশ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা।

বর্তমান কলকাতার পথের আর এক বিশেষত্ব, গুন্ডার ভয়। এই জাতীয় 'ভদ্রলোক'গুলি অত্যন্ত পরিশ্রমী, দিনের বেলাতেও তাঁরা ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন, রাত্রে তো কথাই নেই। আগে কাশী ও মির্জাপুর প্রভৃতি শহর গুন্ডার জন্য বিখ্যাত ছিল, কলকাতা কিন্তু তাদের ওপরে রীতিমতো টেক্কা মেরেছে— অথচ এখানে পুলিশবাহিনী সংখ্যায় ও প্রতাপে ভারতে অদ্বিতীয়।

গুন্ডা সমাজে যাঁরা সম্ভ্রান্ত, সে মহাত্মাদের প্রধান আড্ডা হচ্ছে মেছোবাজারে ও তার আশেপাশে। জাতে তারা মুসলমান— আর অর্থ সম্পত্তিতে তাদের ধনকুবের বললেও চলে। হিন্দুস্থানি গুন্ডারা সাধারণত বড়োবাজার অঞ্চলে থাকে। এদের যারা দলপতি, তারা

প্রায়ই এক একটা কোকেন বা জুয়ার আড্ডা খুলে বসে। আর একশ্রেণির সর্দার গুন্ডার দল গঠন করে, তাদের কাজ পথিকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া আর ডাকাতি করা। তার ওপরে কলকাতার প্রত্যেক পল্লিতেই জন কয়েক করে স্থানীয় গুন্ডা থাকে পাড়ার লোকেদের কাছে যারা যমের মতো।

রাত্রে মেছোবাজারের কফিখানাগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। এ জনতার মধ্যে আপনি যাদের দেখবেন, তাদের বারো আনাই সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। যত খুনে, জুয়াড়ি, গুন্ডা, চোর, ডাকাত আর পকেট কাটা ওইখানে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া ও মেলামেশা করে, অর্থাৎ কফিখানা হচ্ছে তাদের ক্লাবের মতো। অধিকাংশ দাগি বা পলাতক গুন্ডাই দিনের বেলায় পুলিশের ভয়ে বাইরে মুখ দেখাতে পারে না, তাই রাত্রিই হচ্ছে তাদের উপভোগের কাল। খাওয়া-দাওয়া ও গল্পসল্পের পর তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে— শিকারের খোঁজে।

সাধারণত গুন্ডারা নিজেদের পাড়ায় অত্যাচার করে না। এ সদাশয়তার কারণ নিজের পাড়ার প্রতি প্রেম নয়, এতে ধরা পড়বার ভয় বেশি বলেই গুন্ডারা ভিন্ন পাড়ায় জোরজুলুম করতে যায়। রাত্রে মেছোবাজার যে ভয়ানক স্থান, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ চোদ্দো-পনেরো বছর ধরে মেছোবাজার দিয়ে অনেক রাতে আমি একলা আনাগোনা করেছি, কিন্তু কখনো কোনো বিপদে পড়িনি। অথচ এ অঞ্চলে বেশি রাতে যে লোকগুলিকে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র। অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে তারা এঁটো মাটির ভাঁড়ের মতো যেকোনো পথিকের দেহ এক আছাড়ে ভেঙে গুঁড়ো করে দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকে! তবু আমি তাদের সুনজরে পড়িনি। মেছোবাজারে প্রায়ই যেসব খুনোখুনি ও মারামারির খবর পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই গুন্ডাদের নিজেদের মধ্যেই দলাদলির ফলে হয়ে থাকে।

এদের আপনা-আপনির মধ্যে মারামারি ও খুনজখম লেগেই আছে। এর একটা দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগেকার কথা। রহস্যময় জায়গায় যাওয়ার অভ্যাস আমার অনেকদিন থেকে— এটা আমার একটা রোগ বললেও চলে। আমার এক শৈশব বন্ধু ছিল, তার নাম এখানে করতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে পারি, খুব সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম— তার পিতা ছিলেন সাহিত্য সেবক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কিন্তু এমন বংশের ছেলে হয়েও আমার বন্ধুটি কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে যায়। যত গুন্ডার দলে ছিল তার আনাগোনা। তার গায়েও খুব জোর ছিল, আমি তাকে পনেরো-কুড়ি জন হিন্দুস্থানি গুন্ডাকে একলা মেরে তাড়িয়ে দিতে দেখেছি। এই বন্ধুকে আমি একদিন ধরে বসলুম, 'আমাকে একবার গুন্ডার আস্তানা দেখাও।' সে রাজি হয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে গ্যাঁড়াতলার[২.২৫] একটা বাড়িতে নিয়ে এল। সে বাড়িটি উঁচু একতলা — তার তলায় এক মদের দোকান ছিল। বাড়িটি এখন নেই— ইমপ্রুভমেন্ট স্কিমের কবলে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে।

বাড়ির পাশে ছিল একটি সরু গলি। সেই গলি দিয়ে আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকলুম— গলিটিও যেমন অন্ধকার, বাড়িটিও তেমনি। এখানকার জীবরা আলোকে বোধ হয় একটা অকেজো উৎপাতের মতো ভাবে।

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে একটা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি— এমন সময় একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কে? চারিদিক চেয়েও প্রশ্নকর্তাকে দেখতে পেলুম না, আমার মনে হল অন্ধকারই যেন কথা কইলে! ভয় পেয়ে

জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালুম এবং প্রতি মুহূর্তে একখানা শানিত ছোরার ঠান্ডা স্পর্শ লাভের আশা করতে লাগলুম।

আমার বন্ধু বেশ সহজভাবেই বললে, 'কে, আমির নাকি? আরে ভাই, আমাকে চিনতে পারছিস না?'

অন্ধকার আর কোনো কথা কইলে না।

আমি হাঁপ ছেড়ে বন্ধুর সঙ্গে একেবারে মদের দোকানের ছাদের উপরে গিয়ে উঠলুম। সেখানেও প্রদীপ নেই। তবে আকাশের স্বাভাবিক আলোর প্রভাবে অন্ধকার সেখানে আবছায়ায় পরিণত হয়েছে।

দেখলুম ছাদের উপরে প্রায় পনেরো-ষোলোজন মুসলমান বসে আছে। তাদের সামনে দু-তিনটে মদের বোতল, কতগুলো মাটির ভাঁড় আর খানকতক শালপাতা— বোধ হয় তাতে চাট আছে। তারা গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে মদ খাচ্ছে। প্রত্যেকেরই চেহারায় এমন একটা ভাব মাখানো, যা দেখলেই বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

আমার বন্ধু তাদেরই ভিতর গিয়ে একজনের গলা জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল এবং আর একজনের হাত থেকে ফস করে মদের ভাঁড়টা ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলে। অন্যান্য সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর আবার গল্প আর মদ চলতে লাগল। আমার দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না, আমি যে তাদেরই এক ইয়ারের সঙ্গে সেখানে গেছি, আমার এই পরিচয়ই যেন যথেষ্ট।
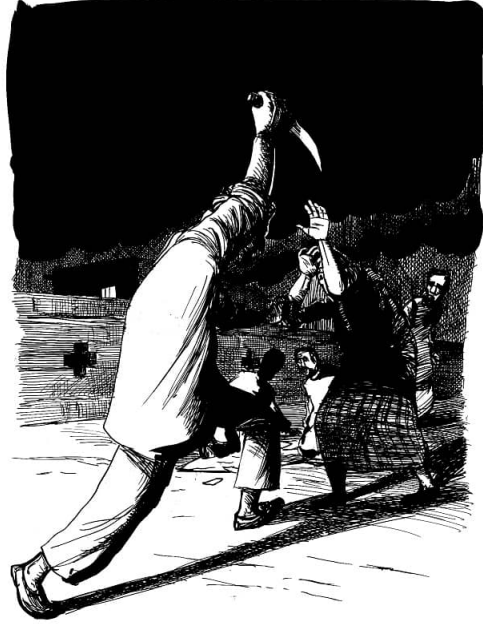
খানিক পরেই দেখলুম ছাদের এক কোণে একটা গোলমাল উঠল। এতক্ষণ দেখিনি, সেখানে চার-পাঁচজন লোক বসে বসে কী খেলছিল— খুব সম্ভব জুয়া। গোলমালের সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক, আর একজনকে ঘুসি মারলে। ঘুসি খেয়ে সেও ঘুসি ফিরিয়ে দিলে। তারপরেই প্রথম লোকটা এক নিমেষে কাপড়ের ভিতর থেকে একখানা ছুরি বার করে দ্বিতীয় লোকটাকে মারতে গেল এবং দ্বিতীয় লোকটা হাত দিয়ে সে আঘাতটা নিবারণ করলে বটে, কিন্তু ছুরিখানা তার হাতের ভিতরে বেশ খানিকটা বসে গেল!

তারপর কী যে হল, বিশেষ বুঝতে পারলুম না, কিন্তু ছাদের ওপরে যে যেখানে ছিল সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। খানিক কুৎসিত ভাষার স্রোত ছুটল, তারপরে লোকগুলো দুই দলে ভাগ হয়ে বিষম মারামারি শুরু করে দিলে। আমি তো প্রথমটা ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! চোখের সামনে দেখলুম, একজন লোক আর একজনের মাথার ওপরে একটা মদের বোতল তুলে প্রচণ্ড এক আঘাত করলে—'বাপরে বাপ, জান গিয়া' বলে আহত লোকটা ছাদের উপর ঘুরে পড়ে গেল।

আমি বুঝলুম, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়! দৌড়ে সিঁড়ির দিকে গেলুম, নীচে অমনি চিৎকার শুনলুম— 'পুলিশ! পুলিশ!' আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল! এখানে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে, আমি আর লোকসমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? আমি যে এখানে দর্শকের মতো এসেছি, কে সে কথা বিশ্বাস করবে?

হঠাৎ পেছন থেকে আমার হাত ধরে কে টানলে! চমকে দেখি আমার বন্ধু!

সে বললে, 'এদিকে আয়!' বলেই আমাকে টেনে নিয়ে ছাদের ধারে ছুটে গেল।

'পুলিশ আসছে— লাফিয়ে পড়!' আমি কোনো জবাব দিতে না দিতেই শূন্যে এক লাফ মেরে ছাদের ওপর থেকে সে অদৃশ্য হল!

আমিও আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পেলুম না— মরি আর বাঁচি যা থাকে কপালে, এই ভেবে দিলুম এক লাফ, এবং পর-মুহূর্তে একেবারে মেছোবাজার স্ট্রিটের[২.২৬] ওপরে গিয়ে পড়লুম! তারপর উঠেই প্রাণপণে দৌড়।

আমার বন্ধুকে আর কখনো গুন্ডার আস্তানায় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করিনি। সে শখ আমার মিটে গেছে।

তৃতীয় দৃশ্য

চীনেপাড়া[৩.১]

এই যে চীনেপাড়া, কলকাতার এটি মস্ত একটি দ্রষ্টব্য স্থান। বড়োবাজারের মাড়োয়ারিদের, মেছোবাজারে মুসলমানদের ও চৌরঙ্গিতে ইউরোপীয়দের জাতীয় বিশেষত্বের ছাপ আছে খুব স্পষ্ট— তবু সেসব পাড়াতেও কলকাতা আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেনি। কিন্তু আপনি চীনেপাড়ার ভিতরে একবার ঢুকুন, আপনার আর মনে হবে না আপনি সত্যই কলকাতাতেই আছেন! রাত্রে এখানকার আলোছায়া, লোকজন, কথাবার্তা, ঘরবাড়ি সবই সুদূর চীনের বিচিত্র স্মৃতি আপনার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে।

সরু রাস্তা, সাপের মতো এঁকে বেঁকে দু-ধারের বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। আপনি চলতে চলতে দু-পাশেই দেখবেন, কোথাও কোনো একতলা বাড়ির পথের ধারের খোলা ঘরে বসে চীনে-মা পথিকদের সামনেই প্রকাশ্যে বুক খুলে অসংকোচে শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে, কোথাও বাড়ির দরজার ওপরে দুর্বোধ্য চিত্রবৎ চীনে ভাষায় রঙিন বিজ্ঞাপন ঝুলছে, কোথাও এক চীনে তানসেন অচিন সুরের অদ্ভুত গান জুড়ে দিয়েছে, কোথাও-বা তিন চার জন্য চীনেম্যান তাদের অনুস্বর বহুল ভাষায় কী এক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে। প্রতি পদেই প্রায় দেখবেন, একটা চীনে সরাই বা একেলে ধরনের হোটেল, কিংবা জুয়াখানা ও চণ্ডুখোরের আড্ডা[৩.২] অথবা চৈনিক ধর্মমন্দির। আবহাওয়া একেবারে নতুনতরো।

চীনেপাড়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দুই বন্ধু আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন— চীনে হোটেলে খাওয়াবেন বলে।... তাঁদের সঙ্গে প্রথমে এক খাঁটি চীনে সরাইয়ে গিয়ে ঢুকলুম। দুটি ঘর — একটি রান্নার ঘর ও আর একটি খরিদ্দারের জন্যে, কিন্তু রান্নাঘরটি বড়ো। সেখানে মেঝের ওপরে নানান রকমের খাবার সাজানো রয়েছে, উপরে কতগুলো ছালছাড়ানো কাঁচা মুরগি ঝুলছে। আহার গৃহে তিনকোণে তিনটি ছোটো ছোটো কাঠের টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের দুই পাশে অত্যন্ত বিশীর্ণ প্রায় দাঁড়ের মতো দু-খানা করে বেঞ্চি— শুনলুম এ-রকম আসন নাকি চীনে সরাইয়েরই বিশেষত্ব। দরজার পাশের এককোণে একটা উঁচু টেবিল, তাতেও নানারকম খাবার, বোতল ও পাত্রাদি সাজানো এবং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে দোকানের মালিক।

আমরা একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। নাকে যেন কেমন একটা অজানা গন্ধ পেতে লাগলুম, সে গন্ধ ঘৃণাকরও নয়, উপভোগ্যও নয়। পাশের টেবিলে দু-জন চীনেম্যান মাঝে মাঝে মুখের সামনে বাটি তুলে, দুটো কাঠি দিয়ে[৩.৩] কী খাবার নিয়ে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে কথা কইছে, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমাদের মুখের পানে চেয়ে দেখছে— খাঁটি চীনে সরাইয়ে আমাদের মতো নব্য বঙ্গের হাল ফ্যাশানের নমুনার আবির্ভাব যে প্রায়ই ঘটে না, তাদের ভাব দেখে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আহারকালে চীনেম্যানদের মুখের অদ্ভুত ভাবও দর্শনীয়— কিন্তু কলমে তা অবর্ণনীয়।

বন্ধুর ফরমাশে একটি ছোকরা চীনে বেয়ারা আমাদের ক-জনের জন্যে একখানা মাত্র ছোটো সানকিতে খানিকটা মাংসের তরকারি, এক বাটি ভাতের ফেন, ঝুরি ভাজার মতো

একথালা আলু না ময়দার তৈরি কী একটা জিনিস এবং প্রত্যেকের জন্য দুটো করে কাঠি রেখে গেল। এই কাঠি হচ্ছে চীনেম্যানদের ছুরি কাঁটা। খাবারগুলি খেতে নেহাত মন্দ লাগল না।

শুনলুম, এখানে খুব সস্তায় মদ বিক্রি হয়। অন্য অন্য জায়গায় যে মদের এক এক 'পেগে'র দাম পাঁচসিকা[৩.৪], এখানে তাই-ই পাওয়া যায় মাত্রে সাড়ে পাঁচ আনায়। এত সস্তার কারণ, এখানে মদ আনা হয় আবগারি বিভাগ ফাঁকি দিয়ে। এখানে চীনে মদও পাওয়া যায়, তার দাম কিন্তু বেশি। এই সুসংবাদ বোধ করি বাঙালি মাতালদের কানে গিয়ে এখনও ওঠেনি— নইলে এতক্ষণে এ স্থানটা নিশ্চয়ই লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত। এমন প্রকাশ্যভাবে এরা কোন সাহসে মদ বিক্রি করে, বলা যায় না। খুব সম্ভব অচেনা মাতাল এখানে এসে আবদার করলে দোকানের মালিক তাকে গলাধাক্কা দেয়।

তারপরে গেলুম আর একটা দোকানে। সে দোকানের মালিক কে তা জানি না, কিন্তু মালিকের স্ত্রী নিজেই এসে একগাল হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন ও নিজের হাতেই আমাদের জন্য 'কোকো'[৩.৫] তৈরি করে দিলেন। এ-ঘরেও দু-দিকে দুটো টেবিল। একটার উপরে কতকগুলো চীনে মিষ্টান্ন সাজানো। —আর একটা টেবিল খুব উঁচু— তার ওপরে তিন চারটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু কখনো গড়াগড়ি দিচ্ছে ও কখনো পরস্পরের সঙ্গে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করছে। টেবিলের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল— মালিকের জামাই ও তার বালিকা স্ত্রী। মেয়েটি এই বয়সে মা হয়েছে— আমাদের বাঙালি বালিকার মতো। আমরা যখন বিদায় নিলুম মালিকের স্ত্রী তখন দরজা পর্যন্ত এসে আমাদের এগিয়ে দিয়ে সেলাম করলেন। এই বিদেশিনির ভদ্রতায় মুগ্ধ হলুম।

তারপরে আর একটি চীনে সরাইয়ে ঢুকলুম। এটি আকারে মস্ত বড়ো ও খুব সাজানো গুছানো। ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে, হরেকরকম গোলমাল শোনা যাচ্ছে, ব্যস্তভাবে লোক আনাগোনা করছে, চীনেম্যানরা চেয়ারের ওপরে উবু হয়ে খেতে বসেছে। একটি লোক পরিবেশন করছে— উচ্চস্বরে গান গাইতে গাইতে! আমরা একটি কোণের ঘরে গিয়ে বসলুম— বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। টেবিলের ওপর হরেকরকমের চীনে খাবার সাজানো আছে— যার যা খুশি নিজেই নিয়ে খেতে পারে। দু-চারটে খাবার খেয়ে আমরা চীনে চায়ের ফরমাশ করলুম। একটি চৈনিক যুবতী এসে হাতলহীন চীনে বাটিতে খানিকটা করে চা রেখে গরম জল ঢেলে, তার ওপরে আর একটি বাটি চাপা দিয়ে গেল। খানিকবাদে চায়ের পাতা সিদ্ধ হল। কিন্তু উপুড় করা বাটিটা এমনি তেতে উঠল যে সেটি নামানো অসম্ভব— কারণ তাতেও হাতল নেই। —চা খোর চীনেম্যানদের চা তৈরির এই ব্যবস্থাটি মোটেই সুবিধাজনক বলে মনে হল না।

এক বন্ধু বাহাদুরি করে বাটিটা নামাতে গেলেন— কিন্তু পারবেন কেন? খানিকটা চা চলকে টেবিলের উপরে এসে পড়ল, তার পর আমাদের দুরবস্থা দেখে সেই চীনে যুবতীটি এসে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। চীনে চায়ে দুধও নেই, চিনিও নেই— তবু আমার বড়ো মন্দ লাগল না, যদিও তার গন্ধটা চিরতার মতো। ...খানিক পরে দেখি, অনেকে এসে উঁকি মেরে আমাদের দেখে যাচ্ছে! চৈনিক সুন্দরীটি নিশ্চয়ই বাইরে গিয়ে প্রচার করে দিয়েছেন এ-ঘরে এমন একদল জানোয়ার এসেছে যারা কীরকম করে চা খেতে হয়, তা পর্যন্ত জানে না! যা হোক, আমরাও অপ্রস্তুত হবার পাত্র নই— দিব্য গম্ভীর মুখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলুম— যেন কিছুই হয়নি।

... আমি লক্ষ করলুম, যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ ধরেই একজন চীনেম্যান পাশের ঘর থেকে গম্ভীরভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমার সঙ্গে বারংবার চোখাচোখি

হলেও একবারও সে চোখ নাবালে না, টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে তেমনই নিষ্পলক নেত্রেই আমার দিকে তাকিয়ে রইল! আমি তার দিকে চেয়ে দু-একবার হাসলুম, কিন্তু তবু তার মুখোশের মতন মুখ স্থির মুখের একটিমাত্র মাংসপেশিও সংকুচিত হল না। তার চাউনি দেখলে মনে হয়, আমি যেন তার পূর্বজন্মের পরিচিত! ...কী চায় সে? আমাকে সম্মোহিত করবে নাকি? এমন অস্বস্তি হতে লাগল! ...ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তবে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

যেতে যেতে দেখলুম, এক জায়গায় একটা আলোকজ্জ্বল লম্বা ঘর থেকে টাকার আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের মৃদুধ্বনি উঠছে। উঁকি মেরে দেখলুম, সত্যিই সে ঘরে অনেক লোক, সবাই চীনেম্যান। তারপর শুনলুম, এটা জুয়াখেলা। এটা নাকি চীনেদের ধর্মানুমোদিত, জুয়া না খেললে তাদের ধর্মহানি হয়! তাই প্রকাশ্যভাবে জুয়া খেললেও গভর্নমেন্ট তাদের বাধা দেয় না। অধিকাংশ চীনেম্যানই নিয়মিতভাবে জুয়া খেলে। সম্প্রতি কিন্তু সরকারি হুকুমে চীনেপাড়ার প্রধান বিশেষত্ব— প্রকাশ্য জুয়াখেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

মগ, ফিরিঙ্গি, চীনেম্যান ও নিম্নশ্রেণির মুসলমানে পরিপূর্ণ, সংকীর্ণ ও মলিন গলির ভেতরে এগিয়ে আমরা আর দুটি হোটেল দেখলুম— এ দুটি হোটেল একেবারে ইউরোপীয় ধরনে সাজানো গুছানো। একটির নাম 'ক্যান্টন' অন্যটি 'চাঙ্গুয়া'[৩.৬] (এখন 'ন্যানকিন' নামে আর একটি নতুন হোটেল হয়েছে)। আমরা শেষোক্ত হোটেলে প্রবেশ করলুম। ঢুকবামাত্রই এক বুড়ো ও রোগা চীনেম্যান শুষ্ক ভাবহীন মুখে আমাদের অভিবাদন করলে— তার পরই এল এক ছিপছিপে যুবক, তার মুখ হাসিখুশিতে ভরা।

বার্নিস করা কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি কোণের ঘরে গিয়ে আমরা বসে পড়লুম — দু-জন খিদমৎগার এল, তারা চীনে নয়, মুসলমান। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, চীনেপাড়ার এই চীনে হোটেলে চীনে আবহাওয়া একটুও নেই।

ওপাশের একটা ঘরের পর্দা খোলা ছিল— একটি যুবতী মেম হাতে মদের গেলাস নিয়ে একবার লীলাভরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, একবার আসনে বসেই পুলকে নেচে নেচে উঠছে, একবার ঘরের অদৃশ্য অংশে কোনো সাহেবের সঙ্গে সুরাজড়িত স্বরে ইয়ার্কি করছে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার কালো চেহারা চোখে পড়তেই সে উত্তেজিত স্বরে ডাকলে— ম্যানেজার! আমি ভাবলুম, ব্যাপার কী? ...ম্যানেজার আসবামাত্র সে তার ঘরের পর্দা টেনে দিতে বললেন— আমার কালো মুখ বোধ হয় তার স্ফূর্তির রং ময়লা করে দিচ্ছিল। —অথচ এ শ্রেণির মেমদের আমি খুব চিনি। আজ কোনো শ্বেতাঙ্গের ঘাড় ভেঙে সে হোটেলের খরচ চালিয়ে নিচ্ছে বলেই কালো চেহারার ওপর মৌখিক রাগ দেখাচ্ছে, কিন্তু কাল আমার পকেটে টাকার আওয়াজ শুনলে এই সুন্দরীটিই আমার পাশে এসে বসে অমনি ভঙ্গিভরেই হেসে মুচকে পড়বে।

এখানকার এই দুটি হোটেলে রাত্রিবেলায় সুরা ও নারীর মহিমা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটি বেপাড়া— চেনা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয় নেই, তাই অনেক ইংরেজ ও বাঙালি এখানে এসে রাত্রির খানিক অংশ বেপরোয়া স্ফূর্তিতে কাটিয়ে দেয়। এখানকার লোকগুলো অনেক যুবক ও যুবতীকেই টেবিলের তলায় নেশায় বেসামাল হয়ে গড়াগড়ি দিতে দেখেছে! সুরা ও নারী চর্চার অবশ্যম্ভাবী ফল— মারামারি, তাও এখানে নতুন দৃশ্য নয়। খালি আহার করতে খুব কম ইংরেজ ও বাঙালিই আসে, কারণ চীনেপাড়ার বাইরে ইউরোপীয় ধরনের হোটেলের কোনো অভাব নেই!

'চাঙ্গুয়া'র পাশে একটি জুয়াখানা ও চণ্ডুখোরের আস্তানা আছে। (আজকাল আর নেই)। চীনে জুয়াখানায় আমাদের প্রবেশ নিষেধ— কারণ সে কেবল চীনেদের জন্যেই। ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে জুয়াখেলা তো পবিত্র বা ধর্মের অঙ্গ নয়, তাই তারা এখানে এসে জুটলেই সেটা বেআইনি হয় এবং পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমার বন্ধুদের প্রভাব এখানে যথেষ্ট। তাই আমি চীনে জুয়াখানার ভেতরে একবার দৃষ্টিপাত করবার দুর্লভ সুযোগ পেলুম। ...ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখলুম, মাঝখানে একটা বড়ো মেঝের চারপাশে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক দাঁড়িয়ে বা চেয়ারের উপর বসে রয়েছে। জুয়াখেলার

কিছুই আমি জানি না, তারা কোন শ্রেণির জুয়া খেলছিল তা বলতে পারি না। তবে এটা আমার চোখে পড়ল যে, মেঝের উপরে থাকে টাকা ও পয়সা সাজানো রয়েছে। সেই টাকা-পয়সার থাকগুলো মাঝে মাঝে এ, ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে— হার-জিত অনুসারে। শুনেছি জুয়াখেলায় জয়লাভের চেয়ে যে অনিশ্চয়তার প্রবল উত্তেজনা আছে, সেই উত্তেজনাই ভূতের মতো জুয়াড়িদের পেয়ে বসে এবং সেইজন্যেই তারা জুয়া না খেলে থাকতে পারে না— এমনকী সর্বস্ব পণ করেও। ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনায় খেলোয়াড়দের আমি পাগলের মতো হয়ে উঠতে দেখেছি। ভেবেছিলুম এখানেও সেই উত্তেজনা দেখতে পাব। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাতির প্রখর আলোকেও, এই চীনেম্যানগুলির কারোর মুখেই উত্তেজনার আভাসমাত্র আমি পেলুম না। অধিকাংশ লোকই ভাগ্যদেবীর চঞ্চল লীলা প্রশান্ত মুখে, স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ করছে— কেবল কেউ কেউ মৃদু মৃদু হাসছে এইমাত্র! তারা কথাও কইছে খুব আস্তে আস্তে —গলার আওয়াজেও উত্তেজনার কোনো সাড়া নেই। মনে মনে ভাবলুম, হ্যাঁ, জুয়াখেলা সত্যই চিনাদের ধর্ম বটে। তাদের খেলা একমনে দেখছি —হঠাৎ একটা লোক ফিরে বললে, 'বাবু এ জায়গা তোমাদের জন্য নয়!' আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

ঠিক পাশের ঘরেই চণ্ডুখানা। সকলেই জানেন বোধ হয়, চীনে চণ্ডু আর দেশি গুলি একজাতীয় নেশা! তবে চিনারা চণ্ডু খায় সাইকেলের 'পাম্পে'র মতো একরকম পাইপে, আর গুলিখোরেরা খায় ছোটো একটা হুঁকায় নল লাগিয়ে। চণ্ডুখানায় তখন একজন চীনেম্যান একখানা সোফার উপর শুয়েছিল, তার দেহের কোমর থেকে পা পর্যন্ত সোফার নীচে ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটা মৃতদেহ! —তার শরীরে কোথাও প্রাণের লক্ষণ নেই! নেশার ফলে সে এখন সংসারের দুঃখঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাঞ্ছিত ও দুর্লভ বিস্মৃতিকে লাভ করেছে। চণ্ডু নাকি শুয়ে শুয়েই টানতে হয়— নইলে আফিমের ধোঁয়া এত শীঘ্র মস্তিষ্কের ভেতরে গিয়ে পৌঁছায় যে, উপভোগে বাধা উপস্থিত হয়। খানিকক্ষণ চণ্ডুর সেবন করার পরেই চণ্ডুখোর আর উঠতে বা নড়তে পারে না, তখন সে সদ্যোজাত শিশুর চেয়েও অসহায়, একটা মাছি পর্যন্ত মারা তার পক্ষে অসম্ভব! এমন নেশাও মানুষ করে!

তারপর আমরা রাস্তায় এসে, এই আলো-আঁধারির রহস্যে ভরা, গুন্ডার বিচরণক্ষেত্র, সরু সরু গলি, জুয়াখানা, চণ্ডুর আড্ডা, মন্দির-হোটেল ও পানাগারে এবং চীনে ছেলে-মেয়ে বুড়োর জটলাতে বিচিত্র 'চায়না টাউন'-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলুম। এইরকম চীনেপাড়া পৃথিবীর সব দেশেই আছে— কারণ চীনেরা ভবঘুরে জাতি, বাঙালির মতো ঘরমুখো নয়। শুনেছি পৃথিবীর সর্বত্রই চীনেপাড়া দেখতে নাকি একইরকম। আমেরিকা ও বিলাতের চীনেপাড়া নেশা, নানা পাপ ও অশান্তির জন্যে বিখ্যাত। কলকাতার চীনেপাড়া ততটা ভয়ানক না হলেও সাধারণের পক্ষে রাত্রে এখানে যাওয়াটা বিশেষ নিরাপদ নয়! অন্ধকার আনাচকানাচ থেকে যে-কোনো মুহূর্তেই ছোরা-ছুরির মতো বিদ্যুৎচমক জ্বলে উঠতে পারে।

চতুর্থ দৃশ্য

গণিকা পল্লি

কলকাতার নৈশ নাট্যের প্রধান পাত্রী হচ্ছে বারবনিতারা। কলকাতায় এমন শ্রেণির লোক নেই বললেই হয় বারবনিতার গৃহে যাদের আনাগোনা নেই। কলকাতার বারবনিতার সংখ্যা ধরা যায় না। কারণ এমন বারবনিতা এখানে অগুনতি আছে, যারা নানান রকম জীবিকার আড়ালে আত্মগোপন করে, আদম সুমারিতে তাদের নাম ওঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাবুদের ঘরের দাসীদের কথাই ধরুন। অনেক নীতিবাগীশ বাংলা থিয়েটার দেখতে যান না এই অজুহাতে যে, বারবনিতার সংস্পর্শে আমাদের রঙ্গালয় কলঙ্কিত। কিন্তু তাঁরা দিন-রাত যাদের সংস্পর্শে আছেন, সেই দাসীরা কী? অধিকাংশই বারবনিতা! অনেক বাবু ঘরে বসেই তাদের উপভোগ করেন এবং কলকাতার প্রত্যেক পাড়াতেই এমন বাবুর সংখ্যা অল্প নয়!

কলকাতা শহরে বারবনিতার প্রধান আড্ডা হচ্ছে এইগুলি— সোনাগাছি, রূপোগাছি, জয়মিত্রের গলি, আপার চিৎপুর রোড, বউবাজার, কড়েয়া, হাড়কাটা গলি, হরি-পদ্মিনীর গলি, শেটবাগান, নতুন বাজার, মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, ফুলবাগান, কেরানিবাগান, শশিভূষণ সুরের গলি, বেনেটোলা, গরাণহাটা, ঢাকাপটি, জোড়াবাগান ও মালাপাড়া গলি প্রভৃতি।[৪.১] এ ছাড়া কলকাতার অধিকাংশ পল্লিতেই কম বা বেশি সংখ্যায় বারবনিতা আছে— অর্থাৎ আমাদের এই শহরটি অবিদ্যার দ্বারা প্রায় আচ্ছন্ন বললেই চলে। নিশ্চয়ই কলকাতার বেশিরভাগ লোকই এদের বাড়িতে প্রায়ই আসে-যায়, নইলে দিনে দিনে এরা দলে এত ভারী হয়ে উঠছে কেন? চরিত্র সম্বন্ধে বাঙালির ধারণা খুব উচ্চ বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য বাঙালির নীতিজ্ঞান এদিকে কোনো কালেই বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেনি। প্রাচীন গ্রিসের মতো[৪.২], দেড়-শো বৎসর আগে পর্যন্ত বাংলার পল্লিতে পল্লিতে বারবনিতার গৃহই ছিল গ্রামবাসীদের সাধারণ মিলন স্থান। পাড়ার বৃদ্ধেরা হরিনামের ঝুলি হাতে করে অবিদ্যার গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে এসে হাজিরা দিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে আসত যুবকগণও। এর মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জা বা লুকোচুরি ছিল না, কারণ সেকালে এই ব্যাপারটা নির্দোষ বলেই গণ্য করা হত। নানা আলোচনায় সন্ধ্যার খানিকটা কাটিয়ে, সকলে আবার যে যার বাড়িতে ফিরে যেত। অর্থাৎ অবিদ্যার আলয় ছিল সেকালে পল্লির প্রধান বৈঠকখানা। কিন্তু সেকালের কথা এখন থাক।

কলকাতার দেশি বারবনিতার মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ আছে। রাস্তা বা গলির ওপরে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা হচ্ছে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের বারবনিতা। তারা প্রায়ই একতলা খোলার ঘরে বাস করে, অন্ধকার ও আবর্জনার মধ্যে। চাকর, মুটে ও গরিব ছোটোলোকরাই তাদের রূপের উপাসক। তার ওপরের স্তরের বারবনিতারা থাকে দোতলা মাঠকোটায়[৪.৩]। মালাপাড়া গলি, ঢাকাপটি ও জোড়াবাগান প্রভৃতি পল্লিতেই এদের বাস। সাধারণত গদিওয়ালা, দোকানি ও ধনীদের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরাই এখানে আমোদের খোঁজ নেয়। তারপর কোঠাবাড়ির একতলা ঘরের বারবনিতা। তারা কিছু ভদ্র। তার ওপরের স্তরে চিৎপুর রোড, হাড়কাটা গলি ও হরিপদ্মিনী গলির বারবনিতা— যাদের বাস কোঠাবাড়ির দোতলায় বা তেতলায়। সাধারণত কেরানি প্রভৃতি দ্বারাই তাদের রূপের ব্যবসা চলে যায়।

তার ওপরের স্তরই হচ্ছে সর্বপ্রধান স্তর। এ স্তরের মধ্যে আবার দুই দল— যারা বাঁধা, আর যারা ছুটো। বাঁধারাই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত। এদের অনেকে দেড়-শো থেকে তিন-চার-শো টাকা পর্যন্ত মাসিক মাহিনা পায়। অনেকে আবার পাঁচ-শো, সাত-শো— এমনকী হাজার টাকা পর্যন্ত বৃত্তি ভোগ করে। ছুটোদের দৈনিক দর্শনী আট-দশ টাকা থেকে বিশ-পঁচিশ টাকা পর্যন্ত। যারা ভালো নাচ-গান জানে, তাদের দৈনিক রোজগার আরও বেশি— সময়ে সময়ে এক-শো দেড়-শো টাকা পর্যন্ত। এই স্তরে আর এক দল বারবনিতা আছে, যারা কতক 'বাঁধা' কতক 'ছুটো'। তাদের কারোর বা বাবু আসে হপ্তায় নির্দিষ্ট কয়েক দিন, বাকি দিনে সে স্বাধীন। কারোর বাবু আসে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য— বাকি সময়ে সে যাকে খুশি তাকেই অভ্যর্থনা করতে পারে। এই নির্দিষ্ট কালের বাবুরা 'টাইমের বাবু' নামে বিখ্যাত। উচ্চস্তরের বারবনিতাদের প্রধান আস্তানা সোনাগাছি, রুপোগাছি ও সিমলার মধ্যে। এ স্তরের বারবনিতারা প্রায়ই নৃত্য ও সংগীত কলায় বিশেষজ্ঞ। অনেকে বেশ লেখাপড়া জানে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভক্ত পাঠিকা। এরা শরীরের ওপর তেমন অত্যাচার করে না বলে, এদের মধ্যে পরমা সুন্দরীরও অভাব নেই। এদের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা প্রায়ই বেশ শিষ্ট ও অশ্লীলতা বর্জিত। এই শ্রেণির বারবনিতারা বেশি বয়সে বড়ো একটা অর্থকষ্টেও পড়ে না— কারণ অনেক হতভাগ্যই এদের টাকার পাহাড়ের উপরে বসিয়ে, নিজেরা কাঙাল হয়ে পথের ধুলোয় গিয়ে বসে। তার ওপরে, প্রাচীন বয়সে এদের গর্ভজাত বা পালিত কন্যারাও টাকা রোজগার করে। মেয়ের টাকায় মায়ের দিন নিশ্চিন্তভাবে চলে যায়। বৃদ্ধ বারবনিতারা প্রায়ই বাড়িওয়ালি হয়!

সকল স্তরের প্রায় প্রত্যেক বারবনিতারই এক একটি নিজস্ব মানুষ পোষা থাকে। এই অবিদ্যার প্রেমপাত্র ঘৃণিত জীবগুলোর মধ্যে ভদ্রলোকের সন্তানেরও অভাব নেই। অবিদ্যারা রোজগার করে নিজেদের পয়সায় এদের খাওয়ায় ও জামাকাপড় পরায়। এই নর-কুকুরগুলো 'নাই' পেয়ে প্রায়ই মাথায় চড়ে বসে এবং যার পয়সায় বেঁচে আছে নির্দয়ভাবে তাকেই মারধর করে। কিন্তু হতভাগিনীরা তবু তাদের ছাড়তে পারে না— রূপোপজীবিনীর ভালোবাসাও এমন গভীর। এত সুখে থেকেও তাদের মনের মানুষরা প্রায়ই অন্য কোথাও উধাও হয়, তখন অনেক বারবনিতা শোকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে! এমন আত্মহত্যা এদের মধ্যে হামেশাই হচ্ছে। এইসব ব্যাপারে বোঝা যায়, বারবনিতার হৃদয়কে আমরা যেরকম শুষ্ক মরু বলে মনে করি, আসলে তার অবস্থা ততটা ভয়ানক নয়। হাজার হোক তারাও যে মানুষ! দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেমে তারাই বা বঞ্চিত থাকবে কেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পতিতা' কবিতায় এই কথাটি সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন—

হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?

ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম

ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই?

নাহিক করম, লজ্জা-সরম,

জানিনে জনমে সতীর প্রথা,

তা বলে নারীর নারীত্বটুকু

ভুলে যাওয়া, সে কি সহজ কথা?

আমি শুধু নহি সেবার রমণী

মিটাতে তোমার লালসা-ক্ষুধা!
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গ-সুধা!
দেবতারে মোর কেহ তা চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা!

‘পাপীকে ঘৃণা না করে পাপকে ঘৃণা করো’ —খ্রিস্টের এ বাণী সকলেরই মনে রাখা উচিত। এই যে পাপিনীর দল, ‘ধরার নরক সিংহদুয়ারে’ এরা কেবল সন্ধ্যাবাতিই জ্বালায় না। খোঁজ রাখলে দেখবেন, দেহদানের পাপ বাদ দিলে এদের অনেকেই ‘মানুষ’ হিসেবে কারোর চেয়েই খাটো হয়ে পড়বে না। কিন্তু তাদের এক পাপেই সমাজের যে যথেষ্ট অপকার হচ্ছে, তাতেও আর কোনো সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই আমাদের সহানুভূতি এখানে অন্ধ না হয়ে পারে না। এদের রূপ-মোহে সমাজে যে নিত্য নব কত পাপের সৃষ্টি — চুরি, জুয়াচুরি, খুনখারাপি— হচ্ছে, পুলিশ-কোর্টে প্রতিদিন হাজিরা দিলে সেটা জানতে আর বাকি থাকে না। মন তখন স্বভাবতই এদের প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা না হতেই চিৎপুর রোডের বারান্দায় রূপ বা কুরূপের প্রদীপগুলি সারি সারি বাহার দিয়ে বসে এবং রাস্তাতে গৃহাভিমুখী কেরানিবৃন্দ ঊর্ধ্ব-মুণ্ড ব্রত গ্রহণ করে। এই ব্রত পালন করতে গিয়ে অনেকেই মাঝে মাঝে গাড়ি চাপা পড়বার মতো হয়, কিন্তু সে ধাক্কা কোনোক্রমে সামলে নিয়েই ব্রত পালকেরা আবার একনিষ্ঠ ভক্তের মতো বারান্দার ওপরে ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপিত করে। ধন্য সে অধ্যাবসায়, যার মধ্যে প্রাণের ভয় নেই! কে বলে বাঙালি ভীরু? ...এই সময়েই অনেক পুরুষ পুঙ্গব রাত্রের ‘খাদ্য’ পছন্দ করে ফেলেন এবং তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে গা-মুখ ধুয়ে সাজপোশাক বদলে, একটু ঠান্ডা হয়েই নির্বাচিত খাদ্যে ছোঁ মারতে ছোটেন! চিৎপুর রোডের বারান্দা-বিপণিতে সাজানো দেহ-পণ্যের প্রধান খরিদ্দার যে মাছি মারা কেরানির[৪.৪] দল তার জ্বলন্ত প্রমাণ, মাসকাবারের পরের প্রথম শনিবারে প্রায় কোনো পণ্যই ক্রেতার অভাবে পড়ে থাকে না! যত বড়ো কুৎসিত স্ত্রীলোকই হোক না, অন্তত সে-রাত্রের জন্যও তার একজন না একজন উপাসক মিলবেই মিলবে!

চিৎপুর রোডে রাত্রিতে এই বারান্দা-বিলাসিনীদের মুখ সুশ্রী কী কুশ্রী পথ থেকে দেখে তা চেনা যায় না। পুরুষরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে এবং ‘রূপসিরা’ও বাইরের বারান্দা ছেড়ে বাড়ির ভিতরের বারান্দায় এসে আপন আপন ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়ায়। তারপর দরদস্তুর। কিন্তু মাল না দেখে তো দর চলতে পারে না, কারণ অধিকাংশ বাড়ির ভেতরেই পূর্ণিমাতেও অমাবস্যা হয়ে থাকে। এক রাত্রের বহু বাবুরা প্রায়ই তখন এমন এক সুন্দর উপায় অবলম্বন করেন, যাতে করে শ্যামও থাকে, কুলও বাঁচে— অর্থাৎ মালও দেখা হয়, চক্ষুলজ্জাও অক্ষত থাকে! তাঁরা মুখে ধাঁ করে একটা সিগারেট গুঁজে, সেটা ধরাবার অছিলায় দেশলাই জ্বালেন এবং তারই অস্থায়ী আলোতে সামনের রমণীটিকে যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখে নেন!

সাধারণত দরদস্তুরের বাঁধা-ধরা নিয়ম এই—

বাবু। কিগো, লোক বসাবে?

বিবি। কতক্ষণ বসবেন?

কেউ বলে, এক বা দুই ঘণ্টা। কেউ বলে, সারা রাত। এক ঘণ্টার দর্শনী চার টাকা শুনলে বাবুরা হাঁকেন, দু-টাকা। সারা রাতের দর্শনী আট টাকা শুনলে বাবুরা বলেন, চার টাকা। তারপর মাঝামাঝি একটা রফা হয়। বেশি কম দর হাঁকলে, 'না মশাই, এখানে হবে না, খোলার ঘরে যান' —এমনই ধরনের একটা অযাচিত উপদেশ দিয়ে, আঁচল ঘুরিয়ে ও কোমর দুলিয়ে বিবিরা আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান।

সোনা ও রুপোগাছির ছুটো অবিদ্যারা নিতান্ত দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো অবস্থা না হলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে না। প্রায়ই চেনাশুনো বন্ধুর দয়াতেই তাদের ঘর খালি যায় না। বাইরের অচেনা লোক যারা আসে, তারাও দালালের মধ্যস্থতাতেই আনীত হয়। দর যা ঠিক হয়, তার চার আনা অংশ পায় দালালরা। মাঝে দালাল থাকলে বাবুদের টাকাও দিতে হয় বেশি, কারণ যার দাম আট টাকা, দালালের মধ্যস্থতায় এলে তারই দাম হয় দশ টাকা। বিবির দাম বেশি হলে নিজের পাওনাও বেশি হবে, তাই দাম চড়াবার জন্যে দালালরাও যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করে না! বিবির দেহের দামের ওপরে বাবুর আর দুটি বাঁধা খরচ আছে। চার বা আট আনার পান এবং বিবির বেয়ারাকে আট আনা বা এক টাকার বখশিশ! তার ওপরে কোনো কোনো সুচতুরা বাবুর কাছ থেকে আজ্ঞার স্বরে আবদাব ধরে সে-রাতের জন্য নিজের ও মায়ের খাইখরচটাও আদায় করে নেয়। গ্রীষ্মের সময়ে রাস্তা দিয়ে ফুলওয়ালা গেলে আট আনা এক টাকার বেলের গোড়ের ফরমাশ হওয়াও খুব স্বাভাবিক। তার ওপরে ট্যাক্সিতে চড়ে গড়ের মাঠ পর্যন্ত বেরিয়ে আসবার বায়নাও আছে— তারও খরচ তিন-চার টাকার কম নয়। অধিকাংশ বাবুই বাড়িতে কিপটে হলেও এখানে এসে একেবারে দাতা কর্ণের নব্য সংস্করণে পরিণত হন এবং যেসব রাতের পাখি সবে উড়তে শিখেছে, তাদের হাতই দরাজ হয় সবচেয়ে বেশি। এ পথে যারা চেনা পথিক, অর্থাৎ যাদের হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে, তাদের কাছ থেকে বিবিরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন না। অবশ্য পুরাতন পাপীরা অচেনা হলেও, ভাবভঙ্গি দেখেই তাদের চিনে ফেলতে বিবিদের বেশি দেরি লাগে না। তবু সে ক্ষেত্রেও সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয় যথেষ্ট, অর্থাৎ বিবিরা চান পকেট ছ্যাঁদা করতে, আর বাবুরা চান সন্তর্পণে তা সামলাতে। বিবিরাই কিন্তু জেতেন বেশি। বাবুর ট্যাঁক গড়ের মাঠে পরিণত করবার বিবিধ উপায় তাঁদের নখদর্পণে আছে। যথা, বাবুর জন্য মদের বোতল এল। বোতল যখন এল, তখন পান করতেই হবে। কিন্তু বাবু পান করেন কীসে? বিবির ইশারায় বেয়ারা ঘরের চারিদিকে খানিকক্ষণ মিছে খোঁজাখুঁজি করে বলে দিলে— 'গেলাস সব ভেঙে গেছে!' অগত্যা বাবু নাচার হয়ে একটা বা দুটো নতুন গেলাস কিনে আনবার জন্য পকেটে হাত দিতে বাধ্য হলেন। ফলে আর কিছু না হোক, বিবির ঘরে অন্তত গেলাসের সংখ্যা তো বাড়ল বটে। পুরোনো পাপীদের কাহিল করবার জন্য এমনই আরও ঢের ছোটো বড়ো উপায় আছে।

অনেকের বিশ্বাস, টাকা দিলেই অবিদ্যার ঘরে গিয়ে অনায়াসে বসতে পারা যায়, তার কোনো পছন্দ নেই। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও সম্পূর্ণ সত্যও নয়। অধিকাংশ বারবনিতাই যাকে তাকে ঘরে বসতে দেয় না এবং বেশি টাকা কবলালেও অচেনা লোকের সঙ্গে সহজে সারা রাত কাটাতে রাজি হয় না— অবশ্য খুব সম্ভব, ভয়েই। তাদের মতো অসহায় জীবনের তুলনা কোথায়? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অবিদ্যারা চেহারা

পছন্দ না হলে দ্বিগুণ মূল্যেও যে আত্মদানে রাজি হয় না, এ একেবারে খাঁটি কথা। তারা ইতর ও ভদ্রের বিচার করে লোক বসায় বা বিদায় করে দেয়, ছোটোলোকের ট্যাঁক ভরা টাকা থাকলেও তাদের চৌকাঠ মাড়াতে দেয় না।

আগেই বলেছি, অবিদ্যার চরিত্রের মনুষ্যত্বের অভাব নেই। তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি। অভিভাবকেরা খবর রাখেন না যে, কত ইস্কুলের বালক পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সেই কুস্থানে আনাগোনা করে। এসব জায়গায় বালকদের উপযোগী বালিকারও অভাব নেই, তবু অনেক এঁচোড়ে পাকা বালক আবার তাতেও তুষ্ট না হয়ে, তাদের চেয়ে সাত-আট-নয়-দশ বৎসরের বয়সে বড়ো যুবতীদের প্রতি লোভ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রায়ই তাদের চেষ্টা বিফল হয়। বেশি টাকা দিলেও তাদের বিকৃত মনের বাসনা চরিতার্থ হয় না, বরং বকুনির চোটে তারা চটপট সরে পড়তেই বাধ্য হয়।

সন্ধ্যা হচ্ছে রূপের দোকান সাজানো এবং দরদস্তুরের সময়। তখন অবিদ্যা পল্লির বিশেষত্ব বড়ো ধরা পড়ে না। বাবুরাও তখন সবে এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, আলাপ তখন জমে ওঠেনি এবং নেশা মাথায় চড়েনি— কাজেই চারিদিক তখনও অনেকটা শান্ত।

কিন্তু রাত ন-টার পরেই এখানকার আবহাওয়া যায় একেবারে বদলে। গেলাসে একের পরে দুই পেগ ঢালতে ঢালতেই বাবুদের চোখে দুনিয়ার রং গোলাপি হয়ে ওঠে, তিন পেগের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হয়। পথের দু-ধারে ঘরে ঘরে হারমোনিয়াম, গান ও বিকট স্বরে বাহবার আওয়াজ উঠে পাড়া একেবারে সরগরম করে তোলে। কোথাও বিবি ঘুঙুর পরে, মাথায় মদের গেলাস বসিয়ে, চোখ, ভুরু, ঠোঁট ও হাত লীলায়িত করে তনু দুলিয়ে নাচ শুরু করেন, বাবু হারমোনিয়াম ধরেন, ভাড়াটে তবলচি বা বাবুর মোসাহেব ঘন ঘন মাথা নেড়ে তবলা বাজায়, এবং জানলা বা দরজা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে পথের ওপরে কাতারে কাতারে কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে নেশার খেয়ালে বাবুরও হঠাৎ নাচের শখ হয়, হারমোনিয়াম ঠেলে ফেলে এক লাফে তিনি বিবির পাশে গিয়ে দাঁড়ান, কোঁচার খুঁট ঘোমটার মতো করে মাথায় দিয়ে তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে হেঁড়ে গলায় গান ধরেন। তার পরেই অত্যধিক ভাবের আবেগে বিবিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করবার চেষ্টা এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিবির মাথার উপর থেকে মদ-ভরা গেলাসের সশব্দ পতন।

'ওই যাঃ! আমার গেলাস ভেঙে গেল!'

'যাক গে, তুই নাচ!'

'হায় হায়, আমার নতুন গেলাস!'

'তোর নতুন গেলাসের নিকুচি করেচে— আমাকে কি তেমনি বাবু পেয়েচিস? একটা গেল— দশটা হবে! এই বেয়ারা! বেয়ারা!'

'হুজুর' বলে বেয়ারার প্রবেশ।

'নিয়ে আয় এক ডজন গেলাস— এই নেঃ!' একখানা দশ টাকার নোট নিক্ষেপ ও মুখ টিপে হেসে বেয়ারার প্রস্থান!

'এইবার আমার কাছে আয়, একটা ...!' বিবির মুখের কাছে বাবুর মুখ এগোল।

'আঃ কী করো!'

'না মাইরি, নইলে মরে যাব!'

‘আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়লুম তো! ঘরে যে লোক রয়েছে।’

‘ড্যাম ইট— লোক? এই সবাই চোখ বোজ! কি এখনও বুজলি নে? মারব এই সোডার বোতাল ছুড়ে!’

তবলচি, মোসাহেব ও বন্ধুরা চট করে চক্ষু মুদে ফেললে। গোটাকতক অস্পষ্ট শব্দ শুনে যখন বুঝলে চুম্বন-পর্ব নিরাপদে সমাপ্ত, সবাই তখন আবার ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

‘আর একখানা গান গা ভাই।’

‘যা চ্যাঁচাচ্ছে, এই গোলমালে গান?’

‘না না, এই চুপ করে বসলুম, আর একটা কথা কইব না।’

আবার গান শুরু—

কেটে দিয়ে প্রেমের ঘুড়ি, আবার কেন লটকে ধর!

একটানেতে বোঝা গেছে, তোমার সুতোর মাঞ্জা খর!

রাস্তায় হাঁকলে, ‘কুলপি মালাই কা বরফ।’

‘এই বরফ! বরফ!’

ফের গান থেমে গেল।

বাড়ির ভেতর অন্য অন্য ঘরে তখন হয়তো একদল মাতাল বাবুর সঙ্গে আর কোনো বিবি ও তাঁর মায়ের বিষম ঝগড়া বেধে গেছে। আর এক ঘরে ‘টাইমে’র বাবু হয়তো যথাসময়ে এসে দেখেন, তাঁর ঘরে অন্য লোক দিব্যি তাঁকিয়া ঠেস দিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছে। তিনি অমনি বিবির উপরে কিল-চড় বর্ষণ আরম্ভ করলেন এবং অপর বাবুটি ফ্যাসাদ দেখে তিরবেগে পলাতক হলেন, বাবুর গর্জন ও বিবির আর্তনাদে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। তারই সঙ্গে এসে মিলল বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে নানা নারী কণ্ঠের গীতধ্বনি আর হাসির হররা আর বাহবার হইচই।

সাধারণত এ-একটি অবিদ্যার আলয়ে রাত্রিকালে প্রায় এই ধরনের দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় হয়। এরই নাম আমোদ! এরই জন্যে বাবুরা পাগল। অবশ্য এর ব্যত্যয় আছে। অনেক অবিদ্যার বাড়িতে সত্যসত্যই উচ্চশ্রেণির নাচ-গান বাজনার চর্চা হয়, গোলমাল সেখানে নেই বা খুব কম এবং বাবুরাও শান্ত ও ভদ্র!

রাত যত গভীর হয়, বিবি ও বাবুরা নেশায় কাবু হয়ে পড়েন ততই। তবলচি তখন দক্ষিণা নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে, তবলা ও বাঁয়া দুটো বিছানার ওপরে কাত বা উপুড় হয়ে পড়ে নীরবে গড়াগড়ি দিচ্ছে— তবু বিবির গান আর কিছুতেই থামতে চাইছে না। কিন্তু সুরাবিকৃত কণ্ঠের সেই ধ্বনি, গান না কান্না, না প্যাঁচার চেয়েও বেশি কর্কশ কোনো জীবের চিৎকার— তা বোঝা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। বাবুও বসে বসে মাঝে মাঝে ঘোরতর নেশায় চোখ মুদে ঢুলে পড়ছেন এবং মাঝে মাঝে চমকে প্রাণপণে চোখ চেয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন— ‘কেয়াবাত’! ...’তোফা’... ‘আ মরে যাই!’ ‘বা বা বা বা— বহুৎ আচ্ছা!’

এসব বাড়ির প্রধান বিশেষত্ব— সারি সারি তাকিয়াগুলো স্বস্থানচ্যুত হয়ে বিছানার কোণে, মাঝে, আশেপাশে বা ঘরের মেঝেতে কে কোথায় বিশৃঙ্খলভাবে ঠিকরে পড়েছে, শয্যার দুগ্ধ-ধবল পরিষ্কার চাদর পানের পিকে, মাংসের ঝোলে, আধ কামড়ানো হাঁসের ডিমে ও চলকে পড়া মদে বিচিত্র হয়ে অতি-বৃদ্ধের লোলচর্মের মতো কুঁকড়ে গেছে, তারই

এখানে-ওখানে বাবুর কোনো বন্ধু নেশায় বেহুঁশ হয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে, এবং মেঝের ওপরে খালি ডিস, পাউরুটির টুকরো, মাংসের হাড়, পানের দোনা[৪.৫] ও কলাপাতা এবং উপুড় হয়ে পড়া পিকদানি বা ডাবর সব একসঙ্গে জড়িয়ে বা ছড়িয়ে আছে। তার ওপরে বাবুর এক ঘুমন্ত বন্ধু বিছানায় শুয়ে শুয়েই— তরল ও নিরেট যা-কিছু গলা দিয়ে গলিয়েছিলেন— পেটের ভিতর থেকে হুড়হুড় করে অত্যন্ত হঠাৎ সে সমস্তই আবার বদন-পথে বার করে দিলেন।

এ ভূতুরে উপভোগ দৃশ্যের উপরে এইখানেই পর্দা ফেলে দেওয়া সংগত মনে করছি।

অভাগিনী বারবনিতা! কী অস্বাভাবিক জীবনই তাদের যাপন করতে হয়। নিত্যই তাদের ঘরে যেসব দুর্দান্ত অতিথি আসে, তাদের অধিকাংশেরই প্রাণে দয়া বা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই, তাদের উৎকট আনন্দের প্রবাহ বন্যার চেয়েও নিষ্ঠুর! কিন্তু সমস্ত নীচতা ও জঘন্যতা অবিদ্যারা মৌনমুখে, মাথা পেতে সহ্য করে— বাসুকীর[৪.৬] চেয়েও তারা সহিষ্ণু! যে টাকার জন্যে তারা এত করে, এই আশ্চর্য সহিষ্ণুতার তুলনায় তার মূল্য তো নগণ্য। মানুষ হয়ে এই পশু জীবনযাপন আমার কাছে কল্পনাতীত। এর উপরে আবার আছে প্রতি রাত্রেই প্রাণের ভয়। প্রায়ই ভোরবেলায় ঘরের দরজা খুলে দেখা যায়, কোনো অভাগিনী বিষে বা অস্ত্রে নিহত হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছে —গত রাত্রের বাবুদের সঙ্গে তার অর্থ ও অলংকার সমস্ত অন্তর্হিত! এদের খুন করতে যাদের মায়া হয় না, তাদের বিশেষণ কী, কে জানে? আমি তাদের হত্যাকারী বলতে পারি না, তারা ঢের গুরুতর পাপে পাপী— যে পাপের ধারণা করা অসম্ভব।

গণিকার মেয়ের গণিকা হওয়া ছাড়া উপায় নেই— কাজেই তারা এমনতর অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করতে বাধ্য। কিন্তু যারা কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে আসে, মুহূর্তের জন্যেও তারা যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, তবে তাদের ইন্দ্রিয় লালসার স্বপ্ন এক নিমেষেই ছুটে যাবে। প্রথম দু-চার দিন এমন জীবন হয়তো কোনো কোনো বিকৃত রুচিতে সহ্য হতে পারে, কিন্তু তারপরেই উপভোগের বদলে আসে শুধু জীবনব্যাপী হাহাকার ও দিবারাত্র নরকদাহ। এমন অত্যাচারে জড় যে, সেও কেঁদে ওঠে— মানুষ তো কোন ছাড়! আমি শপথ করে বলতে পারি, সর্বোচ্চ স্তরের সর্বপ্রধান গণিকাও সুখী নয় এবং তার আত্মদানেও উপভোগ নেই। তার মুখে হাসি দেখেছেন? হ্যাঁ, হাসিই বটে! কিন্তু ও-হাসির চেয়ে কান্নাও ভালো! হাসি যে এখানে দুঃখের ঘোমটা।

গণিকারা প্রায়ই যে কুৎসিত হয়, তার কারণ এই অস্বাভাবিক জীবন। এখানকার বিষাক্ত হাওয়ায় তিলোত্তমার রূপের ফুলও দু-দিনে শুকিয়ে যায়। আমার চোখের সামনে কয়েকটা গৃহস্থের মেয়ে গণিকা হয়েছে। তাদের কেউ কেউ পরমা সুন্দরী ছিল। এখনও মাঝে মাঝে তাদের কারুকে কারুকে দেখতে পাই। কিন্তু এখন চেহারা দেখলে ঘৃণায় মুখ ফেরাতে হয়। সবচেয়ে সুশ্রীর রূপের পরমায়ুও এখানে এলে ফুরিয়ে যায় দু-দিনে।

এরকম আবহাওয়াতে পশুত্বের জন্মই স্বাভাবিক। কলকাতা গণিকাপল্লিতে এক একটি বাড়ি আছে, যাদের নাম রাখা চলে পৃথিবীর নরক। সেখানে এক এক দল পুরুষ ও নারী নির্মম এক ব্যবসা চালায়। কলকাতার পথে পথে, বাংলার পল্লিতে পল্লিতে তাদের চর ঘুরছে। তাদের কাজ চারিদিক থেকে মেয়ে ভুলিয়ে আনা। কলকাতার পথে প্রায়ই ছোটো ছোটো মেয়ে হারায়। ওই সব বাড়িতেই তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়। যুবতীরা কিছুদিন এখানে থেকেও যদি এদের কুপ্রস্তাবে মত না দেয়, তবে তাদের নানারকমে শায়েস্তা করা হয়। কেউ অনাহারে বন্দিনির মতো থাকে, কেউ মার খায়। তা ছাড়া আরও ঢের যন্ত্রণা আছে। অনেকের ওপরেই বলপ্রকাশ করা হয়। সুরবালা ও

গায়ত্রীর বিখ্যাত বিচারে এখানকার অনেক গুপ্তকথাই সকলের কাছে জাহির হয়ে গেছে। তার ওপরে আর কিছু না বললেও চলে।

এই গণিকা পল্লিগুলো যত চোর, ডাকাত, খুনে ও গুন্ডার বিচরণক্ষেত্র। তার কারণ, এখানে যেসব রাতের পাখি স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসা বাঁধে, তারা ভরা জেবেই আসে— খালি-পকেটের আবির্ভাব এখানে নিষিদ্ধ। এই পকেটের ভেতরে হাত চালাবার জন্যেই বদমায়েশরা রাত্রিবেলায় এখানে আড্ডা গেড়ে বসে। কলকাতার কোনো না কোনো গণিকা পল্লিতে একাধিক মারপিট, হত্যা বা রাহাজানি হয়নি, এমন রাত্রি দুর্লভ। এখানে ভাড়াটে গুন্ডার সংখ্যাও অগুনতি। রমনী সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা একপক্ষে নিযুক্ত হয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে।

মধ্যে রুপোগাছিতে হামেশাই খুনখারাপি হত। কাজেই সেখানে পুলিশ পাহারার কড়াকড়ি হয় এবং এ-পাড়ার শিষ্ট ও অশিষ্ট পথিকদের যার ওপরেই সন্দেহ পড়ে, তাকেই নির্বিচারে বন্দি করা হয়। গুন্ডার ভয়েও বাবুদের ফুর্তি মাটি হয়নি, কিন্তু পুলিশের সুনজরে পড়বার ভয়ে তাঁরা এমন দমে গিয়েছিলেন, যার ফল হয়েছিল অত্যন্ত আশ্চর্য। এই পুলিশ-প্রভাবের যুগে একদিন রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়ে রুপোগাছির অবস্থা দেখতে গেলুম। ...বিকালে আপিস ভাঙবার সময়ে লালদীঘির রাস্তায় যেরকম জনতা ও নানাজাতীয় গাড়ির ভিড় হয়, রাত সাড়ে-এগারোটার সময়ে রুপোগাছির ভেতরটাও দেখতে হয় সেইরকম। কিন্তু সে-রাত্রে গিয়ে দেখলুম, অবাক ব্যাপার। সমস্ত পথ অভিশপ্ত মরুর মতো শূন্যতায় ধূ ধূ করছে— একখানা গাড়ি নেই, একজনও পথিক নেই, চারিদিক মৃত্যুর মতো স্তব্ধ! কোথায় সেই পরিচিত নাচ-গান-বাজনার আওয়াজ, কোথায় সেই দশআনা-ছয়আনা চুল-ছাঁটা, পা-অবধি ঝোলানো চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা, সুরা-রঙিন-চক্ষু কাপ্তেনবাবুর দল, কোথায় সেই হরেক রকমের চিৎকারে রত ফিরিওয়ালা এবং পথিকদের গায়ে পড়া দালালের দল! সব যেন কার মন্ত্রগুণে অদৃশ্য হয়েছে! ...পথের মাঝে মাঝে খালি দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো লাঠির উপরে ভর দিয়ে লালপাগড়ির দল— পাথরের মূর্তির মতো। একমাত্র তারা ছাড়া আর কোনো জীবনের লক্ষণ নেই। পাছে আমাদেরও ধরে আবার একরাত্রি ফাঁড়িতে বাস করবার জন্য নিয়ে যায়, তাই আগেই সাবধান হয়ে আমরা এক জমাদারকে ডেকে, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য খুলে বললুম। পাহারাওয়ালারা আমাদের কথা বিশ্বাস করলে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদেরকে গ্রেপ্তারও করলে না, কেবল নির্বাক বিস্ময়ে আমাদের মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইল বোধ করি এই ভেবেই যে— এরা আবার কেমন সাহসী লোক, হাতকড়ির ভয় না রেখেই এ তল্লাটে এত রাত্রে অকারণে বেড়াতে এসেছে!...

বড়ো রাস্তা ছেড়ে, আশপাশের সরু গলিতে অর্থাৎ গণিকাদের প্রধান আস্তানায় ঢুকলুম। সেখানকার নির্জনতা আরও গম্ভীর, কারণ সেখানে আবার পাহারাওয়ালারাও নেই। দু-ধারের উঁচু বাড়িগুলো একান্ত স্তব্ধভাবে খাড়া হয়ে যেন স্তম্ভিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনো বাড়ি থেকে একটিমাত্র আলোকরেখা বাইরে এসে পড়েনি, প্রত্যেক জানলা দরজা খুব সাবধানে বন্ধ করা। রুপোগাছির এমন শ্মশানের চেয়ে শোচনীয় দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখিনি— এ যেন এক পরিত্যক্ত পল্লি, কিংবা হঠাৎ এক ভীষণ মড়কে এখানকার সমস্ত মানুষই যেন মরে গেছে, আর তাদের মড়াগুলো এখনও যেন প্রতি বাড়ির ভেতরেই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা বুকচাপা বোবা আতঙ্ক যেন চারিদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে এবং থমথমে রাত করছে যেন ঝিম ঝিম ঝিম! আমার বুকটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করতে লাগল। মাথার ওপরে আচম্বিতে একটা অদৃশ্য প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল— ঠিক যেন প্রেতের আর্তনাদ! ওঃ! সে চিৎকার সেদিন কী অস্বাভাবিকই

শোনাল— আমার দেহের রক্ত যেন জল করে দিয়ে গেল... রুদ্ধশ্বাসে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। পাশের বাড়ির ভেতর থেকে গলার আওয়াজ পেলুম— কারা খুব চুপিচুপি কথা কইছে। সাড়া পেয়ে মনটা তবু কিছু আশ্বস্ত হল, কিন্তু পথের ওপরে আমাদের জুতোর শব্দ শুনেই জীবনের সেই ক্ষীণ আভাসটুকুও অন্তিমের শেষ অস্পষ্ট কথার মতো এক মুহূর্তে থেমে গেল! ...আর পারলুম না, তাড়াতাড়ি গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলুম... পাহারাওয়ালাদের কঠিন দৃষ্টির সামনে। এই প্রেত পল্লির মধ্যে তখন পাহারাওয়ালাদেরও দেখে আমার মনে হল বন্ধুর মতো।

সোনাগাছিতেও পুলিশ ধরপাকড় করতে ছাড়েনি। ফলে সেখানকার জনতাও খুব পাতলা হয়ে গেলেও, সে পাড়ার অবস্থা কিন্তু রুপোগাছির মতো এতটা শোচনীয় হয়নি। পুলিশ যদি দীর্ঘকাল এমনি সতর্ক থাকে, তবে কলকাতার একটা মস্ত উপকার হবে— অর্থাৎ রূপের ব্যবসা এখান থেকে একেবারে উঠে যাবে।

গণিকা পল্লিতে কেবল বদমায়েশদের জন্য নয়, আরও নানা কারণে অনেক সময়ে নির্দোষ লোকরাও সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর এইটেই তো স্বাভাবিক। এক পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে অন্য পাপেরও সংস্পর্শে আসতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচে একটি ঘটনা দিলুম! ঘটনার যিনি নায়ক, এখন তিনি পরলোকে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর নাম অজানা নয়। অবশ্য তাঁর আসল নাম আমি করব না।

দুই বন্ধুর সঙ্গে হোটেলে খেতে বসে সতীনবাবু মনের খুশিতে সুরা দেবীর প্রসাদের মাত্রাটা সেদিন কিছু অতিরিক্ত করে ফেললেন। রাতও তখন অনেক— একটার কম নয়। এই রাত্রে এই অবস্থায় বাড়ি ফেরা অসম্ভব— বাড়ির লোক বলবে কী! অতএব ঠিক হল সে রাতটা বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিতে হবে।

তিন বন্ধুতে টলতে টলতে পথে বেরিয়ে পড়লেন, গন্তব্যস্থান— কোনো রূপসির বাড়ি।

কিন্তু অত রাত্রে অধিকাংশ দেবীর ঘরেই পূজারি এসে হাজির তো হয়েছেনই, তা ছাড়া যাদের তখনও সে সৌভাগ্য লাভ হয়নি, তারাও সতীনবাবুর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলে না। রাত বারোটার পরে গণিকারা অচেনা লোককে বড়ো একটা ঘরে ঠাঁই দেয় না — বিশেষত এমন মাতাল অবস্থায়। কারণ, প্রাণের ভয়।

সতীনবাবু মহাবিপদে পড়লেন ঘর ও বাহির দুই-ই তাঁর সামনে বন্ধ। তবু তিনি আশা ছাড়লেন না। পথের দু-ধারের বাড়িতেই খোঁজ নিতে নিতে চিৎপুর রোডের উত্তরমুখে ক্রমশ এগিয়ে চললেন।

শোভাবাজারের কাছ-বরাবর এসে হঠাৎ দেখা গেল, একটা বাড়ির ছাদের ওপরে একটি নারী মূর্তি একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সতীনবাবু পথের ওপর থেকেই ইশারায় জানালেন, তাঁদের জন্যে ভেতরে একটা জায়গা চাই।

নারী মূর্তি হাতছানি দিয়ে সকলকে আহ্বান করলে।

সতীনবাবুরা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। এত কষ্টের পর আশ্রয় পেয়ে তাঁদের প্রাণ ভারি খুশি হয়ে উঠল। তেতলায় সেই নারীটির ঘর। এক কথায় দরদস্তুর হয়ে গেল। সকলে ঘরের ভেতরে গিয়ে মেঝের বিছানার ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

তারপরে সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা চলল। আলাপ কিন্তু জমল না। সুন্দরী যেন কী এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আনমনার মতো দু-একটা কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এই বলে সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেল— 'একটু বসুন, এখনি আসচি।'

সতীনবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সুন্দরী তবু ফিরল না। দু-একবার চেঁচিয়ে ডাকলেন— কোনো সাড়া নেই। তখন তিনি উঠে বাইরে বেরোতে গেলেন, কিন্তু দরজা টানতেও খুলল না। বাহির থেকে দরজায় শিকল দেওয়া!

একটু আশ্চর্য হয়ে সতীনবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ঘরের খাটের ওপরে! পা-থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর কে শুয়ে রয়েছে! আর, চাদরেও কীসের দাগ? সামনে ঝুঁকে পড়ে সতীনবাবু দেখলেন ...রক্ত!...

তাঁর বুক যেন হিম হয়ে গেল। বন্ধু দু-জনকেও ডেকে ব্যাপারটা দেখালেন। একজন চাদরের খানিকটা তুলেই ছেড়ে দিয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন।

সতীনবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখলে?'

প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বন্ধু বললেন, 'মড়া! গলা কাটা!'

সকলেরই দেহে কাঁপুনি ধরল! ...এক লহমায় সব নেশার ঘোর উবে গেল!

অনেক কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে সতীনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরুষ, না স্ত্রীলোক!'

'পুরুষ!'

এখন উপায়? ঘরের ভিতর মড়া, আর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। নিশ্চয়ই তাঁদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়, অথচ পালাবার পথ নেই।

সতীনবাবু বারান্দায় ছুটে গেলেন। উঁকি মেরে দেখলেন, ঠিক পাশেই আর একটা বাড়ির ছাদ। বন্ধুদের ডেকে, বারান্দা টপকে কোনোরকমে তিনি পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়লেন। বন্ধুরাও তাঁর অনুসরণ করতে বিলম্ব করলেন না। পর পর কয়েকটা ছাদ পার হয়ে, তাঁরা একটা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। সেটাও গণিকালয়। অচেনা লোক দেখেও কেউ কোনো সন্দেহ করল না।

পথে বেরিয়েই সকলে দেখলেন, একদল পাহারাওয়ালা ব্যস্তভাবে তাঁদের সম্মুখ দিয়েই সেই ভয়ানক বাড়ির দিকে যাচ্ছে। সেখানে আর একটু থাকলেই সকলকে এদেরই কবলে পড়তে হত।

খুব সম্ভব, খুন করে খুনি সরে পড়েছে, আর নিজের গলা বাঁচাবার জন্যই স্ত্রীলোকটা এই নির্দোষ তিনটির ঘাড়েই সব দোষ চাপাবার ফিকিরে ছিল। পুলিশে খবর পাঠিয়েছিল সে ছাড়া আর কেউ নয়।

পঞ্চম দৃশ্য

নিমতলার শ্মশান [৫.১]

জীবনটাই প্রহসন— বিয়োগান্ত হলেও। যুবক পুত্রকে শ্মশানে পাঠিয়ে বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই নারী আবার গর্ভবতী হয়, এই কন্যাদায়ের দেশে সাত মেয়ের গরিব কেরানি বাপ স্ত্রী সহবাস ছাড়তে পারে না, জীবকে বলি দিয়ে মানুষ জড়কে সচেতন বলে আরাধনা করে, আজীবন কাঙালের মতো কাটিয়ে, অন্যে ওড়াবে বলে কৃপণ প্রাণপণে টাকা জমিয়ে যায়— কত বার নাম করব— জীবন-গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে অমনি অগুনতি প্রহসনের দৃশ্য! অভিনয় শেষ করে তাই অভিনেতাদের দেহ যখন নিমতলার চিতার আগুনে এসে অসহায়ভাবে পুড়তে থাকে, তখন চারিদিকে যেন নাটকের অভিনয় হয়, তা নিতান্তই বিয়োগান্ত নয়।

নিমতলার শ্মশানে মাঝে মাঝে গভীর রাতে আমি বেড়িয়ে এসেছি— কত দিন কত রকমের বিচিত্র দৃশ্যই যে আমার চোখে পড়েছে— তা আর বলবার নয়। কাশী মিত্রের ঘাটেও[৫.২] একবার আমি গিয়েছিলুম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কখনো যাব না। মেডিক্যাল কলেজের গাড়ি[৫.৩] তখন ডাক্তারের অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড অনেকগুলো স্ফীত, বিকৃত ও দুর্গন্ধ শব বহে এনেছিল, পোড়ানো হচ্ছিল সেইগুলোকেই। ওঃ, তেমন ভয়াবহ দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলুম, সে রাতে আর ঘুমোতে পারিনি। ভাবলে, আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শুনচি, এখন নাকি সেখানে মড়া পোড়ানোর ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্মশানে যারা বাস করে, তাদের প্রাণ নিশ্চয় কড়া পড়ে কঠিন হয়ে যায়। যে চিতায় সবেমাত্র একটা নরদেহ ভস্মসাৎ হয়েছে, দেখবেন, তারই ওপরে হয়তো কেউ একটা ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে! যে চিতা একজনের দেহকে গ্রাস করলে, সেই চিতাই আর একজনের দেহ পোষণের উপায় করে দিচ্ছে! মানুষ নির্বিকারচিত্তে এই অন্ন গ্রহণ করবে। এ আমার ধারণায় আসে না— মানুষ হয়ে মানুষের মরণে এতখানি অসাড়তা! … একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। মিনার্ভায় থিয়েটার দেখতে গেছি। নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েছে। একবার বাইরে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নিতে এসেছি। হঠাৎ দেখি, রাস্তা দিয়ে একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। খাটের তলা দিয়ে একটা কালো, ন্যাংটো দেহের খানিকটা ঝুলে বেরিয়ে পড়েছে— দড়ির বাঁধন বোধ হয় কোনো গতিকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। গ্যাস ও থিয়েটারের আলো সেই দেহকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শববাহীদের প্রতিপদক্ষেপে সেটা দুলে দুলে উঠছে। …থিয়েটারে এসে ঢুকলুম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে চেয়ে আবার দেখতে পেলুম সেই কৃষ্ণবর্ণ নগ্ন, দোদুল্যমান, অর্ধনির্গত শবদেহকেই। সেদিন আর থিয়েটার দেখতে পারলুম না। …মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শবব্যবচ্ছেদ করলে, হাজার ধুলেও হাত থেকে সেদিন পচা মড়ার গন্ধ যায় না। সেই হাতেই তারা অনায়াসে ভাত খায়। আমি হলে অনাহারে মারা পড়তুম। আমহার্স্ট স্ট্রিটের[৫.৪] অধুনাগত পুলিশ হাসপাতালে মিনিট খানেক শবব্যবচ্ছেদ দেখে, মাথা ঘুরে আমি পড়ে গিয়েছিলুম। তারপর কয়েক দিন আমার একরকম উপোস করেই কেটেছিল। কেন জানি না, খেতে বসলেই মনে পড়ত সেই দৃশ্যটা— মড়া হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় ও

আড়ষ্ট হয়ে আছে, আর একজন লোক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার চেরা পিঠের ভিতর থেকে কী খানিকটা কেটে বার করছে!...

নিমতলার শ্মশানে রাত্রে গিয়ে দেখেছি, হাসি আর অশ্রু সেখানে বাস করে পাশাপাশি। অন্য জাতির সমাধিক্ষেত্রে যে গাম্ভীর্যের ভাব থাকে, হিন্দুর শ্মশানে তা নেই। আমাদের শবযাত্রাতেও তার অভাব। খ্রিস্টান বা মুসলমানের শবযাত্রায় মৃতের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব আছে, কিন্তু আমাদের তা আছে বলে মনে হয় না। প্রায়ই দেখি, মড়ার খাট পথে নামিয়ে শবযাত্রীরা মদের দোকানে ঢুকছে মদ খেতে বা মদের বোতল কিনতে। অনেকে হাসিমুখে গল্প করতে করতে শব বহে নিয়ে যায়। আর আমাদের এই 'বল হরি, হরিবোল' বলে যে চিৎকার, সে তো ভয়ানক। অনেক সময়ে মনে হয়, সে যেন বিকট উপহাসের রব। হিন্দুরা প্রত্যেকেই বোধ হয় জন্ম-দার্শনিক! জীবন যখন অনিত্য, তখন মৃত্যু নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন? ...আমি কিন্তু মরবার আগে বলে যাব, আমার দেহ নিয়ে নিমতলায় যাবার সময়ে কেউ যেন হরিবোল না দেয়।

নিমতলার শ্মশানে গেলে দেখা যাবে, চারিদিকে মৃত্যুর দৃশ্য আর শোকের আড্ডার ভিতরে দিব্য এক নিশ্চিন্ত আড্ডা জমে আছে, এবং আড্ডাটা জমে ওঠে দিনের চেয়ে রাত্রেই বেশি। পুত্রহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী আর বাপ-মা-হারা সন্তান অশ্রান্ত স্বরে কেঁদে কেঁদে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে, কাঙাল ও ধনী, মনিব ও চাকর, পণ্ডিত ও মূর্খ, শিশু ও বুড়োর শব এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে, দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছে, আর কত আদরের কত যত্নের মানুষের দেহগুলো, কত সৌন্দর্যের প্রতিমা, কত প্রতিভার আধার, কত অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে, বালবিধবা উন্মাদিনীর মতো স্বামীর মুখে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে, কেউ চিতায় শান্তিজল ঢালছে, সদ্য-পিতৃহীন পুত্র অশ্রুভেজা চোখে, গঙ্গাপুত্রদের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য নিয়ে দু-চার পয়সার জন্য দর কষাকষি করছে, শ্মশানেশ্বরের[৫.৫] মন্দিরে স্তব আরাধনার ধ্বনি উঠছে, স্থানে স্থানে এক এক দল লোক বসে মদ বা গাঁজা খাচ্ছে, উচ্চস্বরে গল্প-হাসি-মশকরা নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে, একপ্রান্তে এক সন্ন্যাসী আস্তানা গেড়ে বসেছে, সামনে একদল ভক্ত জোড়হাতে বসে সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে তার ধাপ্পাবাজি শুনছে আর একদিকে এক পাহারাওয়ালা নাচারের মতো বসে ঢুলছে আর পানওয়ালির টিপ পরা হাসি-হাসি মুখের কথা ভাবছে, গঙ্গার সামনে একদল ফোক্কর ছোকরা নানান রকম ইয়ার্কি মারছে, কেউ-বা ঘাটের ওপরে বসে চক্ষু মুদে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং কেউ-বা মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান ধরেছে—

শ্মশান ভালো বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি![৫.৬]

এইসব বিচিত্র দৃশ্য দেখলেই বোঝা যায় হিন্দুর শ্মশানে দুঃখ-শোকের ভাবটাই প্রধান ভাব নয়— এমনকী এখানকার ভাবে হট্টগোলের মাত্রাটাই যেন বেশি বলে মনে হয়। তোমার বুকের নিধি খসে পড়েছে, চোখের আলো নিভে গেছে তো এ সংসারের কী? সে যেমন চলছে তেমনি চলবে— তোমার দিকে ফিরেও না-তাকিয়ে! তোমার কান্না শুনে সে নিজের হাসি বন্ধ করবে না। দুনিয়ার এই কঠোর সত্যটা নিমতলায় এলেই ধরা পড়ে যায়।

একবার নিমতলায় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে বাসা বেঁধেছিল। কলকাতার পথে পথে তার নাম শুনলুম— স্টেটসম্যানে[৫.৭] তার ছবি দেখলুম। হুজুগে লোকগুলো দিন কয়েক অমনি আন্দোলন শুরু করলে যে, এক রাত্রে তাকে দেখতে গেলুম। শ্মশানের

ওপাশে গঙ্গামুখো হয়ে চুপ করে বসে আছে— তার চেহারায় প্রধান বিশেষত্ব যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে, সে পুরুষ কি নারী চেনা অসম্ভব। কী গুণে সে এত নাম কিনেছে, তা কিছুই বুঝলুম না। তীর্থের কাকের মতো লোকগুলো তার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তারাও যে কিছুমাত্র বুঝেছে এমনও মনে হল না। এমন সময়ে আর এক সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব! বয়স তার প্রায় পঁচিশ। প্রতি পদক্ষেপে কোমর যেন ভেঙে পড়ছে, চুলগুলো পিঠে এলানো, পরনে লাল টকটকে কাপড়। এর হাবভাব চেহারায় সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণই নেই, আছে খালি কুৎসিত ভাবের লীলা। তার সঙ্গে আরও দু-চার জন লোক এল— বোধ হয় ভক্ত, অবশ্য তার যোগবলের কী যৌবনের উপাসক— সে খবর আমার জানা নেই। নবীন সন্ন্যাসিনী এসেই পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। সে যে কী কদর্য ও অশ্রাব্য ভাষা তা আর কী বলব, শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। প্রথমটা ঝগড়ার কারণ বুঝতে পারলুম না। শেষে জানলুম, এই নবীন তপস্বিনী এতদিন এই শ্মশানে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করে ছিল, কিন্তু নতুন সন্ন্যাসিনীটির আবির্ভাবে তার পসার মাটি হবার জো হয়েছে, তাই নাকি এই বিবাদ! —দিন কয়েক পরে এক রাত্রে নিমতলার শ্মশানে গেলুম। নবাগত বিখ্যাত সন্ন্যাসিনী তখন অদৃশ্য, কিন্তু নবীন তপস্বিনী সেখানে পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করছে। কতগুলো লোকের সঙ্গে সে ফষ্টিনষ্টি করছিল। ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হল তার চোখেও যেন সুরার রং ফুটে উঠেছে।

রাত্রে বারবনিতারাও প্রায় এখানে বেড়াতে আসে। কী দেখতে যে আসে, তারাই জানে। নিছক দেহের উপাসিকা তারা, এখানে এসে নরদেহের এই শোচনীয় পরিণাম দেখতে তাদের ভালো লাগে? আশ্চর্য! এ বিশেষত্ব ভারতে হিন্দুদের মধ্যেই সম্ভব, অন্য জাতির বারবনিতারা কখনোই এমন ব্যাপারে রাজি হবে না। তারা যে কেবল সুখের কপোতী— জরা বা মৃত্যু যে তাদের চোখের বালি! ...গণিকারা মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে ভিতরে এসে ঢোকে— সঙ্গে সঙ্গে আসে কতকগুলো মার্কামারা লম্পট চেহারা! এখানে ঢুকেও তাদের জঘন্য ও অশ্রাব্য কামের প্রলাপ বন্ধ হয় না, এদিকে-ওদিকে ঘুরে শবদাহ দেখে, শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম করে ও প্রণামী দিয়ে তারা আবার চলে যায়— কলুষিত আনন্দ বিলাসের হাসি-তামাশা গোলমালে এই শোকপুরীকে মুখরিত করে!

মাঝে মাঝে গণিকার দলও গণিকার শবদেহ নিয়ে আসে। তারা আসে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় একখানামাত্র কাপড় পরে। তারাও মদ খেয়ে তর হয়ে থাকে। তাদের তীক্ষ্ন মেয়েলি গলার উচ্চ হরিবোলে রাত্রের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং শ্মশানঘাটের কাছাকাছি যাদের বাড়ি, তারা বিলক্ষণই জানে যে, সে চিৎকার শুনলে মনও যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। বহু লাঞ্ছনা, মনোকষ্ট, অপমান, হীনতা ও কুৎসিত ব্যাধির ভারে জীর্ণ দেহের পিঞ্জর থেকে এক অভাগীর আত্মা মুক্তিলাভ করেছে, এই মৃত্যুশীতল দেহে আর হাবভাব ও লালসার কোনো লক্ষণ নেই! কিন্তু তার সঙ্গিনীরা এসব কথা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না, শ্মশান ও মানুষের শেষ দশা দেখে তারা কিছুমাত্র দমে যায় না, মদ খেয়ে তারা মাতামাতি ও পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে, মৃত সঙ্গিনীর প্রতি অশ্লীল ভাষায় কৌতুক বাণ নিক্ষেপ করে, কিংবা শ্মশানের জন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে ভঙ্গিভরে রসিকতা করে। এক বিষম অস্বাভাবিক ব্যাপার।

শ্মশানঘাটে অনেক রাত্রে ছোটোখাটো সভা বসে এবং সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা থেকে সমাজনীতি ও রাজনীতির কথা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। ওদিকে মড়ার পর মড়া পুড়ছে, আর এদিকে নিশ্চিন্তভাবে গল্প ও তর্ক চলছে— এ কি বিসদৃশ নয়? কলকাতার প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় এক এক দল লোক থাকে, তারা পেশাদার না হলেও পল্লির অনেক শব বহনের ভার তাদের ঘাড়েই পড়ে। মৃতের জন্য এদের মনে বিশেষ কোনো শোকের ভাব থাকে না, মড়া নামিয়ে অনেকে এসে উক্ত সভায় যোগদান করে। এদের কেউ কেউ বহুকাল ধরে বহু মড়ার ভারবহন করে করে এ কাজে রীতিমতো পাকা হয়ে গেছে। এরা আবার শবদাহের অনেক রকমের বিচিত্র কাহিনি জানে। সেসব কাহিনির কোনো-কোনোটি

অত্যন্ত চমকপ্রদ ও আশ্চর্য। এই ধরনের একটি কাহিনি এখানে দেওয়া গেল। নিমতলার শ্মশানে এক প্রবীণ শববাহীর মুখে এটি শোনা। এর সত্য-মিথ্যার জন্যে আমি দায়ী নই, কিন্তু কাহিনিটির কথক একে সত্য ঘটনা রূপেই বলেছিলেন। তাঁর গল্প এই—

কলকাতার এক পুরাতন পল্লিতে আমাদের বাস (পল্লির নামও তিনি বলেছিলেন, আমার মনে নেই)। —পাড়ার কেউ মরলে ও তার মড়া বইবার লোকের অভাব হলে তখনই আমাদের ডাক পড়ে। মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা পাড়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছি। এ কাজে আমাদের স্বার্থ আছে এইমাত্র, মৃতের আত্মীয়েরা সামাজিক নিয়ম অনুসারে আমাদের একদিন আহারের নিমন্ত্রণ করে।

বছর কয়েক আগে, একদিন রাত্রে আমরা বসে বসে গল্প করছি, হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। তার মুখে শুনলুম, তার বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক মারা গেছে, কিন্তু লোকাভাবে সৎকার হচ্ছে না। বুড়োকে আমরা চিনতুম না। কলকাতার পাড়ায় নিত্যই কত নতুন ভাড়াটে আসছে, সকলকে চেনা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা কোনো আপত্তিই না করে, তখনই কোমর বেঁধে গামছা নিয়ে বুড়োর সঙ্গে চললুম।

পাড়ার প্রান্তে আলোকহীন এক গলির ভিতরে একটা বাড়িতে বুড়ো আমাদের নিয়ে গেল। বুড়োর মতো বাড়িটাও অনেক বৎসরের ভারে জীর্ণ। তার ভেতর ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। ঠিক যেন হানা বাড়ি, ঢুকলেই বুকটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে!

একতলাতেই একটা ঘরের সামনে গিয়ে বুড়ো দরজা খুলে দিল। ঘরের ভেতর একটা নিভুনিভু মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে— যেন ঘরের ভিতরে কতখানি অন্ধকার আছে তাই-ই ভালো করে দেখাবার জন্য! সেই আবছায়াতে দেখলুম, একখানা দড়ির খাটের ওপরে একটা মৃতদেহ শোয়ানো রয়েচে, উপরে তার চাদরে ঢাকা। সমস্ত ঘরটা যেন মৃত্যুর কেমন একটা অস্বাভাবিক গন্ধে পরিপূর্ণ।

আমরা খাটসুদ্ধ মৃতদেহটাকে ঘর থেকে বার করে আনলুম, বুড়ো কিন্তু তবু ভিতরে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললুম, 'কই মশাই, আসুন।'

বুড়ো বললে, 'আমি গেলে বাড়ি আগলাবে কে?'

আমি বললুম, 'সে কি মশাই, আপনাদের মড়া, আপনি না এলে আমরা কি নিয়ে যেতে পারি?'

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তবে চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

মড়া নিয়ে আমরা শ্মশানের দিকে এগুলুম, বুড়ো আসতে লাগল আমাদের পিছনে পিছনে। বিডন স্ট্রিটে যখন এসে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার গলার উপরে টপ করে ঠান্ডা কীসের একটা ফোঁটা পড়ল। বৃষ্টি এল নাকি? আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, সেখানে মেঘের নাম গন্ধও নেই। অবাক হয়ে ভাবছি— আবার এক ফোঁটা! নিশ্চয়ই খাট থেকে কী পড়ছে! ...কিন্তু কী পড়ছে?

প্রাণটা কেমন অশান্ত হয়ে উঠল। সঙ্গীদেরও ডেকে ব্যাপারটা বললুম। তারপর একটা গ্যাসপোস্টের কাছে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে পা-দুটো যেন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গেল! রক্ত, রক্ত— মড়ার চাদর চুঁইয়ে এ যে রক্তের ফোঁটা ঝরছে! কীসের রক্ত এ?

তাড়াতাড়ি পেছন দিকে চাইলুম— কিন্তু বুড়োকে আর দেখতে পেলুম না। কোন ফাঁকে সে সরে পড়েছে।

এখন উপায়? যাকে বহে নিয়ে যাচ্ছি, তাকে কি কেউ খুন করেছে? পথের মাঝে চাদর খুলে দেখতেও ভরসা হল না— যদি আর কারোর চোখে পড়ে যায়? সকলেই কাঁধে খাট নিয়ে স্তম্ভিতের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম— না পারি এগুতে, না পারি পেছুতে। মড়া নিয়ে উলটো পথে আবার পাড়ার দিকে ফিরে গেলেও লোকে সন্দেহ করবে, এগুলেও শ্মশানে গিয়ে ধরা পড়ব।

একজন বললে, 'এসো, আমরা এখানেই খাট ফেলে যে যে-দিকে পারি টেনে লম্বা দি!'

আমি বললুম, 'তাহলে এখনই ধরা পড়ব। ওই দেখ, একটা পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখচে!'

বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, তবু প্রাণপণে আমরা এগিয়ে গেলুম। পাহারাওয়ালার চোখের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে আমাদের মনের ভেতরটা যে কীরকম করছিল, তা আর খুলে বলবার নয়! যা হোক, পাহারাওয়ালা কিছু বললে না। উপস্থিত বিপদ থেকে তো রক্ষা পেলুম, কিন্তু শ্মশানে গিয়ে কী হবে? সেখানে তো এই রক্তাক্ত লাশ সকলের সম্মুখে ফাঁকি দিয়ে পোড়ানো যাবে না। বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই।

ঠিক যেন ভূতগ্রস্তের মতো আচ্ছন্ন অবস্থায় নিমতলার শ্মশানে এসে পড়লুম। রাত তখন অনেক। প্রতি পদে মনে হতে লাগল আমরা এক-পা এক-পা করে সাক্ষাৎ ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছি।

মরিয়া হয়ে শ্মশানের ভেতরে ঢুকলুম। কোনো দিকে না চেয়ে, শ্মশানের যে অংশ গঙ্গার ঘাটের দিকে, একেবারে সেইখানে গিয়ে পড়লুম। খাট নামিয়ে, মড়া ঢাকা চাদরের একপাশ কোনোরকমে একটু তুলে দেখলুম, যা ভেবেছি তাই! এই স্ত্রীলোকটাকে কেউ খুন করেছে।

আমাদের কপাল— শ্মশানের এ অংশটা সেদিন নির্জন ছিল। আমরা আর এক সেকেন্ড দাঁড়ালুম না, লাশসুদ্ধ খাট সেইখানেই ফেলে রেখে, সকলে চুপি চুপি গঙ্গায় গিয়ে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়লুম, তারপর একেবারে এক সাঁতারে অনেক তফাতে এসে উঠলুম।...

পাড়ায় এসেই সেই বাড়ির দিকে ছুটলুম। বাড়ি খালি। বুড়োকেও আর চোখে দেখিনি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

হোটেল

কলকাতার নৈশ দৃশ্যে হোটেলের ছবি বাদ পড়তে পারে না, কারণ হোটেলে খাওয়া শখের বাবুদের একটা আধুনিক ফ্যাশন বা ঢং।

কলকাতায় হোটেল আছে নানা শ্রেণির, কিন্তু সে সমস্তরই কথা এখানে আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ সাধারণত 'হিন্দু হোটেল বা ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান' বলে যেগুলি বিখ্যাত, সেগুলির মধ্যে বর্ণনীয় বিশেষত্বের একান্ত অভাব। গরিব বাসাড়ে ভদ্রলোক বা গদির চাকুরে দলের লোকরাই সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে এবং সে দৃশ্য নিতান্ত একঘেয়ে। অনেক চায়ের দোকানেরও আজকাল 'হোটেলত্ব' প্রাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু বড়োজোর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের পরমায়ু, আর স্কুল কলেজের ছাত্র বা দরিদ্র কেরানিরাই মুরুব্বি হয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। আর এক শ্রেণির হোটেল বড়ো বড়ো জমকালো আর ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ইংরেজি বা ফরাসি নাম নিয়ে পথে পথে— বিশেষত থিয়েটারের আশেপাশে বিরাজ করে। এক-একখানা একতলা ঘরেই এসব হোটের সীমাবদ্ধ। এখানে রান্না হয় ও খাবার সাজানো থাকে পথের ধারেই এবং রাস্তার যত ধুলো, নোংরা জঞ্জালের টুকরো ও কীটপতঙ্গ উড়ে এসে খাবারের উপরে পড়ে। এখানকার বেয়ারারা রাধাবাজারের দোকানদারের মতো গলাবাজির দ্বারা এইসব বিষবৎ খাবার খেয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করে। এখানে শখের বাবুরা ভুলেও পায়ের ধুলো দেন না। আরশোলা যেমন পাখি নয়, এগুলোও তেমনি আসলে হোটেল নয়, চলতি ভাষায় এদের নাম হচ্ছে, 'চায়ের দোকান'। অবশ্য এরই মধ্যে দু-চারটে আসল হোটেলের ক্ষুদ্র সংস্করণ আছে— কিন্তু সেগুলোও অত্যন্ত প্রকাশ্য বলে রহস্য-বর্জিত।

কলকাতার দেশি পাড়ায় খুব বেশি হোটেল না থাকলেও মাঝারি দরের হোটেলের সংখ্যা বড়ো কম নয়। অবশ্য রূপে, গুণে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এর অধিকাংশগুলি সাহেব পাড়ার ক্ষুদ্রতম হোটেলেরও সমকক্ষ নয়, তবু কিন্তু এখানে খরিদ্দারের অভাব হয় না। এসব হোটেলের কোনো কোনোটির ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য এবং কোনো কোনোটির ভেতরে গেলে দেখা যায়, মালিকের যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের অভাব না থাকলেও, রুচির অভাব একান্ত। ঘরদোর সাজানো হয়েছে যথেষ্ট— কিন্তু সবই যেন মাড়োয়ারি আদর্শে— অর্থাৎ আর্ট নেই, বাহুল্য আছে।

দিনের আলোয় এসব হোটেলের বিশেষত্ব কিছুই নজরে পড়ে না, কারণ গণিকাদের মতো এদেরও ঘুম ভাঙে ও জীবন শুরু হয় সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে। তখন এদের ঘরে ঘরে বিজলিবাতি জ্বলে ওঠে ও বনবন করে বিজলি পাখা ঘুরতে থাকে এবং আগাগোড়া যথাসাধ্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। বাঙালির হোটেলে খাওয়ার সঙ্গে গণিকালয়ে গমনের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠ, তাই সোনাগাছি অঞ্চলেই হোটেলের সংখ্যা বেশি। এ অঞ্চলে বারবনিতা ছাড়া দুটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, হোটেল আর পানের দোকান।

দেশি পাড়ার হোটেল কর্ত,পক্ষ 'বার' রাখতে দেন না— যদিও কার্যত হরে-দরে হাঁটুজলই দাঁড়িয়ে গেছে। সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলওয়ালাদের সবচেয়ে বড়ো অতিথি হচ্ছেন সুরা সেবকরা এবং অনেক হোটেলে লুকিয়ে মদ বিক্রি যে অবাধে চলে না, তাও

জোর করে বলতে পারি না। হয়তো হোটেলে প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞাপন দেখবেন 'মদ লইয়া প্রবেশ নিষেধ', কিন্তু অন্দরে ঢুকে ঘরে ঘরে উঁকি মারলেই নজরে পড়বে, একাধিক মদের বোতল ক্রমেই খালি হয়ে আসছে। অনেক হোটেলে মদ বিক্রি হয় না বটে, কিন্তু ভেতরে বসে অন্তত মদ্য পান করতে না দিলে এ অঞ্চলে হোটেল চলা অসম্ভব। এখানকার অধিকাংশ খরিদ্দারই যখন মাতাল, তখন হোটেলওয়ালারা দায়ে পড়েই এদিকে অন্ধ হয়ে থাকে এবং এজন্য তাদের বড়ো দোষী করতেও পারা যায় না। কর্ত,পক্ষ হোটেলে 'বারে'র বিরোধী কিন্তু মদ বিক্রির লুকোনো আড্ডা এখানে যথেষ্ট, মাঝে মাঝে লোকসান দিয়ে মরে খালি মাতাল বেচারিরাই। কারণ রাত আটটার পরে মদ কিনতে হলেই প্রত্যেক পাইটে তাদের এক টাকা করে বেশি দিতে হয়।

থিয়েটারের আশেপাশে যত হোটেল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গুছানো হোটেল হচ্ছে বিডন স্ট্রিটের 'মিনার্ভা রেস্তরাঁ' এবং স্টার থিয়েটারের সামনে 'মিনার্ভা গ্রিল'[৬.১]। দুই হোটেলই এক মালিকের অধীনে। এখানকার রান্না ও খাবার গুণে বাঙালি পাড়ার সব হোটেলের চেয়ে ভালো। ওই দুই হোটেলের খরিদ্দাররা প্রায়ই বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোক। অবশ্য সুরাভক্তরা এক বিষয়ে হতাশ হবে —এখানে গোপনে মদ বিক্রি হয় না।

সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলে খরিদ্দার আসে, প্রধানত দুই সময়ে। সন্ধ্যার পরে বাবুরা যখন সুন্দরী শিকারে বাহির হন, তখন প্রায়ই আগে হোটেলে এসে ওঠেন। কিছু মাংস ও সুরার বোতল নিয়ে বসে প্রথমত তাঁরা ধাতস্থ হন। সেইসময়ে পরামর্শ হয়, কোন দিকে গেলে ভালো শিকার মিলবে। তার পর আর এক শ্রেণির খরিদ্দার আসে কিছু বেশি রাতে — একেবারে যুগল রূপে অর্থাৎ শ্রীমান ও শ্রীমতীতে একসঙ্গে। সাহেবি হোটেলে ভদ্র নারী অতিথির সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু দেশি পাড়ার কোনো হোটেলেই ভদ্র মহিলারা পদার্পণ করেন না— 'মিনার্ভা গ্রিল' ও 'রেস্তরাঁ' ছাড়া। কাজেই ফিরিঙ্গিদের দেখাদেখি বাবুরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান! অবিদ্যাদের মতো হোটেলওয়ালাদেরও খরিদ্দারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়, মাসকাবারের প্রথম শনিবারে। আরও এক বিষয়ে হোটেলের মালিকদের সঙ্গে অবিদ্যাদের মিল আছে। তাঁদেরও ব্যবসা পরের মন জুগিয়ে চলা, সকলকে মিষ্ট কথায় বশ রাখা এবং হরেকরকম অত্যাচার হাসিমুখে গায়ে মাখা।

সোনাগাছি অঞ্চলে হোটেলের সাধারণ নৈশ অভিনয় এই রকম। একদল বাবু খেতে এলেন। হোটেলের মালিক তাঁদের অভ্যর্থনা করে কোনো ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাবুরা ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই বেয়ারা এসে হাজির। তখনি প্রথমে কিছু ড্রাই খাবার, এক বোতল হুইস্কি বা ব্রান্ডি, খানিকটা বরফ ও কয়েক বোতল সোডার হুকুম হল। বেয়ারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করলে।

প্রত্যেকের গেলাসে যখন মদ ঢালা হচ্ছে, একজন আপত্তি জানিয়ে বললেন, ' না ভাই, আজ আমায় মাপ কর!'

'তাও কি হয়?'

'না, না, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, বাড়িতে শেষে মুখে গন্ধ পাবে!'

'ইস ভারি যে গুড বয় দেখছি, ওসব সতীত্ব এখানে চলবে না!'

'না হে, তুমি বুঝবে না! গিন্নি যদি টের পায়, তখনই গলায় দড়ি দেবে কী আফিম খাবে কী কেরোসিনে পুড়ে মরবে!'

'আপদ যাবে! ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে— ভয় কী দাদা? নাও, বেসুরো গেয়ে ফুর্তি মাটি করে দিয়ো না!'

এক এক পাত্র খালি হল, গেলাসে আবার মদ ও সোডা পড়ল। প্রথমে যিনি আপত্তি করেছিলেন, এবারেও তিনি আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে নয়। তৃতীয়বারে তিনি মোটেই আপত্তি করলেন না, এবং চতুর্থবারে নিজেই বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে নিলেন। মাতালের মনোবিজ্ঞান এমনই বিচিত্র! বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে বেশি ভয়ানক হয়ে ওঠে, মাতালও তেমনই একবার সংযম হারালে মাত্রা আর ঠিক রাখতে পারে না! ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে তখন মদ খেতে বাধ্য!

নেশা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের গলার আওয়াজও ক্রমে উঁচু পর্দায় চড়তে লাগল। তখন তাদের কথাবার্তার মুখ্য বিষয় কী, সেটা স্থির করে বুঝে ওঠা শক্ত কথা। কখনো আপিসের বড়োবাবু বা সাহেবের কথা, কখনো নিজের নিজের স্ত্রী-র কথা, কখনো বাপ-মায়ের 'অত্যাচারের' কথা এবং তারই মাঝে মাঝে 'বোয়'! বলে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার, আরও খাবারের ফরমাশ বা টেবিল চাপড়ে এক-আধ লাইন গান।

একজন বললেন, 'চল, আজ ডালিমের বাড়ি যাই।'

'না, সে বেটির গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না, ট্যাঁকের কড়ি ফেলে অত গুমোর সইতে রাজি নই বাবা!'

আর একজনও আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, না, সামনেই পুজো, এর মধ্যে আমি আর তার চৌকাঠ মাড়াচ্ছি না— এখনই বিষম এক বায়না ধরে বসবে!'

'ধরুক বায়না! অমন চোখ আর অমন হাসি অন্য কোথাও পাওয়া যায়?'

'তোর চোখের আর হাসির নিকুচি করেচে, টাকা ফেললে বাঘের দুধ মেলে, চোখ আর হাসির কথা কী বলচিস?'

ডালিমের ভক্ত ভোটে হেরে ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেলে গেলাসে ফের মদ ঢালতে প্রবৃত্ত হলেন।

'তার চেয়ে চীনে-চামেলির বাড়িতে চল, নাচে-গানে মাত করে দেবে!'

'দরেও সস্তা—'

'ভদ্রলোকের কদর বোঝে—'

'কিন্তু ডালিম—'

'ফের ডালিমের নাম মুখে এনেচ কী সোডার বোতল তোমার মাথায় ভেঙেচি!'

'বোয়, বোয়! বিল লে আও!'...

কোন বাগানে চীনে-চামেলি ফুটে আছে বাবুরাও তখন সেই খোঁজে বেরুলেন। ...খানিক পরে আর একদল ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এসে হোটেলের আর এক কামরা দখল করলে। এ দলে চারজন পুরুষ দু-জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক দুটি কাপড় জামা পড়েছে ব্রাহ্ম-মহিলাদের নকলে[৬.২]। মাথায় এক একখানা কাপড় বাঁধা— নব্য তন্ত্রের মেয়েদের এ এক নতুন ফ্যাশন। তাঁদের দেখাদেখি এরাও শিখেছে। দু-জনেরই চোখে চশমা ও সোনালি লপেটা। অনেক গণিকাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই শিক্ষিতা নব্য মহিলা বলে ভ্রম হয়, এমন

সুকৌশলে তারা আত্মগোপন করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গহনা, নাকছাবি ও পায়ের সোনালি জুতো তাদের আসল স্বরূপ ধরিয়ে দেয়।

নতুন দলের সকলেই ইতিমধ্যে যথেষ্ট মদ্যপান করে এসেছে, কিন্তু তাতেও তাদের তৃপ্তি হল না, কারণ এখনও তারা যে চলে-হেঁটে বেড়াতে পারছে! এসেই 'মদ, মদ' রব উঠল, একজন অমনি পকেট থেকে হুইস্কির একটি ছোটো বোতল বার করে টেবিলের ওপরে রাখল। তখনই তিন বোতল সোডা ও এক চাঙাড় বরফ এল এবং গান শুরু হল। নেশার ওপরে নেশার প্রভাব আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুটে উঠল! একজন হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে জড়িয়ে ধরে ঢুলু ঢুলু চোখে বললে, 'আঙুর, তোকে বড্ড ভালোবাসি!'

আঙুর ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললে, 'আ মরে যাই, রস যে আর ধরচে না!'

প্রথম লোকটি অভিমানের স্বরে বললে, 'আমার মুখের কথা বিশ্বাস হল না ভাই! ... আচ্ছা, তবে এই দ্যাখ, আমার এ প্রাণ তোর জন্যে এখনি আমি দিতে পারি কি না।' ... বলেই সে টেবিল ছুরিখানা হাতে করে তুলে ধরল।

অমনি বাকি তিনজন পুরুষও তার স্বরে প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'আঙুর, তোকে বড্ড ভালোবাসি!'

'থাক, থাক, আমার জন্যে শেষটা কী তোমার গিন্নি নিরমিষ্যি খাবে, সিঁদুর মুছে ফেলবে? প্রাণ টান কিছুই তোমাকে দিতে বলচি না ইয়ার, তার চেয়ে আমাকে একটা মুক্তোর "কলার" কিনে দাও দেখি! তাহলেই তোমার ভালোবাসার দৌড় কত বুঝতে পারব।'

প্রথম প্রেমিক সে-কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে অন্য স্ত্রীলোকটিকে বললে, 'হেনা, একখানা গান গা না ভাই!'

হেনা বললে, 'হোটেলে বসে গান গাইব কী গো?'

'আলবত? গাইবে!'

হেনা মাতালদের আর না ঘাঁটিয়ে গুনগুন করে গাইল।

দিদি, লাল পাখিটা আমায় ধরে দে না রে!

একজন টেবিলকে তবলায় পরিণত করে তাল দিতে লাগল, আর একজন দুটো খালি কাঁচের গেলাস নিয়ে টুং টুং করে খঞ্জনির বোল ধরলে এবং সেই প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত প্রেমিক বাবুটি দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে গিয়ে মেঝের উপর টলে পড়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল। বাজাতে বাজাতে হঠাৎ একটা গেলাস ভেঙে কাঁচের টুকরোগুলো প্রেমিকের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু যে ভাঙলে, যার গায়ে পড়ল, আর যারা দেখলে তাদের কেউই এজন্য এতটুকু ব্যস্ত হওয়া দরকার মনে করলে না!

আচম্বিতে সিঁড়ির উপরে একটা প্রবল হাসি-গানের হররা শোনা গেল— একসঙ্গে বারো-তেরো জন স্ত্রীলোকের গলা! ...এ ঘরের গাইয়ে, বাজিয়ে ও শুনিয়েরা অমনি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, পরে পরে একঝাঁক কালো, ফর্সা ও শ্যামলা 'পরি' সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে— কিন্তু এ নারীর দল একেবারে পুরুষ বর্জিত!

আঙুর বললে, 'মাতাল হরি!'

'মাতাল হরি' কলকাতার এক নামজাদা মেয়ে-কাপ্তেন। তাকে দেখতে মোটেই ভালো নয়, কিন্তু গান গেয়ে সে রাশি রাশি টাকা রোজগার করে এবং দু-হাতে তা খরচ করে

ফেলে। তার একটি অদ্ভুত বাতিক আছে। টাকা পেলেই সে দিন কয়েক ব্যবসা বন্ধ করে দেয় এবং চেনাশুনো আরও জনা কয়েক স্ত্রীলোক নিয়ে ঘরে বাইরে ফুর্তি করে বেড়ায়। যতদিন তার হাতে টাকা থাকে, ততদিন তার ফুর্তি চলে— এ আমোদের মধ্যে কোনো পুরুষ-বন্ধুকে প্রায়ই সে ডাকে না! দিন-রাতই সে মদ খায়— সেইসঙ্গে গাঁজা-গুলি-চণ্ডুও নাকি বাদ যায় না! আমাদের 'মাতাল হরি' নামটা যদিও কাল্পনিক, আসল লোক কিন্তু সত্যই আছে।

মাতাল হরি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একটা বড়ো ঘরে বাহার দিয়ে বসে গেল— সমস্ত হোটেল তাদের স্ত্রী-কণ্ঠের হট্টগোলে ভরে উঠল। হোটেলের মালিকের মুখ আজ ভারি খুশি। মাতাল হরির মতন খরিদ্দারের আবির্ভাবে তাঁর হোটেলের সমস্ত খাবার যে আজ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে এসে, একগাল হেসে বললেন, 'কী চাই ভাই হরি, ফরমাশ করো!'

হরি বললে, 'ব্রাদার! তুমি থাকতে আমি অর্ডার দেব কীরকম? আমাদের যা চাই তুমিই বলে দাও, আর আমাদের সঙ্গে এইখানে বসে যাও, তোমাকেও ছাড়চি না বাবা!'

দেখতে দেখতে মদের বোতল, সোডার বোতল, গেলাস, বরফের পাত্র ও খাবারের ডিসে টেবিলগুলো পরিপূর্ণ হয়ে উঠল— বেসুরো গান, খিলখিল হাসি, ধেইধেই নাচ, ঝন ঝন ডিস ও গেলাস ভাঙা, অশ্লীল চিৎকার ও অশ্রাব্য কথায় সেখানে কান পাতে কার এমন সাধ্য! হোটেলে নতুন খরিদ্দার এসে ব্যাপার দেখে অনেকে সরে পড়ল, যারা এতেও ভড়কাল না, মাতাল হরি তাদেরও কারোকে কারোকে নিজের দলে টেনে নিলে। আঙুর ও হেনাও ইতিমধ্যে মাতাল হরির দলে যোগ দিয়েছে, কিন্তু তার পুরুষ-বন্ধুরা ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে পিঠটান দিয়েছে— এমন ব্যাপার তো তারা কখনো চোখে দেখেনি! কেবল প্রেমিকটি তখনও আত্মনিবেদনের সুযোগ ছাড়েনি, খানিক পরে কাঁচের বিছানা ছেড়ে উঠে, হামাগুড়ি দিয়ে সে আঙুরের পাশে এসে বসেছে এবং মাঝে মাঝে আঙুরকে ভালোবাসার ভাব দেখাচ্ছে।

হোটেলে এরকম দৃশ্য নতুন বটে, কিন্তু আঙুর ও প্রেমিকের মতন লোক কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলের অধিকাংশ হোটেলেই দেখা যায়।

মালিক দুর্দান্ত না হলে এ অঞ্চলে হোটেল চালাতে পারে না। অধিকাংশ খরিদ্দারই যেখানে মাতাল, সেখানে সকল রকম বিপদ ঘটবারই সম্ভাবনা আছে এবং তা ঘটে থাকেও। সেখানে শান্তিক্ষা করা ভালো মানুষের কাজ নয়।

এসব হোটেলে রান্নাও সাধারণ রুচিসঙ্গত নয়। মাতালরাই এখানে আনাগোনা করে এবং তারা ঝাল ভালোবাসে। এখানকার খাবারও তাই বেশি ঝাল হয়। আবার এক-একটা হোটেলে খাবারে এত ঝাল দেওয়া হয় যে, মদে অজ্ঞান না হয়ে থাকলে গলধঃকরণ করা অসম্ভব।

এসব হোটেলের খাবারও যে ভালো, তা নয়। প্রায়ই খাবারে ভেজাল থাকে। ঘি খারাপ, অনেকে আবার বাদামি তেলও ব্যবহার করে। আজকের মাংস বাঁচলে, কাল তার সদব্যবহার হয়। সস্তা বলে ছাগের নামে গোরুর মাংস চালিয়েও কোনো কোনো হোটেলওয়ালা ধরা পড়েছে। মাতালদের জ্ঞান থাকলে কলকাতার অধিকাংশ হোটেলই আজ খরিদ্দারের অভাবে উঠে যেত।

সপ্তম দৃশ্য

কলকাতার উৎসব রাত্রি

চারিদিকের চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও কলকাতা যখন হাসে, তখন প্রাণ ভরেই হাসে। কিন্তু দিন-কে-দিন এ হাসি শুকিয়ে আসছে। আমাদের শৈশবেও উৎসব রাত্রে কলকাতার যে প্রফুল্ল মূর্তি দেখেছি, এখন আর তেমনটি দেখি না। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার ও এখনকার পূজাপার্বণের মধ্যে প্রভেদ আছে আকাশ-পাতাল। এবং এ প্রভেদের প্রধান কারণ, তখন অল্প টাকার আমোদ হত বেশি, এখন বেশি টাকাতেও উৎসবের আনন্দ পাওয়া যায় অল্প। দুঃখীর সংখ্যা চিরদিনই বেশি থাকে, কিন্তু এখন ধনীর সংখ্যা কমে গেছে। বিশেষ, নতুন ধনীদের প্রাণও সেকালের ধনীদের মতো দরাজ নয়। সেকালের ধনীরা নিজেরা খুশি হয়েই তুষ্ট থাকতেন না, তাঁরা দশজনকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন। একালের ধনীরা নিজেরাই খুশি হতে চান বেশি, আর দশজনের জন্যে তাঁরা বড়ো মাথা ঘামান না।

কলকাতার প্রধান উৎসব হচ্ছে, দুর্গাপূজা[৭.১]— মুসলমানদের যেমন মহরম। কিন্তু দুর্গা প্রতিমার সংখ্যা এখন ক্রমেই অল্প হয়ে আসছে। বৎসর সাত-আট আগেও দুর্গাপূজার উৎসবে পাথুরেঘাটাই কলকাতার আর সব পল্লিকে টেক্কা দিত; অবশ্য এখনও একমাত্র এই পল্লিতে এত বেশি প্রতিমার সংখ্যা কলকাতার আর কোথাও দেখা যায় না। ভাসানের দিন আগে পাথুরেঘাটার পথ লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত— কারণ এখানে প্রায় একসঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমার শোভাযাত্রা বের হত এবং সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য ছিল।

দুর্গাপূজার কয় রাত্রেই পাথুরেঘাটায়[৭.২] যেন জনতার প্রবাহ বইতে থাকে— লোকের পর লোক, তারপরে লোক, আনাগোনার আর বিরাম নেই। আলোকমালায় পথ সমুজ্জ্বল, ঢাক-ঢোলের ও নহবতের উৎসবোল্লাস জাগানো ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত, সকলের মুখে হাসি, পরনে নতুন কাপড়। পুজো বাড়িগুলিতে এ সময়ে সকলেরই অবাধগতি এবং সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দলে দলে লোক প্রতিমা দর্শন করে যায়। ভিড়ের ভিতরে নারীর সংখ্যাও যথেষ্ট। অনেক গরিব ভদ্রলোকের মেয়েও প্রতিমা দেখতে আসে, আর গণিকার তো কথাই নেই। ভিড় হচ্ছে গণিকাদের বড়ো প্রিয়, কারণ তাতে শিকার সংগ্রহের সুবিধা বেশি। তাই তারাও পুরুষ বধ করবার জন্যে যথাসাধ্য মারাত্মক সাজসজ্জা করে জনতার মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করে। ভিড়ের ভিতরে গুণীর অভাব কখনো হয় না এবং সেই জনতায় গুণীও আছে নানা শ্রেণির। কেউ আসে খালি সৌন্দর্য দর্শনে। গণিকা থেকে শুরু করে ভদ্রমহিলার ঘোমটার মধ্যে এবং পূজাবাড়ির অন্দর পর্যন্ত সর্বত্রই তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ হয়ে থাকে— উল্লেখযোগ্য সুন্দর মুখ দেখেছে কী তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। এ শ্রেণির গুণীরা অসভ্য হলেও নিরাপদ। কেননা দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন এদের আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সাহস নেই। দ্বিতীয় শ্রেণির গুণীরা দর্শন ও স্পর্শন দুই-ই চায়। তারা সবচেয়ে বেশি ঘটার পুজোবাড়ির ফটকের সামনে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে। ভদ্র-অভদ্র দলে দলে নারী আসছে আর যাচ্ছে। মনের মতো মুখ দেখলেই তারা দলের ভেতর ঢুকে পড়ে। বাড়ির সদর দরজা পার হয়েই সাধারণত একটা সংকীর্ণ পথ

থাকে। জনতা তার ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি ও গায়ে পড়াপড়ি অনিবার্য। গুণীরাও তাই চায়! কারণ, এই সুযোগে মন-মজানো চেহারার স্পর্শলাভে তাদের সর্বশরীর পুলকিত হয়ে ওঠে। নারীদের সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভিতরে ঢোকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে আসে। তারপর আবার নতুন দলের অপেক্ষায় ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার কোনো প্রসিদ্ধ 'ইংরেজি'র প্রফেসরকেও আমি এই দলে দেখেছি। তৃতীয় শ্রেণির গুণীরা আরও বেশি অগ্রসর। তারা এই সুযোগে কুলবধূর সর্বনাশের চেষ্টায় থাকে। চতুর্থ শ্রেণির গুণীরা আসে গণিকা নির্বাচনের জন্য— সাধারণের পক্ষে তারাও নিরাপদ। পঞ্চম শ্রেণির গুণীরা রূপচর্চার কোনো ধার ধারে না। ছোটো ছেটো মেয়েরা ঠাকুর দেখতে যায়, বাগে পেলেই তারা মেয়ে চুরি করে। ষষ্ঠ শ্রেণির গুণীদের দলে চোর, জোচ্চোর, পকেট-কাটা ও গুন্ডাদের ধরতে পারি। তাদের মহিমায় অনেকের গলার হার, কানের গহনা বা পকেটের টাকা অদৃশ্য হয়। জনতার মধ্যে এত রকমের গুণী থাকে, কিন্তু উৎসবের সমারোহের মধ্যে তাদের স্বরূপ চেনা শক্ত কথা। ফি বছরেই কত লোকের উৎসব-হাস্যই যে তারা বিষাদের ছায়ায় বিষণ্ণ করে দেয়, তার আর হিসাব নেই। ...বিসর্জনের রাত্রে কলকাতার গঙ্গার তীর ও তার আশেপাশের রাস্তা লোকে লোকে ভরে যায়, অমলিন নব সাজসজ্জায় সে জনতা সকলেরই নয়নরঞ্জন করে। সেদিন নিশ্চিন্ত মিলনের দিন— শত্রুকেও মিত্র বলে আলিঙ্গন করবার দিন। প্রত্যেকের মুখে-চোখেই সে-রাত্রে তাই একটি স্নিগ্ধ, শান্ত ও প্রীত ভাবের আভাস পাওয়া যায়— পথে পথে নমস্কার ও কোলাকুলির দৃশ্য। একটু বেশি রাতে পথে সেদিন মাতালের চেয়ে সিদ্ধিখোরের দলই চোখে পড়ে বেশি। অনেকেরই চোখ ছোটো ছোটো হয়ে যায়, মুখে অকারণ উচ্চ হাস্য ও তুচ্ছ প্রলাপ ফোটে এবং ভাবভঙ্গিতে একটা অবসাদের ভাব জেগে ওঠে। অনেক নাবালকই সেদিন বন্ধুর বাড়িতে সিদ্ধির মাত্রা বাড়িয়ে ফেলে, তারপর বাপ-মায়ের কাছে বকুনি খাবার ভয়ে আর বাড়িতে ঢুকতে পারে না, তাই বেশি রাত পর্যন্ত তারা পথে পথেই ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়।

দেওয়ালির রাতে চিৎপুর রোড— বিশেষ করে চোরবাগানের মোড় থেকে মেছোবাজারের মোড় পর্যন্ত— অগুনতি মানুষের মাথার পর মাথা নজরে পড়ে। পথের ধারের দোকান ঘরগুলি আলোকমালায় এবং সুলভ ও কু-শিল্পী অঙ্কিত চিত্রমালায় প্রাণপণে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব সাজসজ্জার মধ্যে লোভনীয় বিশেষত্ব তিলমাত্র না থাকলেও রাস্তার লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাই-ই দেখছে। প্রতিবারের প্রতি দোকানখানি ঠিক প্রায় একরকমভাবেই সাজানো হয়, আমার ছেলেবেলা থেকেই এটা লক্ষ করে আসছি। এই একান্ত একঘেয়ে সজ্জা যেন বর্তমানের বিচিত্র নূতনত্বকে প্রকাশ্যভাবে উপহাস করছে। হালুইকরের দোকানের খাবারগুলিও আজ থাকে থাকে বিশেষ কৌশলে সজ্জিত হয়েছে।

আলোকমালার উপরেই বারান্দা; বিলাসিনীদের রূপ আজ দুষ্ট অন্ধকার গ্রাস করতে পারেনি, রং-বেরঙের ছোপানো কাপড় ও 'নিমা'[৭.৩] পরে, মুখে, গলায় ও হাতে পাউডার (অভাবে খড়ি বা চুন) আর 'রুজ' (অভাবে আলতা) মেখে, ভুরুকে কৃত্রিম উপায়ে যুক্ত ভ্রূতে পরিণত করে এবং চোখে 'সুরমা' টেনে ইহলোকের এই নরকবাসিনীগুলি নিজেদের কদর্যতা যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে— যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোদার ওপরে এই খোদকারী আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপেই ব্যর্থ হয়েছে! রাস্তার লোকগুলো শিবনেত্র হয়ে তাদের রূপসুধায় চোখের ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটিয়ে নিচ্ছে— কেউ নিতান্ত পচা রসিকতায় তাদের টিটকিরি দিচ্ছে, কেউ নীচ থেকেই একটা অর্থপূর্ণ ইশারা করে নিজেদের মুখ ঢাকবার জন্য ঠোঁট থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির

ভিতর ঢুকে পড়ছে, কোনো কোনো দুষ্ট ছোকরা তাদের গায়ে জ্বলন্ত লাল বা নীল দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে, কুৎসিত গালাগালি খেয়েও হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে— অনেকে বারান্দার উপরে ছুঁচোবাজি ছাড়তেও ত্রুটি করছে না! ...পথের উপরকার আকাশ আজ হরেকরকমের বাজি ও মানুষে বিচিত্র ও শব্দিত এবং বাতাসে বারুদের দুর্গন্ধ। মাঝে মাঝে এক-একটা হাউই বা রকেটের দগ্ধাবশেষ সবেগে নেমে এসে ঠক করে পথিকদের কারোর মাথার ওপরে পড়ে তাকে দস্তুরমতো চমকে দিচ্ছে, কেউ কেউ বাজির পতন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সন্তর্পণে ছাতা মাথায় দিয়ে পথ চলছে!

কার্তিক ও সরস্বতী পূজা কলকাতার ঘরে ঘরে হয় এবং বিশেষ করে এই দুই দেব-দেবী গণিকাদের অত্যন্ত প্রিয় দেবতা। কিন্তু এর কারণ বোঝা ভারি শক্ত। কার্তিক হচ্ছেন দেব-সেনাপতি, চিরকুমার ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তিনি কী করে গণিকাদের প্রিয়পাত্র হলেন? কার্তিক পুজো করে গণিকারা কী আমাদের এই কথাই বোঝাতে চায় যে— 'স্ত্রী-রা আমাদের প্রধান শত্রু, অতএব তোমরাও চিরকুমার থাকো, আর একনিষ্ঠ হয়ে আমাদের উপাসনা করো?' এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্য হলেও আকাশ থেকে পড়ব না। গণিকার কার্তিক প্রীতির তবু একটা মন-গড়া মানে পাওয়া গেল, কিন্তু মূর্তিমতী বিদ্যার পূজা 'অবিদ্যা' নামে খ্যাত জীবগুলির আলয়ে কেন যে হয়, এ সমস্যা একেবারেই দুর্বোধ্য!

এই দুই পূজার রাত্রে গণিকারা বাবুদের প্রণামির দৌলতে রীতিমতো লাভবান হয়, কারণ তারা অধিকাংশ উপপতি ও বন্ধুকেই সাদরে আমন্ত্রণ করে। বাবুদের মধ্যে প্রণামি নিয়ে বেশ টক্করাটক্করিও লেগে যায়, ইনি পাঁচটাকা দিলে উনি দেন দশটাকা এবং তাই দেখে আর এক মহাত্মা হয়তো বিশটাকা ছেড়ে বসেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব যতই বেড়ে ওঠে, গণিকাদের ততই মজা। ভদ্রবাড়ির মতো এখানকার পূজাতেও অতিথিদের আদর যত্ন ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসে না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যারা কিছু নিষ্ঠাবান, তারা সাজানো সভায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, রুপো-বাঁধানো হুকোর বা গড়গড়ার নলে দু-চারটে টান মেরে ও দু-একটা পান খেয়েই কোনো ওজর দেখিয়ে সরে পড়ে— গণিকালয়ে পাত না পেতেই। কিন্তু তবু আহার স্থানে ভদ্রসন্তানেরও অভাব হয় না এবং তারাই দলে ভারী। গণিকার চরণে যারা সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত, তারা কি কোনো সংস্কারের তোয়াক্কা রাখে? নিমন্ত্রণের দিন অনেক রাত পর্যন্ত উৎসব চলে এবং সম্ভ্রান্ত গণিকারা নাচ-গান আমোদের ব্যবস্থাও করে প্রচুর— অতিথিদের প্রীত্যর্থে। মদের বোতল সেদিন খালি হয় পলকে পলকে! অনেক সময়ে একই বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়ে খুড়ো-ভাইপো প্রভৃতিও পরস্পরের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান। বাহুল্য, সুচতুর গণিকারা পুজোর সমস্ত খরচ পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধের মাথাতেই হাত বুলিয়ে আদায় করে নেয়। মাঝে এক সুবর্ণ বণিক জাতীয় ছোকরা বাবু কাপ্তেন-সমাজে[৭.৪] এই ব্যাপারে যারপরনাই নাম কিনেছিল। সে ছোকরা দু-দিন উড়তে ও বাপের পয়সা ওড়াতে শিখেই সরস্বতী পুজোয় পাঁচ-শো না সাত-শো টাকায় এক জমকালো প্রতিমা গড়ায় এবং পুজোর রাত্রে প্রতিমার মূল্যের অনুপাতে অন্যান্য খরচও করে অসম্ভব রকমের। তার কিছুদিন পরেই যখন শুনলুম যে, ছোকরা 'ইনসলভেন্সি' নিয়েছে, তখন কিছুমাত্র অবাক হলুম না। কারণ, এই কাপ্তেন-বাবুদের মনস্তত্ত্ব অতি অদ্ভুত। পুড়ে মরবে জেনেও তারা পতঙ্গের মতো যেচেই আগুনের দিকে এগিয়ে যায়, যেন পুড়ে মরাতেই তাদের আনন্দ। আকণ্ঠ ঋণে ডুবে গেলেও তারা আরও বেশি ডুবে যাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সাঁতার জানলেও কাটবে না। এও একরকম পাগলামি বা আত্মহত্যা আর কী!

ফুলদোলের রাত্রে নিমতলা স্ট্রিটে অপূর্ব এক দৃশ্য দেখা যায়। এ পথে পাশাপাশি নানা দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক। প্রায় প্রত্যেক দেবালয়ের সমুখেই প্রকাশ্য রাজপথের ওপরে ছোটো-বড়ো চাঁদোয়া খাটানো হয়, শতরঞ্চি ও চাদর পাতা হয়। এক এক দল লোক এক এক জায়গায় বসে গান-বাজনা শুরু করে। কোথাও একদল বাউলবেশি লোক নাচতে নাচতে গান গায়, কোথাও বৈঠকি গান হয়। কোথাও নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজতে শোনা যায়। নিমতলায় আনন্দময়ীর মন্দিরে যে বৈঠকি গানের আসর বসে, সেটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। সেখানে অনেক নামজাদা গাইয়ে ও বাজিয়ে সেদিন নিজের নিজের কেরামতি দেখিয়ে অর্থাৎ শুনিয়ে দেন। শ্রোতারা প্রায়ই অনাহুত বা রবাহুত। কিন্তু পান প্রভৃতি দিয়ে তাঁদেরও সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। সে রাত্রে এ রাস্তায় অনেক গণিকা ও আধা ভদ্র শ্রেণির যুবতিকে দেখা যায়। রসিক শ্রোতারা কান পেতে গান শোনেন, চোখ রেখে এদের উপরে। যথা সময়ে রসিকরা অবশ্য তাদের পেছনে পেছনে যেতেও ভুলে যান না।

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় অসাময়িক উৎসবের আসর বসে বারোয়ারি তলায়। এ-ব্যাপারেও বৎসর কয়েক আগে পাথুরেঘাটাই সর্বাগ্রে গণনীয় ছিল। পাথুরেঘাটার বিন্ধ্যবাসিনীর মতো[৭.৫] প্রকাণ্ড প্রতিমা আর কোনো বারোয়ারিতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এ প্রতিমাকে বিসর্জনের দিনে কেউ কাঁধে করতে পারত না, একখানা মস্ত লম্বা-চওড়া গাড়িতে বসিয়ে শত শত লোক মিলে টেনে নিয়ে যেত। গাড়িসুদ্ধ প্রতিমার উচ্চতা ছিল আড়াই-তলার কম নয়— সে এক বিরাট ব্যাপার। সেই সঙ্গে আগে সঙেরও আয়োজন ছিল। তিনদিন পুজো হত এবং প্রতি রাত্রে ও দিনে শ্রেষ্ঠ যাত্রা ও পালার কীর্তন প্রভৃতি উপভোগের জন্যে বারোয়ারিতলা বিপুল জনতার সমাগমে গম গম করতে থাকত। বিন্ধ্যবাসিনী পূজার পরেই উল্লেখযোগ্য লোহাপটি ও জোড়াবাগানের বারোয়ারি। এ দুই জায়গাতেই দেবী হচ্ছেন রক্ষাকালী। লোহাপটির 'বারোয়ারি সং'[৭.৬]-ও কলকাতায় খুব প্রসিদ্ধ। সেখানে এখনও বারোয়ারির সময় দিনে ও সারা রাত ধরে যাত্রা প্রভৃতি নানা আনন্দের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ বারোয়ারি উৎসবে সমাগত নারী শ্রোতাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণির গণিকার সংখ্যা বেশি।

কলকাতায় রাত্রিকালে আরও নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ ইতিহাস দেওয়া অসম্ভব।

অষ্টম দৃশ্য

অন্ধকূপের বাসিন্দা

শীতের রাত।...

ভারি অরসিক এই শীত, বাবুদের শখের খাতির সে রাখে না। দক্ষিণ হাওয়ার গলা টিপে ইলসেগুঁড়ির বাজার মাটি করে, শনিবারের আমোদে বাজ হেনে বুড়ো শীত শহরের ভেতরে জাঁকিয়ে বসে থাকে— নেটিভদের অভিশাপের কুছ পরোয়া না রেখে। অমন যে রূপ-দীপালির পাড়া সোনাগাছি, রাত ন-টা বাজতে না বাজতেই কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছে। দুপুর রাতে সেখানে আর জনমানবেরও টিকি দেখবার জো নেই, কবেকার এক সোনা গাজীর কবরের প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে সোনাগাছি এখন কুয়াশায় ঝাপসা নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে ঠিক গোরস্থানের মতোই দেখাচ্ছে। শখের বাবুরা ঘরের সমস্ত ছ্যাঁদা সন্তর্পণে বন্ধ করে লেপের ভেতরে ঢুকে ঠান্ডা হাওয়াকে 'বয়কট' করছেন, রূপসিরাও শূন্য ঘরে একেশ্বরী হয়ে বসে বসে শীতের মুখে নুড়ো জ্বালবার ব্যবস্থা দিচ্ছে— বাবুর বাজার ভারি আক্রা। ঘরে ঘরে গলা ধাক্কা খেয়ে শীত হু হু করে কনকনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কলকাতার পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছে, এবং মনের যত ঝাল গরিবদের উপরেই ঝেড়ে নিচ্ছে।

কুয়াশা আর কুয়াশা আর কুয়াশা। যেদিকে চাই খালি কুয়াশা আর ধোঁয়া! কলকাতার দীপ্ত রূপ একেবারে ময়লা হয়ে গেছে। গ্যাসের আলো পর্যন্ত কুয়াশা আর ধোঁয়া মেখে দুঃখীর ম্লান ছলছলে চোখের মতো সকাতরে চেয়ে আছে। দু-পাশের সমস্ত বাড়ির প্রত্যেক জানলা দরজা বন্ধ— জীবনের কোনো লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুরন্ত বাতাস জেগে উঠছে— সে আসছে কোনো তুষারের মরুভূমি থেকে এবং যে-অভাগার পথের কাজ সারা হয়নি, বায়বীয় বরফের মতো সেই ভীষণ ঝোড়ো ঝাপটায় তার দেহের প্রত্যেক ধমনীতে রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আকাশে চাঁদের আবছায়া জেগে আছে বটে, কিন্তু তার মুখ যেন মর-মর রোগীর মতো শীর্ণ ও পাণ্ডু!

হে সুখশয্যায় শায়িত বিলাসী! তোমার তপ্ত নৈশ প্রচ্ছাদনীর অন্তরাল থেকে একবার, এক মুহূর্তের জন্য বাইরে বেরিয়ে এসো। তোমার সুখস্বপ্নের অবকাশে ক্ষণেকের জন্যে বাস্তবের কঠিন মূর্তি দেখে যাও! এতে আনন্দ নেই, কিন্তু নিয়তির নির্দয় উপহাসে সত্য যে কী ব্যথার জনক হয়, অন্তত তারও কিছু কিছু পরিচয় পাবে!...

দেখো! এক বুড়ো চলেছে বুড়ির হাত ধরে— সামনের দিকে দুমড়ে ভেঙে পড়ে। এ বুড়ো অন্ধ— বুড়ির দুটি স্তিমিত চোখের সাহায্যেই সে তার কাজ চালাচ্ছে। তার গায়ে কাপড় নেই, কোমরের সম্বল এক কপনি, তাও ছেঁড়াখোড়া। জুতো, মোজা, সোয়েটার, গলাবন্ধ, ওয়েস্টকোট, কোট, ওভারকোট, অলস্টার, শালদোশালা আর যৌবনের প্রবল উত্তাপেও তোমার শীত ভাঙছে না— কিন্তু এ বুড়ো আর বুড়ি তবু কী করে এমন কঠোর শীতেও বেঁচে আছে? ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, দাঁতে দাঁত লাগাতে লাগাতে বুড়ো করুণ মিনতিভরা আর্ত রবে সমানে ডেকে চলেছে— 'একটা পয়সা ভিক্ষে দাও— বাবুগো, একটা পয়সা ভিক্ষে দাও!' —তুমি শালদোশালার পোষ্যপুত্র, পাশ দিয়ে এক ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছ— পকেট তোমার রুপোর টাকায় ভরতি— কিন্তু তার এক কণাও

বুড়ো-বুড়ি পাবে না! কিন্তু তবু তারা সমানে কেঁদে চলেছে, সারাজীবনের হতাশার সঙ্গে যুঝে যুঝেও তবু তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, সারাজীবন কেঁদে কেঁদেও তাদের অশ্রুর উৎস শুষ্ক হয়নি, সারাজীবন নিষ্ফল প্রার্থনা জানিয়েও তাদের প্রার্থনা নীরব হয়ে পড়েনি! ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এদের তো ডাকে না— এরা যে সংসারের বাতিল মাল। তারা ডাকবে তাদের যৌবন যাদের সহায়, পৃথিবী যাদের উৎসব-গৃহ, দুনিয়া যাদের ভালোবাসে।

আরও দু-পা এগিয়ে এসো। পথের ধারে ধারে —অনাবৃত ফুটপাথের উপরে চেয়ে দেখো, সারি সারি নরমূর্তি পাশাপাশি শুয়ে আছে— চারিদিকে শীত আর কুয়াশা আর ঠান্ডা হাওয়া নিয়ে। এদের ঘর নেই— পথের ওপরেই এদের জন্ম ও মৃত্যু! মাঝে মাঝে শীতের বর্ষা নামে, তখন এদের উপভোগের পাত্র সত্য সত্যই কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজপথে কুকুর আছে, বিড়াল আছে— কিন্তু এরা মানুষ! তোমার আমার মতোই মানুষ। তোমার আমার মতোই রাজধানীর বাসিন্দা। তোমার আমার মতোই এক রাজার প্রজা, এক ভগবানের সন্তান, এক সুখ-দুঃখের অধীন। তবু তোমার আমার সঙ্গে এদের কী প্রভেদ! মনুষ্যত্বের এই কল্পনাতীত দুর্ভাগ্য, এ হচ্ছে রাজধানী কলকাতারই নিজস্ব। এমন দৃশ্য পল্লিগ্রামে দুর্লভ।

এগিয়ে চলো— এগিয়ে চলো। চোখের সামনে দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে যাচ্ছে। ওই দেখো, পথের ধারের খাবারের দোকানগুলো সাজানো রয়েছে। তাদের প্রকাণ্ড উনুন, তলায় মস্ত বড়ো গর্ত— ছাইভস্ম যেখানে সঞ্চিত হয়। সেই সব গর্তের ভেতরে মাঝে মাঝে দেখবে, শীতার্ত হতভাগ্যেরা দুই পা ঢুকিয়ে দিয়ে পথের ওপরে মরণাহতের মতো ঘুমিয়ে অসাড় হয়ে আছে। সে আগুনের আঁচ তুমি আমি সইতেই পারব না— তাদের কিন্তু সে অনুভূতি নেই! হয়তো শীতে কেঁপে মরার চেয়ে চামড়া ঝলসানো তাপই তাদের কাছে বেশি কাম্য!

এক-একটা নোংরা, অন্ধকার গলির মোড়ে বা ধারে নিম্নস্তরের গণিকারা অনেক রাত পর্যন্ত পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই দেহের ব্যবসা যে কতটা কামগন্ধহীন, শীতের রাত্রে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। রাত যখন দুপুর, পথ যখন প্রায় নির্জন, শীত যখন প্রচণ্ড, হিম যখন মর্মান্তিক, নেড়ে-কুকুরগুলোও যখন অদৃশ্য, পথের ওপরে তখনও তারা সমানে দাঁড়িয়ে আছে— লোক আসবার সম্ভাবনা নেই, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা করেও দাঁড়িয়ে আছে— ধোঁয়া কুয়াশায় দম-বন্ধ হয়ে আসছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে— শীতে সর্বাঙ্গ কালিয়ে গেছে, দেহ আর বশ মানছে না, তবু দাঁড়িয়ে আছে। চার আনা, ছ-আনা, আট আনা পয়সা— তাও রোজ তাদের জোটে না। মাঝে মাঝে পুলিশের লোক আসছে, আর তারা প্রাণপণে ছুটে আপনাদের অন্ধকূপের মতো বাসা বা গহ্বরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ছে, যারা পালাতে পারছে না তাদের ওপরে বেত, চড়, ঘুসি বা লাথি-বৃষ্টি হচ্ছে। ...খানিক পরেই আবার দেখবে, তারা স্বস্থানে এসে অবস্থান করছে। কিছুকাল আগে একদিন দেখেছিলুম, জোড়াবাগানের পুলিশের আস্তানার এক সাহেব, পথের ধারে এই শ্রেণির এক অভাগীর পেছনে তাড়া করল। খানিক দূর গিয়েই সাহেব তাঁর আঁচল চেপে ধরল— কিন্তু ভীত স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই একটানে পরনের কাপড় ফেলে দিয়ে, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পথ দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। সাহেবের চোখে সে দৃশ্য নতুন, স্তম্ভিতের মতো পথের ওপরে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ...অনেক স্ত্রীলোক পাহারাওয়ালা দেখেও পালায় না, পাহারাওয়ালারাই বরং তাদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলায় ইয়ার্কি করে। কারণ আর কিছু নয়— এ সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক নয়— পাহারাওয়ালার ট্যাঁক খুঁজে দেখ, এই হতভাগিনীদের কষ্টার্জিত দু-এক খণ্ড

তাম্র সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। এদের দেখলে সত্যই আমার চোখ ভিজে আসে— গণিকা হলেও এরা তো প্রাণহীন নয়। শুনেছি বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দিয়ে যেতে যেতে এই শ্রেণির স্ত্রীলোকদের দেখলে, প্রত্যেকের হাতেই কিছু কিছু অর্থ গুঁজে দিতেন। এদের দুঃখে তাঁর দয়ার প্রাণ সাড়া না দিয়ে পারত না। উচ্চস্তরের গণিকারা বারান্দায় রূপের পসরা সাজিয়ে বসলেও পুলিশ কিছু বলে না, কিন্তু তার যত রোখ এদের ওপরেই। এটা নাকি বেআইনি। বারান্দায় গণিকা দাঁড়ানো বেআইনি নয় কেন? রাজদণ্ড কি গরিবদের জন্যেই?

মোড়ে মোড়ে পানের দোকান— সেসব দোকানে পানওয়ালির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে পান বেচবার অছিলায় তাদের রূপের ব্যবসাও বেশ ভালোরকমই চলে যায়। এই সব দোকান পাহারাওয়ালাদের বিখ্যাত আড্ডা। শীত বেশি বাড়লে ও প্রাণটা বেশি ঠান্ডা হলে পাহারাওয়ালাজি গোঁফ-দাড়িতে মোচড় দিতে দিতে, ঠোঁটে রসের হাসি মাখিয়ে পায়ে পায়ে পানের দোকানের দিকে অগ্রসর হন— স্যাঁতা প্রাণকে কথঞ্চিৎ তাতিয়ে নেবার জন্য। পানওয়ালি মিষ্টি হাসি হেসে তখনই পাহারাওয়ালাজিকে ভালো করে সেজে একটি বা দুটি পানের খিলি ও গোলাপি বিড়ি উপহার দেয়। তারপর দু-জনের মধ্যে মৃদুস্বরে রসালাপ চলে। এমন রসালাপের মধ্যেও পাহারাওয়ালাজি কিন্তু আত্মহারা হয়ে পড়েন না, দৃষ্টি তার বিলক্ষণ সজাগ থাকে— চোর ধরবার জন্য নয়, অতর্কিতে পাছে কোনো উপরওয়ালা এসে পড়েন, সেই ভয়ে। মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস, কলকাতার রাস্তায় পাহারাওয়ালার কাছে পানওয়ালিরাও তেমনি— বড়ো দুঃখে একটুখানি সুখের ফোঁটা।

শীতের রাত্রে কোনো কোনো রাস্তার মোড়ে গরিব বেহারিরা প্রকাণ্ড আগুন জ্বেলে চারপাশে তারা গোল হয়ে বসে। সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রে একটু বিশ্রামের অবকাশ মিলেছে, এ সময়টা তারা শীতে কেঁপে মরতে চায় না। আগুন পোহাতে পোহাতে তারা সমস্বরে গান ধরে— সেই সঙ্গে ঢোল ও করতাল চলে, গান ও বাজনা ক্রমে দুন হয়ে ওঠে— ক্রমে তা একটা দুর্বোধ্য হট্টগোলে পরিণত হয়, সে খচমচ, দুমদাম, হইচই শুনে আশেপাশের পাড়া থেকে ঘুম একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এবং ধনীরা চটে লাল হয়ে ওঠেন। অনেক রাত পর্যন্ত— যতক্ষণ না গলা ও হাত শ্রান্ত হয়ে পড়ে— এই ব্যাপার সমানভাবে চলতে থাকে। এর মধ্যে উপভোগ্য কী আছে, আমরা তা বুঝব না। গরিবের উপভোগ গরিবেই বোঝে।...

ভিখিরিপাড়ায় কখনো গিয়েছেন? কলকাতার স্থানে স্থানে ভিখিরিপাড়া আছে, আমরা অনেকেই তার অস্তিত্বের কথা জানি না। এখানে তারাই আড্ডা বানিয়ে থাকে, পরের টাকায় যাদের দিন চলে। এইখানেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ এবং এই পার্থক্যের জন্যই আর পাঁচজনের সঙ্গে তাদের চরিত্র মিশ খায় না। আমরা অনেকে সমাজের ভেতরে জেনেশুনেও চোর-জোচ্চোর বা অসাধুর সঙ্গে প্রকাশ্য সম্বন্ধ রেখে থাকি, কিন্তু ভিখিরির সঙ্গে কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখতে আমরা সকলেই নারাজ— যদিও অনেক ভদ্রবেশী ভিখিরি আমাদের মধ্যে সর্বদাই বিচরণ করে। প্রকাশ্যে যারা ভিক্ষাকে ব্যবসা করে, সাধারণ সমাজের মধ্যে থাকতে না পেলেও তাদের এক নিজস্ব সামাজিক জীবন আছে— সে জীবনের সঙ্গে মনুসংহিতার বিধি নিষেধ কিছুই মেলে না। এই ভিখিরিপাড়ায় আমি মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে এসেছি। তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সুর জুড়ে দিতে পারে— কিন্তু রাশিয়ার মতো এদেশেও কোনো বাঙালি ম্যাক্সিম গোর্কি জন্মাননি, তাই এই সমাজবহির্ভূত সমাজের বিচিত্র ফোটো সাহিত্যের আসরে দেখতে পাই না।

ভিখিরিপাড়ায় দিনের বেলায় বড়ো কিছু দেখবার থাকে না— কারণ বাসিন্দারা তখন কলকাতার নানা দিকে দৈনিক ব্যবসা করতে যায়। ক্রমে রাতেও অনেকে ফেরে না— জাল অন্ধ ও খোঁড়া প্রভৃতি সে দলে থাকে। চোখ থাকতে যারা কানা, দিনের বেলায় তাদের ব্যবসার সুবিধা হয় না— কারণ দাতারাও তো চোখ থাকতে কানা নয়। সন্ধ্যার মুখে ভিখিরিপাড়ার মজলিশ একটি দেখবার দৃশ্য। সাধারণ শহরের খুব ওঁচা অংশে ভিখিরিরা বাস করে। সরু গলি, ভেতরে আলো আর হাওয়ার যথেষ্ট অভাব, চারিদিকে নোংরা আবর্জনা ছড়ানো, তারই মধ্যে ছোটো ছোটো খোলার চালের মেটে-ঘরের হেলে পড়া দেয়ালের মধ্যে ভিখিরিদের বাস। তাদের অনেকেই বংশানুক্রমে ভিখিরি, চোদ্দো পুরুষেরই এক ব্যবসা। খুব গরিবের ছেলেও কালে রাজা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কিন্তু ভিক্ষাপুষ্ট রক্তে যার জন্ম, সে বোধ হয় কখনো আর কর্মী হয়ে নাম কিনতে পারে না — ভিখিরির ছেলে তাই ভিখিরিই হয়— অকর্মণ্য, পরান্নভোজী— আলস্য-ব্যাধি এমনই বংশানুক্রমিক। আর আলস্যই বা বলি কেন, ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য তাদের অধিকাংশকেই যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, তার তুলনায় চাকুরির পরিশ্রম ঢের বেশি সহজ। কিন্তু তবু তারা তা করতে পারে না, কারণ ভিক্ষার মোহ তাদের মজ্জাগত। এ যেন কোকেন বা আফিমের নেশা, অভ্যস্ত হলে আর উপায় নেই।

ভিখারিরা অনেকে সপরিবারে বাস করে, তাদের মা, বোন, বউ, মেয়ে ও ছেলে— সবাই ভিখিরি। ধর্মে তারা হিন্দু হলেও তাদের মধ্যে জাতিভেদের বড়ো বেশি কড়াকড়ি নেই। আমি এমন কোনো কোনো ভিখিরিকে দেখেছি, যারা সর্বনিম্নস্তরের গণিকা বা গণিকার মেয়েকে বিবাহ করেছে। এখানে চরিত্রের দাম খুব কম বা কিছুই নেই। ভিখিরির মেয়ে বা স্ত্রী প্রায়শই প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করলেও কেউ কিছু বলবে না। সামাজিক কোনো বন্ধনেরই এরা ধার ধারে না— যেন-তেন-প্রকরেণ দেহের সঙ্গে আত্মাকে একত্রে রাখাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গলির মধ্যে এক একটা গর্তের মতো ঘরে অল্পবয়সি ভিখিরিদের আড্ডা বেশ জমে ওঠে। আমার বাড়িতে আগে এক যুবক ভিখিরি আসত, তাকে ডাকত সবাই ‘পাগলা’ বলে। গান গেয়ে তার দৈনিক রোজগার বড়ো মন্দ হত না। এই পাগলার সঙ্গে ভাব করে

বার দুই-তিন আমি ভিখিরিদের আড্ডায় গিয়ে বসেছি। আড্ডার মধ্যে প্রথম দিনে আমার আবির্ভাব সকলেরই মুখ বোবা করে দিলে। অত্যন্ত সন্দেহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বারবার তারা আমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে লাগল। কেউ কেউ সে স্থান ছেড়ে পালাবার উপক্রম করলে— বোধ হয়, আমাকে পুলিশের লোক ভেবে। পুলিশকে এরা ভারি ভয় করে— কারণ ভিক্ষা করতে গিয়ে সুবিধা পেলে এরা অনেকে গৃহস্থের ঘটি-বাটি সরাতেও ইতস্তত করে না কিনা।

কিন্তু পাগলা তাদের অভয় দিয়ে বললে, 'ভয় নেই ভাই, ভয় নেই। ইনি আমার চেনা বাবু, আমাদের আড্ডা দেখতে এসেছেন। তোমরা ফুর্তি করো, যাবার সময়ে বাবু তোমাদের খুশি করে দিয়ে যাবেন।'

আমার খেয়াল দেখে তাদের বিস্ময় কমল না বটে, তবে সকলের ভাব দেখে বোঝা গেল, তারা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল।

ঘরের চারদিকে মাটি ল্যাপা, এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল— পথের দিকে দেয়ালের নীচের দিকটায় বৃষ্টির ঝাপটা লেগে, ভিতরকার কঙ্কাল— অর্থাৎ বাঁখারিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। দেওয়ালের উপরদিক 'আলম্যানাকে'র ও সস্তা দরের সিগারেটের অসংখ্য ছবি দিয়ে অলংকৃত। একদিকে একখানা শতছিন্ন মাদুর-বিছানো চৌকি আর গোটা দুই ওয়াড়হীন তৈল-পঙ্ক ময়লা বালিশ— এত কালো যে, হঠাৎ দেখলে 'অয়েল-ক্লথে' তৈরি বলে মনে হয়। আর একদিকে মেটে মেঝের উপরে দু-খানা দর্মা বিছানো। এককোণে একটা তোলা উনুন, ও কতগুলো হাঁড়ির ওপরে হাঁড়ি। বুঝলুম, এই একটা ঘরই সময় বিশেষে বৈঠকখানা, রান্নাঘর ও শয়নাগারে পরিণত হয়।

ঘরের লোকগুলো সব কেউ চৌকির ও কেউ মেঝের ওপরে শুয়ে বা বসে জটলা করছিল। তাদের প্রত্যেকেরই চেহারা ঝোড়ো কাকের মতো। কেউ কেউ যে কতদিন অস্নাত আছে, তার হিসেব জানেন একমাত্র ভগবান। সকলেরই পরনের কাপড় ময়লা, ছেঁড়া বা তালি-মারা। ঘরের ভিতরে এমন একটা মিশ্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যে, ক্ষণকালের মধ্যেই নাসিকা অস্থির হয়ে উঠল। তার ওপরে আবার গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ। প্রায় সকলেরই হাতে পালাক্রমে গাঁজার কলকে ঘুরে যাচ্ছে। একটা টিকটিকির মতো রোগা লোক, এককোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটা লম্বা মুখনলওয়ালা ছোটো হুঁকা নিয়ে বসে আছে। খানিক পরেই দেখলুম, সে লোকটা নলে টান মারলে ও ফুড়ুক করে একটা আগুনের ছিটে তার কলকে থেকে ঠিকরে পড়ল। সে গুলিখোর আর একটা রোগা লোক ট্যাঁক থেকে একটা মোড়ক বার করে, মোড়কটা খুলে দু-হাতে মুখের সামনে ধরলে ও জিভ দিয়ে খানিকটা সাদা গুড়ো সাবধানে চেখে নিলে। সে কোকেনখোর! ...একটু পরে একটা স্ত্রীলোক এসে ঘরে ঢুকল। বয়স বোধ হয় তার চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, কিন্তু চেহারা এমনই পাকিয়ে গেছে যে, তাকে প্রৌঢ়া বললেও চলে। দেহের রং কুচকুচে কালো, পরনের কাপড়খানাও যেন দেহের রঙেই ছুপিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঘরের ভিতরে এতগুলো পুরুষ, আর সে যে স্ত্রীলোক, এজন্য তার কিছুমাত্র সংকোচ নেই— কারণ তার বুকের ওপরে স্ত্রী-চিহ্ন দুটি সম্পূর্ণ বেপরোয়ারই মতো অনাবৃত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে আছে।

ঘরের ভিতরের একজন তাকে দেখে বললে, 'কী গো পটলির মা, এখানে কী মনে করে?'

পটলির মা বললে, 'হ্যাঁরে বিশে, তোর কাছে ভাই পুরিয়া টুরিয়া কিছু আছে?'

বিশে বললে, 'হুঁ, গোটা দুই আছে। কী দরকার তোর?'

পটলির মা বললে, 'দে না ভাই আমায় একটা।'

'মাইরি! আমার রসদ কমলে আমি খাব কী?'

'তোর পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি। আমি দাম দিচ্ছি। না দিলে আমি মরে যাব, তাই কি তুই চাস?'

‘কেন, পুরিয়া ফুরিয়েচে তো আলুগুর আড্ডায় যা না!’

‘তা কি আর যাইনি? কিন্তু আড্ডা বন্ধ! শুনলুম আজ পুলিশ এসেছিল!’

বিশে চোখ কপালে তুলে বললে, ‘অ্যাঁ, আড্ডা বন্ধ! তাহলে তোকে পুরিয়া দিলে আমাকে দেখবে কে?’

‘দিবি না তাহলে, কেমন?’

বিশে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে— না!

‘আচ্ছা রে মড়িপোড়া মিনসে, মনে রইল। এবার তোর পুরিয়া কম পড়লে যেদিন আমার পায়ে ধরতে যাবি, সেদিন খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব। পটলির মা আরও কীসব বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাগলা তাকে সাবধান করে দিলে— ‘চুপ কর পটলির মা! দেখচিস না, ঘরের ভেতর বাবু রয়েচে!’

এতক্ষণে পটলির মায়ের চোখ আমার উপরে পড়ল। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে, তাড়াতাড়ি বুকের কাপড় টেনে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। তাহলে তার লজ্জা আছে।

আমি বললুম, ‘হ্যাঁ রে পাগলা, পটলির মা কী চাইছিল?’

‘ওর কোকেন ফুরিয়ে গেছে বাবু, তাই হন্যে হয়ে এখানে ছুটে এসেচে... আর, তুইও তো আচ্ছা মানুষ, বিশে! দেখচিস পটলির মা কষ্ট পাচ্চে, ওকে একটা পুরিয়া দিলে কী হত?

‘কী কথাই বললি ইয়ার! তারপর আমি কার পায়ে মাথা খুঁড়তুম? শুনলি তো আলগুর আড্ডা বন্ধ!’

‘তবু একটা পুরিয়া দেওয়া উচিত ছিল।’

বিশে এবার রেগে গিয়ে বললে, ‘দিইনি, আমার খুশি। এই যে তোরা সেদিন একটা পাঁইট কিনলি, আমাকে একফোঁটা দিয়েছিলি কি? নিজের পানে তাকিয়ে কথা ক!’

পাগলা একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে অপ্রতিভের মতো বসে রইল। সে যে মদ খায়, আমি তাই জানতে পারলুম বলেই তার এই সংকোচ।

কলকাতার ভিখিরিদের আংশিক চিত্র এইরকম। এই হচ্ছে দীন ভিখিরির দল, যাদের কাতর মুখ, করুণ চাহনি আর আর্ত স্বর আমাদের প্রাণ-মন গলিয়ে দেয়। আমরা এদেরই ভিক্ষা দিই। কিন্তু সে পয়সা যায় নেশার পূজায়। খালি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নয়, কলকাতার আরও কোনো কোনো ধনীর বাড়িতে দৈনিক ভিখিরি খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। অনেকে সেইখানেই খেয়ে নেয়, আর আমাদের দানের পয়সা মদ, গাঁজা, চরস, গুলি বা কোকেন কেনবার জন্য তুলে রাখে— অর্থাৎ আমরাই তাদের নেশার খরচ জোগাই। এইভাবে অধঃপতনের অন্ধকূপের নিম্নতম স্তরে বসে এরা পশু-জীবন দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়।

কলকাতার অন্ধকূপের আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে। ‘অন্ধকূপ’ বলতে আমি বোঝাতে চাই সেইসব স্থান, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘আন্ডারওয়ার্ল্ড’। এখানকার বাসিন্দা হচ্ছে চোর, ডাকাত, খুনে ও নিম্নশ্রেণির গরিবের দল। নিম্নশ্রেণি বা ছোটোলোকদের মধ্যে দারিদ্র্য বরাবরই পাপের অগ্রদূত।

একদিন রাত তিনটের সময় আমি ঘুরতে ঘুরতে জোড়াবাগান অঞ্চল দিয়ে ফিরছি। সঙ্গে একজন বন্ধুও ছিলেন— তিনি নাম-করা সাহিত্যিক।

হঠাৎ পথের পাশে এক জায়গায় অনেক লোকের গলা ও নাচ-গান বাজনার আওয়াজ পেলুম। পাশেই একটা গলি। সেখানে একপাশে খানিকটা খোলা জমি— তার ওপরে শামিয়ানা খাটানো। একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখি, চাঁদোয়ার তলায় মস্ত আসর বসেছে। বাইজি গান ধরেছে, আর প্রায় দেড়-শো লোক বসে বসে তাই শুনছে। শ্রোতারা প্রায় সকলেই পশ্চিমের লোক এবং তাদের মধ্যে অনেকেই গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান— যারা দিনের বেলায় চালায় গোরুর গাড়ি আর রাত্রিবেলায় করে গুন্ডামি। গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের অনেকেই যে কী ভীষণ চরিত্রের লোক, কলকাতার অধিকাংশ বাসিন্দাই তা জানেন না। আমি চোখের ওপরে দেখেছি, এরা পথিকদের মেরে-ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিচ্ছে। কলকাতার অনেক বিখ্যাত গুন্ডা গোরুর গাড়ির আস্তানার মালিক বা গাড়োয়ান। এই কিছুকাল আগেই নিমতলা ঘাটের কাছে এই শ্রেণির গুন্ডারা প্রকাশ্য দিনের বেলায়, জোড়াবাগান[৮.১] পুলিশ কোর্টের ঠিক পাশেই, একটি দেশি মদের দোকানের ওপরে চড়াও হয়ে বিনামূল্যে মদ খেতে চায়। দোকানের মালিকরা রাজি না হওয়াতে তারা একজনকে খুন ও দু-জনকে সাংঘাতিকরকম জখম করে যায়। কিন্তু ইংরেজ আইন এমন প্যাঁচালো যে, তারা ধরা পড়লেও শাস্তিলাভ করলে না।

এমন সব ঠ্যাঙাড়ে ও খুনেদের প্রাণেও শখ আছে। তারা আজ কেমন ভালোমানুষ সেজে বাইজির গান শুনছে। আমারও হঠাৎ সাধ হল, বিনা নিমন্ত্রণেই তাদের আসরে গিয়ে বসে খানিকক্ষণ সকলের হালচাল পর্যবেক্ষণ করতে। বন্ধুকে মনের কথা খুলে বললুম, তিনি তো ভয়ানক নারাজ। বললেন, ‘বল কী হে! যেচে হাঁড়িকাঠে মাথা গলানো! এ হতেই পারে না।’

বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় বলে গেছেন— এক-একটা ছেলেকে জুজুর ভয় দেখালে ভয় পায় না, উলটে জুজুকে দেখতে চায়। ছেলেবেলা থেকেই আমারও স্বভাব অনেকটাই এইরকম।

এইজন্য কতবার কত বিপদে পড়েছি বটে, কিন্তু সেসব বিপদ থেকে আমি এমন সব নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ও নর-চরিত্রের এতরকম অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সাধারণ বাঙালি জীবনে যা দুর্লভ। আমি জীবন দেখতে চাই, জীবন। বিছানায় শুয়ে বা কেতাব পড়ে তা দেখা যায় না।

বন্ধুকে প্রবোধ দিয়ে বললুম, ‘মাভৈ! দুর্গা বলে ঢুকে তো পড়ি, দেখবে কোনো বিপদই হবে না।’

আমি গুন্ডাদের জানি। বাইরে থেকে দেখতে যতটা ভয়ানক, আসলে তাদের ভেতরকার চেহারা ঠিক ততটা নয়। দরকার হলে তারা খুব সহজেই এক ফুঁয়ে মানুষের জীবন-দীপ নিভিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সে হচ্ছে তাদের ব্যবসা এবং সে নির্মমতা সাময়িক। সাধারণ জীবনে তারা তোমার আমার মতোই মানুষ। তখন তোমার আমার মতোই তারা ভালোবাসে, স্নেহ করে, আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে মেতে থাকে। দয়া ধর্মেও তারা বঞ্চিত নয়। মহাদেও বলে এক প্রচণ্ড গুন্ডাকে জানি, তাকে আমি প্রায়ই দেখেছি কানা-খোঁড়াকে পয়সা দিতে। বন্ধুত্বে তারা ঢের ভদ্রলোকের চেয়েও বড়ো। যাকে বন্ধু বলে জানে, তার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে। আবার যারা বিশ্বাস করে তাদের আশ্রয় নেয়, তাদের পায়ে তারা কুশাঙ্কুর বিঁধতে দেয় না। আমি কলকাতার যেখানে থাকি,

সেখানে গুন্ডার সংখ্যা অগুনতি। তাই আমি গুন্ডাদের চরিত্র উলটে-পালটে অধ্যয়ন করবার সুবিধা পেয়েছি। কোনো মানুষেরই সবটা খারাপ নয়।

আমি বিলক্ষণই জানতুম, গুন্ডারা যখন আনন্দে মেতে আছে, তখন তারা অশান্তির কথা মনেও আনবে না। বিশেষ, আমরা যেচে তাদেরই আশ্রয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছি— তাদের বিশ্বাস করছি। আমাদের এ নির্ভরতার মর্যাদা তারা রাখবেই রাখবে। অতএব বন্ধুকে টেনে নিয়ে, একটা বাঁশের বেড়া টপকে, আমি হাসতে হাসতে একেবারে আসরের মধ্যে গিয়ে বসলুম।

ভারি অবাক হয়ে তারা আমাদের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। এত রাত্রে, আমাদের মতো দুটি নিরীহ ভদ্র চেহারা যে অনাহূত হয়ে তাদেরই আসরে গিয়ে বসতে পারে, এটা বোধ হয় তাদের কাছে অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। কিন্তু তার পরেই আমাদের আবির্ভাবকে তারা খুব সহজভাবেই নিলে। যাতে ঘেঁষাঘেঁষি না হয়, সেজন্য জন কয়েক লোক সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে আমাদের চারপাশে যথেষ্ট জায়গা করে দিলে। তারপর নাচ-গান-বাজনা আবার অবাধে চলল— কেউ প্রশ্নও করলে না, আমরা কে, এত রাত্রে কেন এখানে এসেছি? যা ভেবেছিলুম তাই— তাদের চরিত্র আমি ভুল বুঝিনি।

বাইজি দুটি বাঙালি এবং একটিকে দেখতে শুনতেও বেশ। গানও গাইছিল ভালো। এদের পছন্দ আছে। নতুন নতুন গানের সঙ্গে তবলা-বাঁয়া দুটো বার বার হাত বদলে যাচ্ছিল— এখানে বাজিয়ের সংখ্যা তো কম নয়। এরা খালি ছোরা ধরতেই শেখেনি, আর্টেরও চর্চা করে দেখছি। বাস্তবিক, তারা সকলেই খুব ভালো বাজাচ্ছিল। এতগুলো তৈরি হাত ভদ্রলোকের আসরেও বড়ো একটা দেখা যায় না।

বাইজিদের হাবভাব দেখে বুঝলুম, এই দলে দলে অপ্রিয়দর্শন বিদেশি লোকগুলির মধ্যে আমাদের পেয়ে তারাও যেন বেশ খুশি হয়েছে। আমাদের দেখবার আগে তারা এদিকে পেছন ফিরেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের দিকেই মুখোমুখি বসে গান ধরলে। তারা দু-জনেই এক গা গয়না পরে এসেছে— বায়নার সময়ে নিশ্চয়ই টের পায়নি, আজ তাদের বাঘের গর্তে ঢুকতে হবে। মনে মনে অবশ্যই তারা ভয় পেয়েছে— যদিও অকারণে। বাঘরা আজ শুধু খেলতে চায়, গয়নার দিকে তাদের চোখ নেই।

সত্য, এখানকার শ্রোতারা অত্যন্ত সমঝদার। একেবারে শান্তশিষ্টের মতো বসে তারা একাগ্রমনে গীতসুধা পান করছে এবং মাঝে মাঝে যথাস্থানে বাহবা দিচ্ছে। ভদ্রের আসরেও আমি এত সমঝদার শ্রোতা দেখিনি। বাগানবাড়ির গানের আসরে দেখেছি, সে কী হুল্লোড়, কী দাপাদাপি— কার সাধ্য সেখানে গান জমায়। সে মাতামাতির আসল কারণ, মদ। কিন্তু এখানে সুরাদেবীর মহিমা না থাকলেও, প্রায় সকলেই যে ভাঙের নেশায় মশগুল হয়ে আছে, শ্রোতাদের মুখ দেখলেই তা বুঝতে আর দেরি লাগে না।

খানিকক্ষণ পরেই জন কয়েক লোক এসে ধরে বসল, আজ আমাদের এখানে খেয়ে যেতে হবে— এ যে দেখছি জামাইআদর। অনেক করে তবে তাদের বুঝিয়ে দিলুম, রাত চারটের সময় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস নেই, আমরা বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি — ইত্যাদি। তারপর আমরা বিদায় নিলুম— কারণ বন্ধুবরের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এত আদরযত্নেও তাঁর মন মোটেই প্রবোধ মানছে না— তিনি জলের মাঝ ডাঙায় এসে পড়েছেন। ...এই হল গিয়ে আমাদের গুন্ডার আড্ডায় বাইজির গান শোনা। শয়তানের রং যে ছবিতে আঁকার মতো অতটা কালো নয়, আশা করি আপনারা এতক্ষণে তা বুঝতে পেরেছেন।

নবম দৃশ্য

রঙ্গালয়

আগে যাত্রার আসরে আমরা সারারাত কাটাতুম, এখন সে সময়টা কাটছে থিয়েটারে। শিক্ষিত বাঙালি যাত্রাকে এখন একরকম 'বয়কট' করছে বললেই চলে এবং দেশের অগণ্য শখের ও পেশাদার থিয়েটারগুলোর আওতায় পড়ে যাত্রার দল দিনে দিনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যাত্রার অধিকারীরা এখন তাই থিয়েটারের নকল করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। একেলে 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি'গুলিই তার প্রমাণ। এতে যাত্রার ঢং বদলে গেছে, অভিনয়ের ধরন বদলে গেছে, গানের সুর বদলে গেছে এবং প্রায়ই কলকাতার প্রকাশ্য রঙ্গালয়[৯.১] ভাড়া নিয়ে এসব যাত্রার অভিনয় হয়। আসলে এগুলো না যাত্রা, না থিয়েটার।

ছেলেবেলায় আমরা বারোয়ারিতলায় ও পূজাবাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে যাত্রা দেখতুম। সে যে কী কষ্টকর ব্যাপার, এখনও বেশ মনে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় একটা ছাড়াছাড়ি নির্লিপ্ত ভাব আছে— সভায় ও আসরে সেখানে প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র আসন না হলে চলে না। কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে সর্বত্রই গায়েপড়া ভাবটাই প্রধান হয়ে আছে। বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবার সর্বদাই সমস্ত অনৈক্যের সমস্যাকে প্রাণপণে সমাধানের চেষ্টায় বিব্রত এবং বাইরেও সভায় ও আসরে সকলেই একাসনে পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি করে উপবিষ্ট। কোন ব্যবস্থা উপকারী, আমি তা নিয়ে এখানে নাড়াচাড়া করতে রাজি নই, কিন্তু স্মরণ আছে, গ্রীষ্মকালে যাত্রার আসরে আমাদের কী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। গুমোট করা রাত্রে সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে বিপুল জনতা জড়ো হয়েছে, দর দর ঘামে আমরা আপাদমস্তক ভিজে উঠছি, মাথার ওপর 'ফ্যান' তখন কল্পনাতীত, কোনোদিকে একচুল নড়বার উপায় নেই— কারণ ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে লোকের পর লোক আমাদের যেন প্রাণপণে চেপে ধরে আছে, অনেকের গায়ে বিষম দুর্গন্ধ, অনেকে কনুইয়ের গুঁতো মারছে এবং অনেকে আরও যে কত কী করছে তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। এরই মধ্যে 'নিতুই নিতুই রাজবাড়ি ফুল যোগাই কেমন করে' বলে বিদ্যাসুন্দরের[৯.২] মালিনী না-কামানো খোঁচা দাড়ি-গোঁফঅলা মুখে, কখনো হিজড়ের মতো হাততালি দিতে দিতে, কখনো হাঁটুর কাপড় একটুখানি তুলে ধরে ও কালো কালো কর্কশ পা বার করে ঘুরে ফিরে নেচে যায়, বিদ্যার মা এসে নাকি সুরে কান্না ধরে, রাজা ও কোটাল গর্জন করে তড়পাতে থাকে, রুক্ষ পরচুল-পরা পিলে মোটা কৃষ্ণবর্ণ ছোঁড়াগুলো সখী সেজে অস্বাভাবিক স্বরে গান গেয়ে কানের পোকা তাড়িয়ে দিয়ে যায়, উকিলের সাজে জুড়ির দল চারকোণে দাঁড়িয়ে, যেন কাল্পনিক শত্রুর সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করার ভঙ্গিতে ভীম বিক্রমে বাহু সঞ্চালন করে ও বুক চমকানো মুখভঙ্গির সঙ্গে পাঁঠার ডাকের মতো গিটকিরি দিয়ে তান ছেড়ে তানসেনের আদ্যশ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

ঝাড়লণ্ঠনের ম্লান আলোতে অস্পষ্টভাবে এইসব দৃশ্য আমার শেষরাত পর্যন্ত ঠায় বসে বসে নিষ্পলক নেত্রে দেখতে দেখতে বাহবা দিতে ছাড়তুম না। তারপর যাত্রা ভেঙে যেত এবং আমাদের অনেকেই আর জুতো খুঁজে পেতুম না। যখন দেহে-মনে নিস্তেজ হয়ে বাড়িতে ফিরতুম, তখন বোধ হত যেন সারারাত্রব্যাপী মল্লযুদ্ধ করে আসছি। যাত্রা যে খাঁটি

দেশি আমি তা জানি, কিন্তু আমাদের বাল্যকালে যা দেখেছি তাতে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেটি একটি মারাত্মক স্বদেশি ব্যাপার। এবং হয়তো এই জন্যেই বিনামূল্যের যাত্রা ছেড়ে লোকে এখন ট্যাঁকের টাকা খরচ করেও থিয়েটার দেখতেই বেশি ভালোবাসে।

রাতের কলকাতায় থিয়েটার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে থিয়েটারের ভক্ত অগুনতি। এখানে এলে আমাদের জাতীয় বিশেষত্বগুলি চোখ ও কানের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাহেবদের দেখাদেখি বাঙালিরা এদেশে থিয়েটারের পত্তন করে বটে, কিন্তু বিলাতি থিয়েটারের অধিকাংশ গুণই বাংলা রঙ্গালয়ে দেখা যায় না। বিলাতের কথা ধরি না, কিন্তু আমাদের এই কলকাতারই বিলাতি থিয়েটারগুলিতে (ধরুন, এম্পায়ার থিয়েটার[৯.৩]) গেলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ি, নীচে থেকে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত আগাগোড়া মার্বেলে বাঁধানো। কোথাও অতিরিক্ত কারুকার্য রসবোধকে আহত করে না, অথচ এক সরল, মার্জিত সৌন্দর্য মনকে মুগ্ধ করে। অত বড়ো বাড়ি, নিত্য কত লোক আসা-যাওয়া করছে, তবু সমস্তটাই এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, অনুবীক্ষণের সাহায্যেও হয়তো ধুলো-জঞ্জালের কণা আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে। এর তুলনায় বাঙালিরা যে বাড়িগুলিতে রাত্রির পর রাত্রি যাপন করে, তাদের অবস্থা যে কী শোচনীয়, সে কথা পরে যথাস্থানে বলার চেষ্টা করব।

বিলাতি রঙ্গমঞ্চের ভিতর থেকেও কোথাও দীনতা-দারিদ্র্যের এতটুকু চিহ্ন বাইরে উঁকি মারে না। চারিদিকে কলাসৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা নিয়ে সানন্দে রাত্রিযাপনের জন্যেই দর্শকরা এখানে এসে টাকা খরচ করে এবং বিলাতি রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীরাও সেটা বুঝে সাচ্চা টাকার বদলে ঝুটো মাল দেয় না। এখানকার দৃশ্যপটে কাঁচাহাতের তুলির টান, ছেলে-ভুলানো বাজে রঙের বাহার, অসাময়িকতা, অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য একেবারেই নেই। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, ছাদের ওপর থেকে কুৎসিত কাঠের বা বাঁশের 'ফ্রেম' দড়াদড়ি ও ছেঁড়াখোড়া ন্যাকরা উঁকিঝুঁকি মারছে, পার্শ্ব-পটের (wings) সঙ্গে সামনের দৃশ্যপটের মিল নেই, নতুন দৃশ্যপটের সঙ্গে মান্ধাতার আমলে আঁকা, রং-জ্বলে যাওয়া, ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্যপটও গুঁজে দেওয়া হয়েছে, রঙ্গমঞ্চের তলায় উলঙ্গ, ধুলোভরা কাঠের তক্তাগুলো দেখা যাচ্ছে এবং অভিনেতাদের পোশাকেও ঠিক এমনই সব ত্রুটিবিচ্যুতি।

অভিনয়েও দেশি-বিলাতিতে এমনি তফাত। কলকাতার সাহেবদের রঙ্গালয়ে সাধারণত যারা অভিনয় করে, বিলাতের নট-সমাজে তারা নগণ্য বললেও চলে। কিন্তু এই নগণ্য অভিনেতারাও আমাদের অগ্রগণ্য অভিনেতাদের অধিকাংশেরই গুরুস্থানীয় হতে পারে। তারা বিলাতে নগণ্য বটে, কিন্তু নাটকীয় রস জমাবার জন্য তারাও যতটা সাধনা করে, বাঙালি অভিনেতারা স্বপ্নেও বোধ হয় তা করে না। অন্তত তাদের ও আমাদের অভিনয় দেখলে এই সন্দেহই মনে স্থান পায়। সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা, পাকা ও কাঁচা, প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের মধ্যেও তফাত ঠিক ততখানিই। এর প্রথম কারণ বিলাতি নটরা প্রথমে অভিনয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়, তারপর বহুদিন রঙ্গালয়ে উমেদারি করে অভিজ্ঞতা লাভের পরে তবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে অভিনেতারা যেন জন্ম-অভিনেতা, তাদের আর শিক্ষার দরকার নেই। দ্বিতীয় কারণ দেশি রঙ্গালয়ে, রিহাসালের পরমায়ু এত অল্প যে নিখুঁত অভিনয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি জানি, মাত্র দুই তিন দিনের 'রিহার্সালে'র পরেই অনেক নাটক প্রকাশ্যভাবে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, কারণ আমরা এখানে রঙ্গালয়ের

সমালোচনা করতে বসিনি। বাঙালি দর্শকরা রাত জেগে পয়সা নষ্ট করে কী লোক ঠকানো ব্যাপার দেখতে যায় সেইটেই বোঝাবার জন্য প্রসঙ্গসূত্রে দু-একটা ইঙ্গিত দিলুম মাত্র।

আমাদের রঙ্গালয় অনেক ফন্দিবাজ ছোকরার মা-বাপ ঠকানোর উপায় করে দেয়। ছোকরারা প্রথম প্রথম যখন উড়তে শেখে, তখন 'থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি' বলে গণিকালয়ে যায়। অনেকে কোন গতিকে থিয়েটারের 'প্রোগ্রাম' সংগ্রহ করে রাখে। বাপ-মা সন্দেহ প্রকাশ করলে নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণিত করবার জন্যে, তারা সেই 'প্রোগ্রাম' দাখিল করে। বেশি রাতে বাড়ি ফিরলেও একমাত্র দোহাই হয়— 'থিয়েটারে গিয়েছিলুম।' অধিকাংশ মা-বাপ এমনই সুবোধ যে, সেই দোহাই শুনেই তুষ্ট হয়। আসলে তাঁদের উচিত স্পষ্টভাষায় বলে দেওয়া যে, অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ছেলেরা মোটেই থিয়েটার দেখতে যেতে পাবে না। তাহলেই এরা জব্দ হবে। এই প্রথম অবস্থায় যুবকরা ভীরু থাকে। এসময়ে বাধা দিলেই অনেকের স্বভাব শুধরানোর সময় থাকে। পরে গণিকালয়ে যাওয়ায় অভ্যস্ত হলে তাদের বুক জ্বলে যায়। তখন তাদের আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

অনেকে মেয়েদের রক্ষী হয়ে থিয়েটার দেখতে আসে। মেয়েদের ওপরে পাঠিয়ে তারা থিয়েটার থেকে সরে পড়ে। তারপর বাইরে বাইরে ফুর্তিতে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, পালা শেষ হবার কিছু আগে তারা আবার থিয়েটারে ফিরে এসে মেয়েদের নিয়ে বাড়ি যায়। অথচ ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে কী কাণ্ডটাই যে হয়ে গেল, সেটা কারোর জানবার সাধ্য থাকে না কিন্তু সময়ে সময়ে এই অতি-চালাকেরাও হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। থিয়েটার ভেঙে গেল, সব মেয়ে একে একে নেমে গেল, কিন্তু এক বাড়ির মেয়েরা হয়তো চুপ করে বসে বসে তখনও অপেক্ষা করছেন। কারণ কর্তার দেখা নেই। ক্রমে রাত গভীরতর হল, মেয়েরাও ভয়ে কান্না শুরু করলেন। কর্তা হয়তো তখন কোথাও বসে নিশ্চিন্তপ্রাণে খেমটা নাচ উপভোগ করছেন। হয়তো ইয়ারদের অনুরোধ না এড়াতে পেরে দু-পাত্র টেনে সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর হঠাৎ ঘড়িতে রাত তিনটের ঘা শুনে তখন তাঁর সাড় হয়...

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। রাত্রির কলঙ্ক কাহিনি সর্বত্রই রেখে-ঢেকে বলতে গেলে আমাদের বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ... সকলে মনে রাখবেন, নীচের গল্পটির আগাগোড়া সত্য, কেবলমাত্র নায়ক-নায়িকার নাম দুটি কাল্পনিক।

অমলা বিধবা, রূপসি, যুবতী— একেলে উপন্যাসে আদর্শ নায়িকা হবার মতো কোনো গুণেই সে বঞ্চিত নয়।

যুবতী-বিধবার জীবন এদেশে 'ট্র্যাজেডি' বলেই শুনি। অমলার জীবনও তাই হতে পারত, পাশের বাড়ির যতীশচন্দ্র কিন্তু অমলাকে সে চরম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করলে, অবশ্য পরম গোপনে। কথাটা বোধ হয়, আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না।

অমলা যে ঘরে শোয়, তার পাশেই একটি খুব সরু গলি। তার পরেই যতীশের বাড়ি। দু-জনের রোজই দেখা হয়— দুই ঘরের দুই জানলা থেকে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। অমলার বাড়ির লোক বড়ো সজাগ, প্রেমের কদর বোঝে না।

কিন্তু বাড়ির লোকদের চেয়ে মদনঠাকুরের বুদ্ধি ও শক্তি ঢের বেশি। তাঁর মহিমায় দুর্ভেদ্য কাঁটা বনেও সকলের অগোচরে রাস্তা তৈরি হয়। অতএব—

একটি সুতোয় বেঁধে যতীশ একদিন অমলার ঘরে একখানা চিঠি ঝুলিয়ে দিলে— উপরের ছাদ থেকে। অমলা তা পড়লে। চিঠিতে কী ছিল, জানি না। অমলা কিন্তু চিঠি পড়ে, একটু হেসে, ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে— আচ্ছা।

অমলার বাড়ির লোকেরা প্রায়ই থিয়েটার দেখতে যায়— পাসে, কি টিকিট কিনে, বলতে পারি না। চিঠি পাবার পরদিনেই অমলা থিয়েটার দেখতে গেল— দেওরের সঙ্গে একলা। তার দেওরও থিয়েটারের একান্ত ভক্ত। তার সঙ্গে প্রায়ই সে একলা থিয়েটার দেখতে যায়— সব দিন বাড়ির আর সকলের যাওয়া হয়ে ওঠে না। ...অমলাকে উপরে পাঠিয়ে অমলার দেওর টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকল।

থিয়েটারের পালা শুরু হয়েছে, এমন সময়ে ঝি এসে অমলাকে বলল, 'অমুক রাস্তার অমুকবাবু তোমাকে ডাকচেন।' ঝি অমলার দেওরের নাম করলে।

অমলা নেমে এসে দেখে, রাস্তায় একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে— ভিতরে যতীশ। বিনা বাক্যব্যয়ে সে গাড়িতে এসে উঠল। ...ঘণ্টা দুই নানা রাস্তায় ঘুরে গাড়ি আবার থিয়েটারের দরজায় এসে দাঁড়াল। অমলা আবার থিয়েটারে উপরে গিয়ে উঠল।...

থিয়েটারে এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা যে ঘটে না, এমন কথা জোর করে কে বলতে পারে? আমরা আরও অনেক কানাঘুষো শুনেছি, কিন্তু তার সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করতে পারব না বলে, এখানে আর সেগুলির উল্লেখ করলুম না। এসব ব্যাপারের সঙ্গে থিয়েটারের ঝিয়েরা জড়িত থাকে কি না, বলতে পারি না। অন্তত তার কোনো প্রমাণ পাইনি।

এমন সব ব্যভিচারের জন্যে থিয়েটারকেও দায়ী করা সংগত নয়। থিয়েটার উঠিয়ে দিলেও এ পাপের অভিনয় বন্ধ হবে না, অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করবে মাত্র।...

রঙ্গালয় হচ্ছে ললিতকলার ত্রিবেণী-সঙ্গম, সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলার মধ্যে উপভোগ্য যা কিছু, রঙ্গালয়ে তারই একত্র সমাবেশ থাকবার কথা। চোখ, কান ও মন এখানে এসে মোহিত না হয়ে আহত হলে বুঝবে, রঙ্গালয় তার আদর্শ বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু বাংলা থিয়েটারে গেলে চোখ, কান আর মনের অবস্থা যে কীরকম হয়, এইবারে সেইটিই দেখা যাক।

প্রথমত বাংলা থিয়েটারের বাহিরের দৃশ্য। কলামন্দিরের বাহিরটা জমকালো হওয়া উচিত এবং আমাদের রঙ্গালয়ের মালিকরাও সে কথা বোঝেন। স্টার ও অধুনা লুপ্ত মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারগুলিতে তাই স্থাপত্য সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল। স্টার থিয়েটার সত্যসত্যই কলকাতার মধ্যে একটি দেখতে চমৎকার বাড়িও মালিকদের রসবোধের অভাবে এবং সওদাগরি বুদ্ধির প্রভাবে আমাদের দৃষ্টিকে যারপরনাই আহত করে। থিয়েটারের গায়ে বা সীমানার মধ্যে পান বিড়ির কুৎসিত দোকান বাঁধতে দেওয়া হয় কেন? সামান্য গোটাকয়েক টাকা ভাড়ার জন্যে, এত যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রস্তুত প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির শ্রী-সৌন্দর্যকে মলিন করা অন্যায়, অতি মাড়োয়ারির পক্ষে এ কাজ সাজে, কিন্তু ললিতকলায় আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বাঙালির পক্ষে এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

তারপর বাংলা থিয়েটারের ভিতর অংশ। এখানকার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব, ধুলো, ময়লা, জঞ্জাল, কালি-ঝুল, পানের পিক ও অসহ দুর্গন্ধ। আশেপাশে, নীচে-উপরে যেখানে চোখ পড়ে, সেইখানেই মালিকের অবহেলা ও একটা-না-একটা দাগ দেখা যায়ই যায়। দেয়ালে, ছাদে, রঙ্গমঞ্চের সামনে দেয়াল নকশা বা 'ফ্রেস্কো' থাকে এবং সেগুলো আঁকতেও খরচ

বড়ো কম হয় না— কিন্তু তার পটুয়ারা আসে বোধ হয় বড়োবাজার থেকে কারণ তার মধ্যে কলানিপুণতা ও একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গি বা 'স্টাইল' কোথাও নজরে পড়ে না। তাতে রঙের পরে রঙের ছোপ আছে, হরেকরকমের লতা-পাতা-ফুল আছে, ডানা-ছড়ানো পরি ও নগ্ন নারীর মূর্তি আছে এবং আরও ঢের হিজিবিজি আছে কিন্তু তাদের আদর্শ যে কী, তা বোঝবার কোনো উপায় নেই। কোথাও দেখি অজন্তার আদর্শ আবার কোথাও দেখি মিশরীয় বা মোগল বা বিলাতি বা শিল্পীর নিজস্ব 'আদর্শহীন' আদর্শ। হাটখোলার দর্শকরা হয়তো ভালো-মন্দ না বুঝে আর্টের এই নীরব প্রলাপের দিকে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা থিয়েটারের দর্শক তো খালি হাটখোলা থেকে আসে না। তাদের রুচিকে যে এখানে গলা টিপে বধ করা হয়! দুঃখের কথা বলব কী, শিক্ষিত ও রসজ্ঞদের দ্বারা চালিত সমস্ত থিয়েটারেই আমাদের কথার প্রমাণ আছে অজস্র। থিয়েটারে ঢুকলে শিক্ষিতদেরও রুচি এমনই বিগড়ে যায় নাকি?

বাংলা থিয়েটারের আর এক বিশেষত্ব— দর্শকদের গোলমাল। এত গোলমাল 'নতুন বাজারে'ও হয় না। অভিনয়ের সময়েও মাঝে মাঝে দর্শকরা এমনই চ্যাঁচাতে থাকে যে, অভিনয় বন্ধ করতে হয়। প্রত্যেক অঙ্কের পরে বিশ্রামের সময়ে সেই গোলযোগ আবার অশ্রান্তভাবে ত্রিগুণ বর্ধিত হয়ে কর্ণকে বধির করে দেয়। কর্ত,পক্ষরা থিয়েটারের পানওয়ালাদের ঢুকতে দেন যে কোন আক্কেলে, তা তাঁরাই জানেন। সে এক বিষম আপদ, তারা ক্রমাগত গায়ের উপর দিয়ে সকলের পা মাড়িয়ে ছুটোছুটি করবে, 'পান-সিগারেট' বলে হুংকার দেবে এবং রগ ঘেঁষে সোডার বোতল রেখে দুমদুম করে খুলবে। কী অস্বস্তি। অধিকাংশ থিয়েটারেই 'কনসার্ট'[৯.৪] নামে যে নিষ্ঠুর ব্যাপারটি আছে, তাকেও যান্ত্রিক কোলাহল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কানের কাছ ঢাকের বাদ্যিও বোধ হয় এর চেয়ে মিষ্টি। এসবের তুলনায় সাহেবি থিয়েটারগুলি শান্তির স্বর্গ বললেও চলে। সেখানকার দর্শকরাও ভদ্র এবং ঐকতান বাদনও একটি উপভোগ্য ব্যাপার।

তারপর আসনের বন্দোবস্ত। সাহেবি থিয়েটারের মতো এখানে মাঝখান দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ বা প্রত্যেক দুই সার আসনের মাঝখানে যথাসম্ভব ব্যবধান নেই। ফলে একজন লোক গেলে বা এলে এক সারের সমস্ত লোকের অবস্থা হয়ে ওঠে ভীষণ শোচনীয়। (এখন কিন্তু আসনের অবস্থা ঢের উন্নত হয়েছে)। তার ওপরে প্রত্যেক আসনই এতদূর নোংরা, কদর্য ও ছারপোকাভরা যে, হঠযোগের অভ্যাস না থাকলে নিশ্চিন্ত প্রাণে বসে বসে দীর্ঘকাল ধরে অভিনয়ের রস উপভোগ করা একান্ত অসম্ভব।

এই ভয়ানক জায়গায় গিয়ে আমরা রাত্রির পর রাত্রি ধরে যখন অভিনয় দেখতে কসুর করি না, তখন আমরা যে, প্রথম শ্রেণির নাট্যপ্রিয় জাতি, তাতে আর সন্দেহ কি? এমন দিন গেছে, যখন বেলা দুটো থেকে শুরু করে পরদিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত অভিনয় হয়েছে এবং তা দেখেও আমাদের পৈত্রিক প্রাণ দস্তুরমতো জীবিত আছে। বিলাতি আইনে আত্মহত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। কাজেই আইনানুসারে এখন নিয়ম হয়েছে যে, এমন সাংঘাতিক অভিনয় দেখে বাঙালিরা আর আত্মহত্যা করতে পারবে না। রাত একটার পরে অভিনয় এখন নিষিদ্ধ। কিন্তু সে আইন যে মানা হয়, তা বলতে পারি না। সরকার এজন্যে ইনস্পেকটর নিযুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের উৎসাহ এখনও প্রায় রাত আড়াইটে তিনটের আগে শান্ত হয় না। এর মানে কী? তারপর, বাঙালি দর্শকদেরও মতিগতি এখনও এইদিকেই ঝুঁকে আছে। তাই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও পালা পার্বণে বা বিশেষ অনুমতি নিয়ে যখনই সুবিধা পান, সারারাত্রব্যাপী অভিনয়ের আয়োজন করেন, এবং দর্শকরাও অমনি কাতারে কাতারে থিয়েটারের দিকে সবেগে ধাবিত হন।

অভিনয়কালে বাংলা থিয়েটারের সাধারণ দৃশ্য কম-বেশি পরিমাণে এইরকম—

দর্শকদের শ্রবণকে আশ্বস্ত করে কনসার্ট থামল। আজ একখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়। পালা শুরু হবার কথা সন্ধ্যা সাতটায়, কিন্তু বেজেছে আটটা। হয়তো আরও দেরি হত, কিন্তু পিট ও গ্যালারির দর্শকদের ঘন ঘন শিস ও হাততালিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কর্তৃপক্ষ শেষটা যবনিকা তুলতে বাধ্য হলেন। প্রথম দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, বিশ-পঁচিশটি সখী— বয়স দশ থেকে পঞ্চাশ বা তাতোধিক বৎসর পর্যন্ত নানা ভঙ্গিতে শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের মুখ রঙে ও পাউডারে অসম্ভবরূপে লাল ও সাদা, হাত-পাও তাই। কিন্তু প্রত্যেকের মাথার পেছনদিকে খোঁপার তলায় ঘাড়ের ওপর থেকে আসল রং দেখা যাচ্ছে— কারণ আরশিতে চোখে পড়ে না বলে সেখানটা আর 'পেন্ট' করা হয়নি। সখীদের মধ্যে অধিকাংশই হয় লিকলিকে রোগা, নয় থপথপে মোটা — একজনেরও মুখশ্রী ও গড়ন ভালো নয়, বেশির ভাগেরই চোখ বসা ও কুতকুতে, নাক খ্যাঁদা ও গাল ভিতরপানে ঢোকা। নেপথ্য থেকে বাঁশি, পিয়ানো, হারমোনিয়াম ও তবলা বাজল, সঙ্গে সঙ্গে এই 'লাইট' ও 'হেভিওয়েটে'র দল প্রাণপণে, না-দেশি না-বিলাতি নাচ ও গান শুরু করে দিলে, তাদের দাপাদাপি লাফালাফির চোটে 'স্টেজে'র উপর থেকে যুগান্তরের পুঞ্জীভূত ধূলারাশি জেগে উঠে, হু হু করে উড়ে প্রথম কয়েক সারের দর্শকদিগকে ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করলে, দর্শকরা হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে ও খক খক করে কেশে নাকের ছ্যাঁদায় খুব জোরে রুমাল বা কোঁচার খুঁট চেপে রইল। নেচে-গেয়ে বেদম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সঙ্গীরা চলে যেতে উদ্যত হল, পিছনের দর্শকরা অমনি তারস্বরে চেঁচিয়ে এবং হাততালি দিয়ে বলে উঠল— 'এঙ্কোর! এঙ্কোর!'[৯.৫] কিন্তু সামনে থেকে ধূলিধূসরিত দর্শকরা বলতে লাগল— 'নো মোর! নো মোর!' খানিকক্ষণ ধরে 'এঙ্কোরে' ও 'নো মোরে' এমনই প্রবল যুদ্ধ চলল— ততক্ষণে একটু হাঁপ ছেড়ে জিরিয়ে নিয়ে সখীরা আবার রঙ্গমঞ্চের ওপরে আবির্ভূত হয়ে নৃত্যগীতের পুনরাভিনয় করে গেল। এই নাচগানের সময় গ্যালারির ভিতর থেকে অশ্লীল বা হাস্যোদ্দীপক কতরকমের শব্দই যে আসতে লাগল তার সব আর বলবার নয়, গোটাকতক নমুনা দিচ্ছি মাত্র— 'ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা-ব্বা!' —'লে হালুয়া' —'মরে যাই, মরে যাই' —'ও হোঃ হোঃ!' — 'প্রাণ যে যায় রে বাপ!'— 'যাস নে ভাই, আমাদেরও নিয়ে যা!' প্রভৃতি।

রঙ্গালয়ের একেবারে প্রথম সারে কতগুলি লক্কা-পায়রার মানবীয় সংস্করণের মতো ছোকরা বসে আছে। তাদের অধিকাংশেরই মাথার নীচের দিকের চুল খুব সম্ভব ক্রপের ক্ষুর দিয়ে কামানো এবং সামনের দিকে ঝুঁটিওয়ালা টেড়ি— একেবারে দাগি চেহারার লক্ষণ। তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে ভুর ভুর করে 'মধু'র গন্ধ বেরুচ্ছে এবং কারো চুড়িদার পাঞ্জাবির পকেট থেকে 'ফ্লাস্কে'র মুখ উঁকি মারছে। তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দৃষ্টি এক-একটি বিশেষ নর্তকীর ভাবভঙ্গির দিকে আবদ্ধ, নর্তকীরাও প্রায় প্রত্যেকেই নাচতে নাচতে এক-একটি বিশেষ লক্কা-পায়রার দিকে বারংবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুচকে মুচকে হাসছে। —বুঝতে দেরি লাগে না যে, এরা পরস্পরের পরিচিত। থিয়েটার ভাঙলেই স্থানান্তরে গিয়ে এদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

উপরে 'বক্স', সেখানকার দৃশ্যও বিচিত্র। কোনো বক্সে একদল বাবু বসে আছেন। তাঁদের কেউ কেউ 'গার্ড'-কে ডেকে, তার হাতে দুটো-একটা টাকা গুঁজে দিয়ে চুপিচুপি খোঁজ নিচ্ছেন, অমুক অমুক সখীর ঠিকানা কী, তারা বাঁধা আছে কি না প্রভৃতি। একটি

চশমা-পরা ছাগলদাড়ি বাবু মোটেই থিয়েটার দেখছেন না, তিনি একদৃষ্টিতে তিনতলার মেয়েদের আসনের দিকে তাকিয়ে সমানে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

পরের 'বক্সে' একদল মাড়োয়ারি কলকাতার একটি সেরা ও বিখ্যাত 'সৌন্দর্য'কে নিয়ে বসে, অনেক শখের বাঙালিবাবুর হিংসা ও বিরাগ ভরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কেউ কেউ উচ্চস্বরে তাদের শুনিয়ে দিতেও ত্রুটি করছে না যে, 'এই ব্যাটা ছাতুখোর মেড়োদের উৎপাতে সেরা সেরা বিবি লোপাট হয়ে গেল দেখছি!' সে গালাগালি শুনেও মাড়োয়ারিরা কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করছে না, বরং গর্বপূর্ণ অবহেলার হাসি হাসছে।

তারপরের বিছানাওয়ালা 'বক্সে' দুই বাবু, দুই বিবি। এক বাবু অত্যধিক সুধাপান করে বিবির কোলে মাথা রেখে কাত হয়েছেন, বিবি তাঁর মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় বাবু এক গেলাস মদ নিয়ে দ্বিতীয় বিবিকে কাকুতিমিনতি করছেন।

বিবি হাত দিয়ে বাবুর গেলাস-ধরা হাত সরিয়ে বলছেন, 'মর মুখপোড়া! এই বাজারে বসে সকলের সামনে মদ খাব কী রে?'

বাবু বলছেন, 'খাবিনি? তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

ঠিক তার পরের 'বক্সে'ই চারজন ভদ্রমহিলা পাশেই মাতাল দেখে আর এইসব কথা শুনে ভয়ে এক-গা ঘেমে, একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছেন।

ইতিমধ্যে নূরজাহান ও শের খাঁ প্রেমালাপ করতে করতে রঙ্গমঞ্চের উপরে এসে আবির্ভূত হলেন। নূরজাহানের চেহারা দেখেই থিয়েটারশুদ্ধ লোক প্রকাশ্যে তারস্বরে একটা নিরাশা-ভরা অব্যক্ত ধ্বনি করে উঠল। সত্য, নিরাশ হবার কথাই বটে। এই কি সেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়া সুন্দরী নূরজাহানের মূর্তি? গড়ের মাঠের চেয়ে সামান্য ছোটো কপাল, টিয়াপাখির মতো নাক, দুই গণ্ডের মাংস নিম্নদিকে লম্বিত, আকর্ণবিশ্রান্ত বদন-বিবর, ভাঁজ-করা চিবুক, দোদুল্যমান ভুঁড়ি, নরহস্তিনীর মতো দেহ—কী ভয়ানক, নূরজাহানের 'ক্যারিকেচার'ও যে এর চেয়ে দেখতে সুন্দর। রঙ্গালয়ের কর্ত,পক্ষের অপূর্ব সৌন্দর্য-জ্ঞান ও আশ্চর্য সাহসকে ধন্যবাদ। গ্যালারির একজন দর্শক তো আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এ নূরজাহানের ঠিকানা কী বাবা। মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের শ্যাওড়াতলা?'

চিফ গার্ড 'এইও। চোপ' বলে একলাফে দাঁড়িয়ে ওঠে, গ্যালারির চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করে বারংবার বলতে লাগল, 'কে বললে এ কথা? কে বললে এ কথা?'

কিন্তু আর সমস্ত দর্শকের হাস্য ও ব্যঙ্গ ধ্বনির মধ্যে চিফ গার্ডের কণ্ঠস্বর অসহায়ভাবে কোথায় তলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একজন দর্শক একমুখ পান নিয়ে হ্যাঁচ্চো করে প্রচণ্ড এক হাঁচি হাঁচলে— সঙ্গেসঙ্গে তার সামনের দর্শকের মাথা, ঘাড়, চাদর ও জামা পান-সুপারিতে ও পানের পিকে বিচিত্র হয়ে গেল। নিজের অবস্থার দিকে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত নেত্রে নীরব তাকিয়ে থেকে, দ্বিতীয় দর্শক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, 'এটা কী হল শুনি?'

১ম দর্শক। (গম্ভীরভাবে মুখ মুছতে মুছতে) হেঁচে ফেলেচি, কী আর হবে?

২য় দর্শক। (সক্রোধে) কী হবে, দেখবে রাস্কেল?

১ম দর্শক। (দাঁড়িয়ে) কী, মুখ সামলে কথা কও বলচি।

২য় দর্শক। তুমি হাঁচি সামলাতে পারলে না, আর আমি মুখ সামলে কথা কইব, স্টুপিড?

১ম দর্শক। (ঘুসি পাকিয়ে) ফের গালাগাল?

২য় দর্শক। (১ম দর্শকের মুখে হঠাৎ এক ঘুসি মেরে) ড্যাম, শুয়োর, গাধা।

গার্ডেরা ছুটে এসে দু-জনকেই ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল— সেখান থেকে তাদের অশ্রান্ত হুংকার শোনা যেতে লাগল।

এতক্ষণ পরে অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পেয়ে শের খাঁয়ের সঙ্গে নূরজাহান প্রেমালাপ শুরু করলেন। কিন্তু দু-চারটে কথা বলতে না বলতেই উপরের মেয়েদের আসন থেকে কার কোলের শিশু বিশ্রি তীক্ষ্ন স্বরে ট্যাঁ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

নীচে থেকে পুরুষ-দর্শকরা সচিৎকারে বলতে লাগল, 'ওগো, ছেলে থামাও, ছেলে থামাও।'

নূরজাহান ও শের খাঁ হতাশভাবে উপরদিকে চেয়ে, বোবা কাঠের পুতুলের মতন রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিশুর কান্না ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠতে লাগল। নীচে থেকেই শোনা গেল, আর একটি মেয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, 'এ তো ভালো জ্বালা রে বাপু। ছেলেকে থামাও না গো।'

ছেলের মা বললে, 'আমি কি ছেলেকে চিমটি কেটে কাঁদাচ্ছি? থামচে না, কী করব বল বাছা।'

'কী আর করবে, বাইরে গিয়ে থামিয়ে এসো।'

'ইস, বাইরে বেরিয়ে যাব। কেন, আমি কি টাকা দিয়ে থিয়েটারে আসিনি?'

তারপরেই মেয়েলি ঝগড়ার পালা আরম্ভ। সঙ্গেসঙ্গে ওদিকেও আবার এক নতুন ব্যাপার। একটা 'বক্সে'-র দর্শকদের সর্বাঙ্গে মেয়েদের আসনের তলা থেকে খানিকটা সন্দেহকর দুর্গন্ধ জল ছড় ছড় করে পড়তে লাগল— নিশ্চয় আর এক শিশুর কীর্তি। সেখানেও আর এক নতুন গোলমালের সৃষ্টি। ...অতঃপর থিয়েটারের অভিনয় হতে থাকল দর্শকদের আসনের দিকে এবং দর্শকে পরিণত হলেন শের খাঁ ও নূরজাহান।'...

আসুন, ইতিমধ্যে আমরা একবার রঙ্গমঞ্চের অন্দরে উঁকি মেরে আসি। বাইরের অধিকাংশ দর্শকের কাছেই রঙ্গমঞ্চের অন্দর হচ্ছে রহস্যময় স্বর্গপুরীর মতো— যেখানে দলে দলে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা বিচরণ করছেন। এ স্বর্গের মধ্যে একবার প্রবেশের

অধিকার পেলে অনেকেই বোধ হয় আনন্দের আবেগে পাগল হয়ে যেতে পারে। আসুন, আজ আমি আপনাদের সেই দুর্লভ সৌভাগ্য দান করব।

কিন্তু ভিতরে ঢুকলে অনেকেরই সুখস্বপ্ন বাস্তবের কঠোর আঘাতে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এ কথা আগে থাকতেই বলে রাখা ভালো।

অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চের ভিতরে পা দিলেই প্রথমে দৃষ্টিকে আহত করবে, একটা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল গুদাম ঘরের মতো নীরস, নিরানন্দ দৃশ্য। এখানে পাশাপাশি অগণ্য দৃশ্যহীন দৃশ্যপট সাজানো রয়েছে, ওখানে রাশি রাশি দড়াদড়ি ঝুলছে, কোথাও গাদা গাদা ন্যাকড়া, পোশাক স্তুপীকৃত হয়ে আছে, কোথাও হরেকরকম টুকিটাকি জিনিসের উপর দিয়ে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। চারদিকেই একান্ত সংকীর্ণ অলিগলি, তারই মধ্যে দলে দলে লোক এ-ওকে ধাক্কা মেরে আসছে আর যাচ্ছে, মুক্ত আলো আর বাতাসের সেখানে প্রবেশ নিষেধ— দু-মিনিট দাঁড়ালেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, তার উপরে সিগারেট, তামাক, রং, শিরীষের আঠা, ঘর্মাক্ত পোশাক ও স্যাঁৎ-স্যাঁতানির একটা মিশ্র দুর্গন্ধে গা যেন বমি বমি করতে থাকে। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে মোটেই স্বর্গের আভাস পাওয়া যায় না।

আশপাশে ছোটো ছোটো কুঠুরি, সেগুলি 'স্বর্গে'র অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণির বাসিন্দাদের জন্য। আর একদিকে দুটো বড়ো ঘর। তাদের মধ্যে আলনা ও দড়িতে নানারঙের অগুনতি পোশাক পরিচ্ছদ ঝুলছে। প্রত্যেক ঘরের দেয়ালের গায়ে এক-একখানা বড়ো আয়না। ঘরের ভিতর বহু ব্যবহারে বার্নিশহীন কতকগুলো টেবিল। তাদের উপরে রং, রঙের পাত্র, আরশি, চিরুনি, বুরুশ, পাউডার, রুজ, ভুরু টানবার কালির 'স্টিক', পরচুলো, কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ, আধপোড়া সিগারেট, খাবারের টুকরো, জলের গেলাস ও কানা-ভাঙা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি হরেকরকম জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে, এদিকে-ওদিকে খানকয়েক টুল বা পিছন-ভাঙা চেয়ার, ঘরের মেঝেতে দেশি-বিলাতি নানান রকম জুতো, ঘরের কোণে অনেকগুলো কৃত্রিম বর্শা, লাঠি, বন্দুক বা তরোয়াল— কোনোটাই চকচকে নয়, দেয়ালে টাঙানো ঢাল ও পিতলের ঘুঙুর এমনই কত আর নাম করব। এ-দুটো ঘর হচ্ছে সাধারণ সাজঘর— একটা পুরুষদের ও একটা স্ত্রীলোকদের জন্য।

রঙ্গমঞ্চের একপাশে খানিকটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গা, সেখানেও কতগুলো ভাঙা চেয়ার ও বেঞ্চি সাজানো রয়েছে। তার উপরে বসে আছে কয়েক জন পুরুষ ও নারী, অধিকাংশেরই মুখে রং মাখা ও পরনে নানা ধরনের সাজসজ্জা। মাঝখানে একখানা ইজিচেয়ারে থিয়েটারের ম্যানেজার অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে গম্ভীর মুখে তামাক টানছেন। একপাশে মেঝেতে বসে একজন অভিনেতা নগ্নদেহে কেবলমাত্র ইজের পরে, থিয়েটারের বাঁধা নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছে। এটি হচ্ছে ম্যানেজারের সভা। এ সভায় সর্বদাই চক্রান্ত চলছে, একে অপরের নামে লাগাচ্ছে এবং সভাপতির নামে চাটুবাদ হচ্ছে। থিয়েটারের মতো নীচতা, হীনতা ও ষড়যন্ত্রের স্থান বাংলাদেশে খুব কমই আছে। এবং এখানকার জীবগুলি যে কত সহজে ও অকারণে সত্যের অপলাপ করতে পারে তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।...

রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে নূরজাহান বিরক্ত মুখে ফিরে এসে বললেন, 'আজকের অডিয়েন্স বড়ো খারাপ। খালি গোলমাল করচে, আমাকে "ক্ল্যাপ" দিলে না।'

বেঞ্চির উপরে মিস কিরণ বসে একহাতে ঠোঙা নিয়ে, ডান হাতে করে একখানা হিঙের কচুরি খাচ্ছিল। সে 'নূরজাহান'-এর চেয়ে সুন্দরী এবং তার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে,

নূরজাহানের ভূমিকাটি নিয়ে সে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু ম্যানেজারের পক্ষপাতিতায় তার সে আশায় ছাই পড়েছে। 'নূরজাহান' যে আজ রঙ্গমঞ্চে গিয়ে সুখ্যাতি পায়নি, মিস কিরণ এতে ভারি খুশি হয়েছে। এখন নূরজাহানের নিরাশার কথা শুনে ও বিরক্তির ভাব দেখে সে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

নট-নটীর উপরে ম্যানেজারের প্রভুত্ব যে কী প্রচণ্ড, বাইরের লোক সে খবর রাখে না। ম্যানেজারের ইচ্ছা এখানে নেপোলিয়নের হুকুমের মতো অবাধ। তিনি খুশি থাকলে অযোগ্যও 'পার্ট' পাবে, তিনি চটলে যোগ্যের যোগ্যতাও কোনো কাজে লাগবে না। ম্যানেজাররা প্রায়ই তাঁদের প্রভুত্বের অসদব্যবহার করে থাকেন। আমি জনৈক ভূতপূর্ব ম্যানেজারকে জানি, অন্তত একবারও যাঁর শয্যাসঙ্গিনী না হলে কোনো অভিনেত্রীর 'পার্ট' পাবার আশা থাকত না। এরকম আরও কত লোক থিয়েটারে আছে, কে তা জানে?

'নূরজাহান'ও হয়তো এমনি কোনো গুপ্ত উপায়ে জনসাধারণের সামনে আবির্ভূত হবার সুযোগ পেয়েছে। তাই মিস কিরণের হাসি আর নূরজাহানের সহ্য হল না, রেগে গস গস করতে করতে সে সাজঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং একখানা চেয়ারের উপর গিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললে।

ওদিকে এককোণে ওই যে স্ত্রীলোকটি আরশির সামনে বসে, মুখে রং মাখবার উপক্রম করছে, ওকে চেনেন কি? ওর কোকিলের মতো রং, টাকপড়া মাথা, বসন্তের ছররা-মারা মুখ ও বাঁখারির মতো হাত-পা দেখে শিউরে উঠবেন না— কারণ ও হচ্ছে সেই 'কোকিলকণ্ঠী পরমাসুন্দরী' গায়িকা বিনোদিনী[৯.৬], শহুরে বাবুরা ও মাড়োয়ারির দল যার বাড়ির ঠিকানা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে আছে। একটু সবুর করুন, তাহলেই দেখবেন সাজঘরের অপূর্ব মহিমায় ওর চেহারা তিলোত্তমার মতোই শোভনীয় হয়ে উঠেছে।

থিয়েটারি সৌন্দর্যমাত্রই এই জাতীয়। নিখুঁত রূপ এখানে তো নেই-ই, এমনকী চলনসই সুন্দরী পর্যন্ত এখানে থাকে না— থাকতে পারে না। কারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে কালেভদ্রে একজন রূপসির আবির্ভাব ঘটলেই দর্শকদের মধ্যে থেকে নিশ্চিন্তরূপে তার রূপের পূজারি কাপ্তেন একাধিক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে এবং দু-দিন পরেই সে রূপসির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। খোঁজ নিলে জানা যাবে, সে এখন অমুক বাবুর 'বাঁধা', আর থিয়েটার করবে না। কাজেই এই রঙ্গ-বিশ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘর-বাড়ি-শহর, সাজ-পোশাক ও আসবাব-পত্তরের মতো মানুষগুলির সৌন্দর্য ও একান্ত কৃত্রিম এবং রঙ্গমঞ্চ ছাড়া ত্রিভুবনের আর কোথাও তাদের সার্থকতা নেই। অতএব যাঁরা সন্দেহ করেন যে এই তথাকথিত স্বর্গের মধ্যে যথার্থই উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি বাসা বেঁধে আছেন, আমি শপথ করে বলতে পারি, তাঁদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক।

একদল সখী নাচতে নাচতে 'উইংসে'র ভিতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রকাশ্য অংশের দিকে যাচ্ছে। 'উইংসে'র ভিতরেই একটি লোক বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে এবং প্রত্যেক সখী যেই তার কাছ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সে অমনি মৃদুস্বরে তার সঙ্গে রসিকতা করে নিচ্ছে।

হাস্যরসাবতার মোনাবাবু আর একজোড়া 'উইংসে'র মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি হৃষ্টপুষ্ট রূপসির সঙ্গে চুপিচুপি কথা কইছেন, তার নাম 'বোঁচাখুকি'। এই বোঁচাখুকির উপরে মোনাবাবুর সুনজর অনেক দিন থেকেই আছে, কিন্তু বোঁচাখুকি কিছুতেই তাকে আমল দিতে রাজি নয়। সৌভাগ্যক্রমে আজকের নাটকে মোনাবাবু পেয়েছেন স্বামীর ও বোঁচাখুকি পেয়েছে স্ত্রী-র ভূমিকা। মোনাবাবু তাই আজ বোঁচাখুকিকে নির্জনে টেনে নিয়ে বোঝাতে

প্রবৃত্ত হয়েছেন যে, তোমাতে আমাতে আজ এই যে সম্পর্ক হল, এবার থেকে এই সম্পর্কই যেন বরাবর বজায় থাকে।

বোঁচাখুকি চোখ মটকে বললে, 'আ মরে যাই। আমার কাছে কেন, বাজারে কি দড়ি-কলসি জোটে না?...'

আর এক প্রান্তে একদল যুবক— অধিকাংশেরই চেহারা অগাখেকো বগাখেকো— বসে দাঁড়িয়ে কয়েক জন সমান চেহারার পাঁচ দশ পনেরো টাকা মাইনের সখীর সঙ্গে গোপনে হাসি-মশকরা করছে, ম্যানেজারের নজর তাদের উপরে আছে কি না। এরা হচ্ছে 'অ্যাপ্রেন্টিস'-এর দল।

এরা মাইনে পায় না, অনেকের পাবার আশাও নেই। রঙ্গমঞ্চের নির্বাক জনতার দৃশ্যে কিংবা রণক্ষেত্রের কাটা-সৈনিকের ভূমিকায় এরা আবির্ভূত হয়— পেটে এদের বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর নির্গত হওয়া অসম্ভব। মাইনে না পেলেও, সখীদের সঙ্গে লুকিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবার নিষিদ্ধ অধিকার পেয়েই এই জীবগুলি তুষ্ট হয়ে থাকে— যদিও এদের অবস্থা এখানে অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ এখানকার টিকটিকিগুলো পর্যন্ত এদের উপরে চোখ রাঙিয়ে তম্বি করতে ছাড়ে না।

রঙ্গমঞ্চের ভিতরের 'ফোটো' আমরা দিলুম এ দেখে কি আপনাদের স্বর্গ বলে ভ্রম হচ্ছে? এখানে বলবার কথা আরও অনেক আছে, কিন্তু আপাতত এই নমুনা দেখেই সকলে তুষ্ট থাকুন।

বাইরে, রঙ্গালয়ের দর্শকরা তখন দীর্ঘকাল চিৎকার ও গোলমাল করে শ্রান্ত ও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। রঙ্গমঞ্চের উপরে নূরজাহান, জাহাঙ্গীর ও সভাসদরা বারংবার আনাগোনা করছেন, কিন্তু কেউ আর কিছুমাত্র আপত্তি বা উৎসাহ প্রকাশ করছে না। কোনো কোনো দর্শক চেয়ারে বসে আছে বটে, কিন্তু তার নাসিকা সংগীত যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এক-একজন ঘুমন্ত দর্শকের মাথা তার পার্শ্ববর্তী দর্শকের কাঁধের উপর লুটিয়ে আছে। পাশের দর্শক বিরক্ত হয়ে যত বেশি সরে যাচ্ছে, ঘুমন্ত লোকটির মাথাও তত বেশি এগিয়ে লুটিয়ে পড়ছে।... কেবলমাত্র 'পিট' ও 'গ্যালারি'র দর্শকরা তখনও একেবারে মুশড়ে পড়েনি। সখীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তারা চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠছে। নট-নটীরা যখন জমাতে পারলে না, তখন দর্শকরাই শিস বা হাততালির সঙ্গে টিপ্পনী কেটে আসর গরম না রাখলে আর উপায় কী? সাধারণত বাংলা থিয়েটারি বিজ্ঞাপনে যে গ্র্যান্ড 'সাকসেসে'র কথা পড়া যায়, সেই 'সাকসেস' আসে নট-নটীর পক্ষ থেকে নয়, ওই 'গ্যালারি'র অন্ধকূপের গর্ভ থেকেই। থিয়েটারের লক্ষ্মী বাস করেন ওই গ্যালারির মধ্যেই— যেখানে 'ফ্রি পাসের' উপদ্রব নেই।

টীকা

কৌশিক মজুমদার
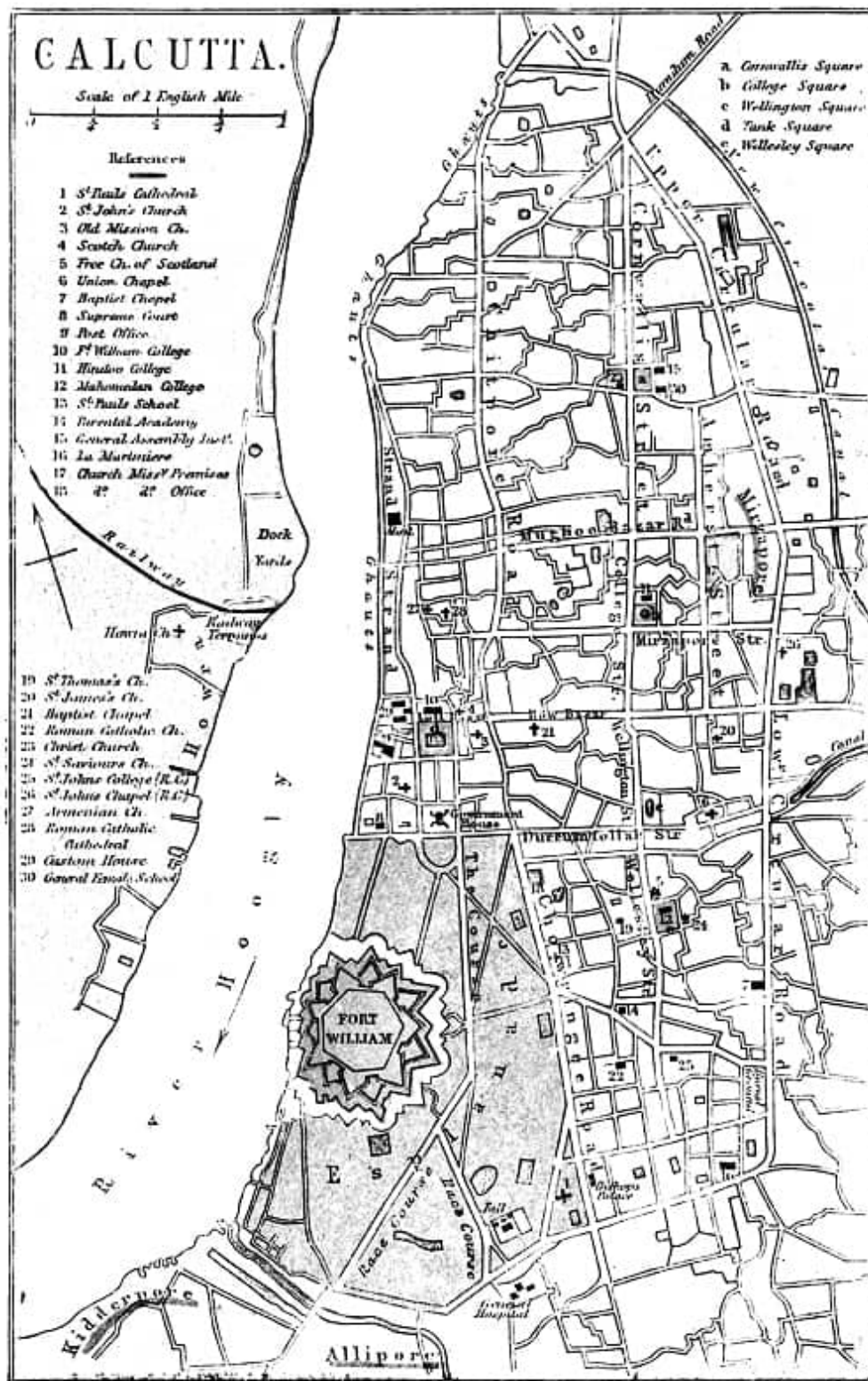
উনবিংশ শতকের কলকাতার মানচিত্র

প্রস্তাবনা

১. হুতুম প্যাঁচার নকশায়— হুতুম প্যাঁচার নকশা নামটি ভুল। সঠিক নাম হুতোম প্যাঁচার নকশা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৩ শকে (আনু. ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে)। নাম ছিল 'হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নকশা'। ষোলো পৃষ্ঠার এই বইতে একটিই নকশা ছিল। নাম 'চড়ক'। দাম 'পয়শায় দুখানা'। তারপর আরও নকশা যোগ করে ১৮৬২ সালে প্রকাশ পায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা/ প্রথম ভাগ', ১৮৬৩-তে দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৮৬৪-তে দুই ভাগ একত্রে। ১৮৬৮-তে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, সেটিই ছিল লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। পরে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে সজনীকান্ত- ব্রজেন্দ্রনাথ এই বইটির পুনঃপ্রকাশ করেন। তাঁদের সম্পাদনাতেই ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। আশ্বিন, ১৩৯৮ সনে অরুণ নাগের টীকা ও সম্পাদনায় সুবর্ণরেখা থেকে 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশ পায়।

২. নকশা— 'নকশা' শব্দটি গ্রন্থনামে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথম ব্যবহার করলেও এটি তাঁর মৌলিক অবদান নয়। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বঙ্গসাহিত্যে নকশা (পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন) প্রবন্ধে নকশার চরিত্রের একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। যথেষ্ট হাস্যরস, সামাজিক অনাচার বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রুপ, সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান, ব্যঙ্গ জোরদার করতে অতিরঞ্জন, লঘু ভাষা, ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা আর নাতিদীর্ঘ আকৃতি- এই হল নকশার বৈশিষ্ট্য। তবে গবেষক নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে এর সঙ্গে যুগলক্ষণকেও যোগ করা উচিত (উনিশ শতকের বাংলা নকশা, কলিকাতা, ১৯৮৪)। এখনও যা জানা গেছে, তাতে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে সমাচার দর্পণে (২৪.২ ও ৯.৬) প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' বাংলা নকশার আদি উদাহরণ। হুতোমের আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ) ও নববাবু বিলাস (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) নামে দুটি নকশা লেখেন, যদিও হুতোমের ভাব বা ভাষার সঙ্গে এদের খুব বেশি মিল নেই। বরং ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের প্রভাব

হুতোমে বেশ কিছুটা দেখা যায়। ১৮৬২ সালে হুতোমের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের পর বাংলায় নকশা লেখার জোয়ার আসে। বর্তমান লেখাটিও ওই ঘরানার।

৩. আদিরসকেও— কোনও কাব্যপাঠ শ্রবণ বা পাঠ করে অথবা নাটক অভিনয় দেখে মনে যে স্থিরতর অপূর্ব ভাবের উদয় হয়, সেই স্থায়ী ভাবকে রস বলে। এই রসের প্রবক্তা ভরত। আদিরস বলে কিছু নেই প্রকৃতপক্ষে। নাম শৃঙ্গার রস। কিন্তু ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার রসকে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছিলেন, তাই এটি আদিরস বলেও অভিহিত হয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, শাস্ত্রমতে কাব্যরস হল অমৃত। কাব্যরস নয় প্রকার। যথা: (১) আদি, (২) বীর, (৩) করুণ, (৪) অদ্ভুত, (৫) হাস্য, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) রৌদ্র এবং (৯) শান্ত। নায়ক-নায়িকার অনুরাগবিষয়ক রসকে আদিরস বলে।

৪. অদূর ভবিষ্যতে আবার দেখা দেব— লেখক যদিও একটি সিক্যুয়েলের আভাস দিয়েছেন, কিন্তু সেটি কখনোই প্রকাশ পায়নি।

৫. মেঘনাদ গুপ্ত— এই মেঘনাদ গুপ্ত কে, এই নিয়ে একসময় সামান্য বিতর্ক তৈরি হলেও এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলা যায় এটি স্বয়ং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ছদ্মনাম।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম: ১৮৮৮ সালে। ছোটোদের জন্য রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্প লেখার জন্য বিখ্যাত। তাঁর কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জন্মস্থান কলকাতা। পিতার নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। তিনি মাত্র চোদ্দো বছর বয়েসে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বসুধা পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' প্রকাশিত হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভারতী পত্রিকা নতুনরূপে প্রকাশিত হলে হেমেন্দ্রকুমার এর লেখকগোষ্ঠীতে যোগদান করেন। সাপ্তাহিক নাচঘর (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। এ ছাড়া রংমশাল পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ছোটোদের জন্য তিনি আশিটিরও বেশি বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে কবিতা, নাটক, হাসি ও ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনি, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সব কিছুই ছিল। তাঁর সৃষ্ট দুঃসাহসী জুটি বিমল-কুমার, জয়ন্ত (গোয়েন্দা) ও সহকারী মানিক, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবু, ডিটেকটিভ হেমন্ত, বাংলা কিশোর সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র। হেমেন্দ্রকুমার রায় বড়োদের জন্যও বেশ কিছু বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: জলের আলপনা, বেনোজল, পদ্মকাঁটা, ঝড়ের যাত্রী, যাঁদের দেখেছি, বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, ওমর খৈয়ামের রুবায়ত প্রভৃতি। তাঁর 'সিঁদুর চুপড়ি' গল্পটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে একটি সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। বিমল ও কুমারের অভিযানকাহিনি অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'যকের ধন' দুইবার চলচ্চিত্রায়িত হয়। তিনি সফল গীতিকারও ছিলেন। সেই সময়ের বাংলা থিয়েটার এবং গ্রামাফোনে গাওয়া গানের প্রচলিত রীতি এবং রুচির মোড় ফিরিয়েছিলেন তিনি। তাঁর রচিত অনেক গান সেই সময়ে জনপ্রিয় ছিল। 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানটি এর মধ্যে অন্যতম। তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'সীতা' নাটকের নৃত্য পরিচালক ছিলেন। তিনি ভালো ছবিও আঁকতে পারতেন। বাংলায় শিল্প সমালোচনার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

এই বইটি হেমেন্দ্রকুমার নিজের নামে লেখেননি। বইটির ২০১৫ সালের উর্বী সংস্করণে গবেষক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "স্বর্গত লেখক শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিশু মুখোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে হেমেন্দ্রকুমার রায় মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে রাতের কলকাতা রচনা করেন। হেমেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গত শ্রী প্রদ্যোৎকুমার রায় আমাকে বলেছিলেন তিনি তাঁর পিতার বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন যে হেমেন্দ্রকুমার লেখার খাতিরে Firsthand Information-এর খোঁজে বিশ শতকের প্রথমে একটি যষ্টি হাতে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও রাতের কলকাতার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন।" এর আগেও ১৯৮৮ সালের ১৫ অক্টোবর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শতদল গোস্বামী লেখেন, "হেমেন্দ্রকুমার রায় মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে রাতের কলকাতা নামে একটি বই লিখেছিলেন। কলকাতা শহরের নৈশ জীবনের বাস্তবচিত্র আঁকা হয়েছে। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কারণ অভিভাবকরা যাতে না জানতে পারেন বইটি তাঁরই লেখা। মেঘনাদ গুপ্ত অবশ্য ছদ্মনামের ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম হয়তো অনেকেই জানেন না, প্রসাদ রায়।"

এখানে বইটির প্রথম সংস্করণে চোখ বোলালে আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। ১৯২৩ সালে বইটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন হেমেন্দ্রকুমারের বয়স পঁয়ত্রিশ। তরুণ বয়সের হেমেন্দ্রকুমারের পক্ষে অভিভাবকের ভয় স্বাভাবিক। বইটির আখ্যাপত্রে লেখা, "হেমন্তকুমার রায় কর্ত্তৃক ৭৫ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।" এই হেমন্তকুমারের খোঁজ অনেক করেও আমি পাইনি। ফলে এটা একটা অনুসিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, বইটি নিজের খরচেই ছাপিয়েছিলেন হেমেন্দ্র। হেমন্ত তাঁর আরও একটি ছদ্মনাম মাত্র।

বইটির ভাষাশৈলী আর ধরনের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের ভাষার বিস্তর মিলের কথা গবেষক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ গুপ্ত, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়রা জানিয়েছেন। সে মিল বর্তমান সম্পাদকের চোখেও এসেছে। তাই 'with a pinch of salt' এটা মেনে নেওয়াই যায় যে, হেমেন্দ্রকুমার রায়ই আদতে মেঘনাদ গুপ্ত।

প্রথম দৃশ্য : শহরের সাধারণ ছবি

১.১ দ্বিতীয় শহর— প্রথম শহর অবশ্যই লন্ডন। মাত্র ১৩০০ টাকার বিনিময়ে সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ির বিদ্যাধর রায়ের কাছ থেকে তিনটি গ্রাম- সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ইজারা নেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সাহেবরা এই শহরে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে একে লন্ডনের আদলে গড়ে তোলেন। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতা কতগুলো বিচ্ছিন্ন গ্রাম থেকে শহরের রূপ নেওয়া শুরু করে। সাহেবরা নিজেদের বসবাসের জন্য হোয়াইট টাউন তৈরি করেন গঙ্গার ধার বরাবর। নেটিভরা থাকতেন সাবেক ব্ল্যাক টাউনে।

১.২ পালকি— একধরনের বিলাসবহুল যান, যাতে আরোহণ করে ধনিক গোষ্ঠী কিংবা সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতেন। চাকাবিহীন হওয়ায় মনুষ্যশক্তি প্রয়োগে চালিত, অর্থাৎ কয়েকজন ব্যক্তি পালকিকে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘাড়ে বহন করে স্থানান্তরে অগ্রসর হয়। তাদের পালকি বেহারা নামে অভিহিত করা হয়। প্রথমদিকে

দেব-দেবীর আরোহণ কিংবা দেবমূর্তি বহনের উদ্দেশ্যে এরূপ যানবাহন তৈরি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। অনেক মন্দিরেই পালকি সহযোগে দেবতাদের বহনের দৃশ্যমালা ভাস্কর্য বা চিত্র আকারে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে পরবর্তীকালে মুখ্যত সম্ভ্রান্ত এবং ইউরোপীয় ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলারা রেলগাড়ি প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত পালকিতে চলাফেরা করতেন।

কলকাতায় পালকি বেহারারা ছিল উড়িয়া এবং কাহার। “ধাক্কুড়াকুড় হেঁইয়া নাবড়” ছন্দের বুলি তুলে চারজন বাহক পালকি কাঁধে নিয়ে চলত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “কলিকাতার চলাফেরা” গ্রন্থে লিখছেন, “উড়িয়াদের মধ্যেও গৌড় বাউড়ি প্রভৃতি দুই-চার জাতি আছে, যাহারা একমাত্র পাল্কি বহনের অধিকারী।” এই পালকিবাহকরা যেখানে বাসা করে থাকত, তার কাছেই কর্পোরেশান ‘Palanquin Stand’ বলে একটা খোঁটা মেরে দিত। সাধারণ মানুষ এদের পাল্কির আড্ডা বা আড়া বলতেন। পালকির দরকার হলে সেই আড়াতে গিয়ে “বেহারা” বা “দাসপো” বললেই তাঁরা চোখ রগড়াতে রগড়াতে সাড়া দিত। ভাড়া অধিকাংশ সময় বেহারাদের মর্জিমাফিক হত। ১৮২৭ সালে সরকার পালকি বেহারাদের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করেন এবং ভাড়া বেঁধে দেন ‘সমস্ত দিন ফি চারি আনা। ইঙ্গরাজি ১৪ ঘড়িতে একদিন গণা যাইবেক।” বেহারারা এর বিরুদ্ধে সদলবলে ধর্মঘট করে। কলকাতার বুকে সেটাই প্রথম ধর্মঘট। বিংশ শতকের চারের দশক থেকে পালকির সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বালথ্যাজার সলভিন্স-এর আঁকা ছবিতে সেকালের কলকাতায় বেশ কয়েক ধরনের পালকি চোখে পড়ে- Long Palanquin, Chaise Palanquin, Boutcha, Mejanaab, D' Bouly, Mohhafa, D' Jehalledar আর Chanpal Palanquin। ঠিকা পালকি ছাড়াও বড়োলোক বা সাহেবদের নিজস্ব পালকি ও বেহারা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছেলেবেলা’-য় লিখছেন, “পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে।” সঙ্গে বালথ্যাজার সলভিন্সের আঁকা পালকির ছবি।
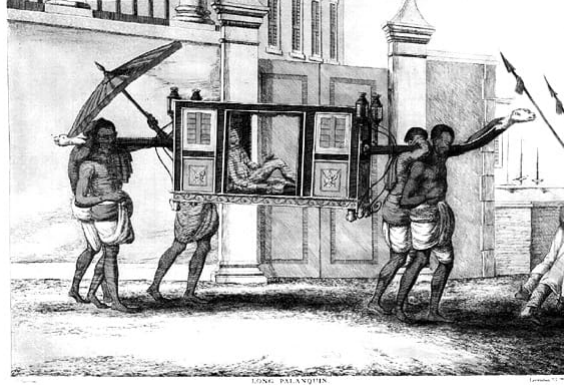
১.৩ গোরুর গাড়ি— শুধু গোরু নয়, কলকাতায় সেকালে মহিষ-জোতা গাড়িও প্রচুর দেখা যেত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, "বলদ গাড়িই আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। প্রথম প্রথম মহিষ জোতা গাড়ি দেখিয়া এতই ভয় হইত যে, আমরা তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে সাহস করিতাম না।" গোরুর গাড়ি মূলত মাল বইবার কাজে ব্যবহার করা হত। যেখানে গোরুর গাড়িতে ২০ মন বোঝা নেওয়া যেত, সেখানে মহিষের গাড়োয়ানরা "৪০ মণের কাছাকাছি মাল চাপাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।" পরে সাহেব-মেমসাহেবরা কলকাতা থেকে গোরুর গাড়ি তুলে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, "ইহাদের বড় কষ্ট হয়।" তবে ততদিনে কলকাতায় মোটরগাড়ি এসে গেছে। তাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এই দয়া-দেখানো "ইংরাজদিগের অনেকে কোন না কোন প্রকারে মোটর গাড়ির কারখানার সহিত সংলিপ্ত আছেন।"

১.৪ মানুষ গাড়ির— এই কাহিনি লেখার সময় অপেক্ষাকৃত নবীন যান ছিল এই মানুষ গাড়ি বা রিকশা। বাংলা রিকশা শব্দটি এসেছে জাপানি জিনরিকশা থেকে। চিনা ভাষায় জিন শব্দের অর্থ মানুষ, রিকি শব্দটির অর্থ শক্তি আর শা শব্দটির অর্থ বাহন। অর্থাৎ রিকশার বলতে মানুষের শক্তি দ্বারা চালিত বাহনকে বোঝায়। জোনাথন স্কোবি নামে একজন মার্কিন মিশনারি ১৮৬৯ সালে রিকশা উদ্ভাবন করেন। স্কোবি থাকতেন জাপানের ইয়াকোহামায়। নিজের অথর্ব স্ত্রীকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিতে তিনি এই যান তৈরি করেন। ১৮৮০ সালে ভারতে প্রথম রিকশা চালু হয় হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। রেফ জে ফোর্ডিস নামের এক ব্রিটিশ নাগরিক, তিনি একে নিয়ে আসেন এ দেশে। কিন্তু সেই সময় যে হাতে টানা রিকশা দেখা যেত, তার আর আজকের হাতে টানা রিকশার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তখন একটা রিকশা চালাতে পাঁচজন মানুষ লাগত, এতটাই বড়ো ছিল সেই রিকশা। এর পুরোটাই তৈরি ছিল লোহা দিয়ে। ১৯০০ সালে কলকাতায় হাতে টানা রিকশা চালু হয়, তবে মালপত্র বহনের জন্য। ১৯১৪ সালে কলকাতা পৌরসভা রিকশায় যাত্রী পরিবহনের অনুমতি দেয়। ভারতে প্রথম রিকশা বানায় হার্টস রয়াল হর্স রিপোজিটরি। কলকাতার স্টেটসম্যান- এ মানুষে টানা রিকশার প্রথম বিজ্ঞাপন পাই ১৯০২ সালে অক্টোবর মাসে ডব্লিউ লেসলি অ্যান্ড কোম্পানির (সঙ্গের ছবি)। দাম ১৬০ টাকা থেকে ১৮০ টাকা। এর পরে ১৯০৩ সালের ৫ এপ্রিল ব্রেকওয়েল অ্যান্ড কোম্পানি মাত্র ১৮০ টাকায় সেকেন্ডহ্যান্ড "almost new" রিকশার বিজ্ঞাপন দেন।

JINRICKSHAWS

FOR CALCUTTA.

Japanese Jinrickshaws, very light, strong and easy running: Diameter of wheels, 42 ins, width of track, 2 ft. 11ins, Upholstered in brown and black leather, and complete, with cushion, hood apron, and 2 lamps.

	No. 30030	No. 29649	No. 19585.
Price	Rs. 160	Rs. 170	Rs. 180 each.

W. LESLIE & CO.,

CALCUTTA.

১.৫ লপেটা পায়ে, টেরি মাথায়, ছড়ি হাতে— লপেটা হল নাগরা ও পাম্প শু এই দুই-এর মধ্যবর্তী আকারবিশিষ্ট পাদুকা। টেরি মানে বাঁকা বা তেরছা সিঁথি। ১৯১৬ সালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত, ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রথম সংস্করণে লেখা আছে- টেরি কাটা, টেড়ি কাটা- মাথার চুলে টেড়া বা বাঁকা সিঁথি রচনা করা; বাঁকাইয়া চুল।

সুকুমার রায় আশ্বিন, ১৩২৯-এর সন্দেশ পত্রিকায় তাঁর 'বাবু' কবিতায় এই তিনটিকেই মিলিয়ে লিখেছেন-

অতি খাসা মিহি সূতি

ফিনফিনে জামা ধুতি,

চরণে লপেটা জুতি জরিদার।

এ হাতে সোনার ঘড়ি,

ও হাতে বাঁকান ছড়ি,

আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা

তায় তোফা টেরিকাটা-

সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।

১.৬ মগ— মগ আরাকান নিবাসী জাতি বিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদেরা এদের ইন্দো-চিন নিবাসী বলে মনে করেন। এদের মধ্যে মারমগরি, ভুঁইয়া মগ, বড়ুয়া মগ, রাজবংশী মগ, মারমা মগ, রোয়াং মগ, ভ্যুমিয়া মগ ইত্যাদি নামে জাতবিভাগ আছে। বাংলায় অতীতে বিভিন্ন দেশের জলদস্যুরা আসত চুরি ডাকাতি বা সম্পদ লুট করতে। তাদের নিয়ে অনেক গল্প কবিতা ছড়া লেখা হয়েছে। একদল ভয়ানক দস্যু আসত মগ রাজার দেশ থেকে। এরা ছিল মূলত পর্তুগিজ নৌ-দস্যুদের রাজাকার বাহিনী। মগরা আমাদের অঞ্চলে এসে যে অরাজকতার সৃষ্টি করত, তার মাত্রা বোঝানোর জন্য বলা হত মগের মুল্লুক অর্থাৎ যা খুশি তাই করার দেশ। অনেকের মতে মগ মানেই আরাকানি আর মগের মুল্লুক মানে আরাকান রাজ্য। আরাকানরাজের সৈন্যদলের মধ্যে অনেক মগ ও অবৈতনিক পর্তুগিজ সৈন্য ছিল। এরা বছরে বারোমাস লুণ্ঠন, অপহরণ ও অত্যাচার চালাত। শায়েস্তা খাঁর এই দুর্ধর্ষ অভিযানে পর্তুগিজ ও মগেরা চট্টগ্রাম থেকে অতি ক্ষিপ্রতায় পালানোর (স্থানীয়ভাবে এই ঘটনা 'মগ-ধাওনি' নামে খ্যাত ছিল) সময় ১,২২৩টি কামান ফেলে যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনসম্পদ ঘড়ায় করে মাটিতে পুঁতে রেখে যায় (পরবর্তীকালে, মগ-পুরোহিতরা

সাংকেতিক মানচিত্রের সাহায্যে গোপনে এইসব স্থানে এসে ঘড়াগুলি উঠিয়ে নিয়ে যেতেন)। এইভাবে গোটা বাংলায় 'মগের মুল্লুক'-এর অবসান ঘটে। ইংরেজ শাসনেও পর্তুগিজ হার্মাদদের দস্যুতার কথা শোনা যেত; ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দেও কলকাতায় মগ দস্যুর ভয় ছিল জনসমাজে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার হাওড়ার শিবপুরে (এখনকার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে) গঙ্গার একটা বাঁধ তৈরি করে মগ ও পর্তুগিজ দস্যুদের আগমনপথ বন্ধ করে দেন।

১.৭ নাগা সন্ন্যাসীর দল— ভারতে যখন বকধার্মিকদের দৌরাত্ম্য প্রচণ্ড রূপ নেয়, তখন তাকে রুখতে গুরু শংকরাচার্য একটি খারু গঠন করেন। ওই সংঘের মাধ্যমেই নাগাদের পত্তন হয়। শাস্ত্রজ্ঞান ও অস্ত্রজ্ঞান- উভয় বিষয়েই এই নাগারা বিজ্ঞ ছিল। এই দুইয়ের প্রয়োগে তারা তখন সনাতন ধর্মের ওপরে যে বিপত্তি নেমে এসেছিল তার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। পরবর্তী মুসলিম শাসন আমলেও এই সাধুরা স্বধর্ম রক্ষায় তৎপর ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, নাগা সন্ন্যাসীদের একটি গোষ্ঠী ইংরেজ আমলে লোকজনকে টাকা ধার দিত, নির্দিষ্ট সময় পর তা তুলে নিয়ে যেত ফায়দা সহ। এ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের বিবাদ-লড়াই হত প্রায়ই। নাগা সন্ন্যাসীরা কেউ কেউ রাজা-জমিদারদের পক্ষে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে লড়াইও করত। ব্রিটিশ আমলে মুসলিম ফকিরদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের কোনও কোনও পক্ষ ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে বলেও জানা যায়। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, এই সন্ন্যাসীরা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী এবং একদণ্ডী সন্ন্যাসবাদের গিরি ও পুরী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রসঙ্গত, বাংলায় কোম্পানি শাসনের তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৭৬০ সালের জুনে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছিল ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ফকির মজনু শাহ্ এই বিদ্রোহের প্রাণপুরুষ ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে নাটোরের জমিদার দেবী চৌধুরাণীর সেনাপতি সন্ন্যাসব্রতধারী ভবানী পাঠক এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন, অনুপ্রাণিত করেন। ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক তখন মজনু শাহর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ইতিহাসবিদ ড. সিরাজুল ইসলামের লেখায় জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'নাগা' ও 'গিরি' সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। অযোধ্যার নবাবের সৈন্যবাহিনীতে 'গোঁসাই' বাহিনী গঠিত হয় মূলত ওই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে। ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাব মিরকাশিম ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

১.৮ হেলে পড়া, ঘুঁটে দেওয়া মেটে দেয়াল— মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, কলকাতায় তখন পাকা বাড়ি আর মাঠকোঠা কম ছিল। সব জায়গায় এঁদোপুকুর আর বাঁশঝাড়। চারিদিকে বড়ো বড়ো তেঁতুল, নারকেল গাছ আর পুকুরে ভর্তি। ধানখেত আর পুকুরও ছিল। রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো পগার। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও কলকাতায় মাটির বাড়ির অভাব ছিল না। বাড়িতে ছিল খড়ের ছাউনি, তাতে আগুন লেগে বিপদ ঘটত প্রায়ই। বিনয় ঘোষের 'সংবাদপত্রে সেকালের কলকাতা'-তে বাড়ির মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু বা খড়ের চালে আগুন লাগার কাহিনি পাওয়া যায়।

সাধারণত নরম থাকতে থাকতে গোবরকে ঘেঁটে সমসত্ত্ব করে গোল তাল পাকিয়ে সেগুলি হাতের সাহায্যে দেওয়াল বা তেমন কোনও শক্ত তলের উপর থপ থপ করে থেবড়ে দিয়ে চ্যাপটা করা হয়। একে বলে ঘুঁটে দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠে আছে:

"বড় বউ মেজ বউ মিলে।

ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।।"

গোবর হাওয়ার সংস্পর্শে শুকিয়ে শক্ত হয়ে ঘুঁটে হয়ে যায়। জলীয় অংশ কমে যাবার ফলে এর আয়তন সংকোচন হয়। হাতে করে থেবড়ানোর জন্য ঘুঁটের বাইরের তলে হাতের তিন-চার আঙুলের ছাপ থাকে। পিছনের তলটি সাধারণত দেওয়ালের ন্যায় সমতল হয়। দেওয়ালগুলি এমনভাবে বাছা হয় যাতে রোদ পড়ে ও ঘুঁটে তাড়াতাড়ি শুকোয়। শুকিয়ে গেলে ঘুঁটে দেওয়াল থেকে সহজেই খসিয়ে নেওয়া যায়। কাচা ঘুঁটে দেওয়াল থেকে খোলার চেষ্টা করলে ভেঙে যায়। প্রায় শুকোনো ঘুঁটে দেওয়াল থেকে ছাড়িয়ে নেবার পর গোছা গোছা করে রোদে রেখে আরও ভালো করে শুকোনো হয়। তখন ঘুঁটে সমতল না থেকে একটু বেঁকেচুরে যেতে পারে। যে ঘুঁটে যত ভালো শুকোনো হয় তা তত সহজে জ্বালানো যায়। তাই ভালো করে শুকোনো ঘুঁটের কদর বেশি। এক-একটি ঘুঁটে দেখতে বড়োসড়ো মনে হলেও সমান আয়তনের কয়লা, এমনকি কাঠের থেকেও ঘুঁটে অনেক হালকা।

১.৯ কবিবর সত্যেন্দ্র দত্তও কলকাতার সম্বন্ধেই বলেছেন— মূল কবিতার নাম 'স্বাগত'। কলকাতার সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে এটি রচিত হয়। কবিতার প্রথম দুটি লাইন ছিল—

"স্বাগত বঙ্গ মনীষী সংঘ ভূষিত অশেষ মানের হারে

এ মহানগরে এসো- আজি এসো ভাবের জ্ঞানের সন্তাগারে।"

অধ্যায়ের পরের উদ্ধৃতিও একই কবিতা থেকে নেওয়া।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নবকুমার, কবিরত্ন, অশীতিপর শর্মা, ত্রিবিক্রম বর্মণ, কলমগীর প্রভৃতি ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। দেশাত্মবোধ, মানবপ্রীতি, ঐতিহ্যচেতনা, শক্তিসাধনা প্রভৃতি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। ১৯১৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর কৃতিত্ব বিদেশি কবিতার সফল অনুবাদ। আরবি, ফার্সি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার বহু কবিতা অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সাধন করেন। মেথরদের মতো অস্পৃশ্য ও অবহেলিত সাধারণ মানুষ নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। তিনি একাধিক ছদ্মনামে কাব্যচর্চা করতেন। কবিতায় ছন্দের সমৃদ্ধির জন্য তিনি ছন্দের রাজা ও ছন্দের জাদুকর বলে খ্যাত।

১.১০ শীতলার মন্দির— হিন্দু ধর্মের একজন লৌকিক দেবীবিশেষ। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে এই দেবীর প্রভাবেই মানুষ বসন্ত প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। এই কারণেই গ্রামবাংলায় বসন্ত রোগ মায়ের দয়া নামে অভিহিত হয়ে থাকে। তাই কেউ বসন্তে আক্রান্ত হলে দেবী শীতলাকে পূজা নিবেদন করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করা গ্রামীণ হিন্দু সমাজের প্রধান রীতি। যেমন: বসন্তবুড়ি ব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের মহিলারা বসন্ত রোগের নিরাময় কামনায় শীতলার এই ব্রত পালন করেন। এটি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে করা হয়। ব্রতটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। বসন্তবুড়ি ব্রত পালনের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ মঙ্গলঘট ও ডাব সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রতের দিন সারাদিন উপবাস করে বাড়ির উঠোনে উন্মুক্ত স্থানে একটি ঘটের উপর ডাবটি রাখা হয়। এরপর ওই ডাবের জল দিয়ে ঘটটিকে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়।

মাঘ মাসের ষষ্ঠ দিনে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। শীতলা দেবীর বাহন গর্দভ। প্রচলিত মূর্তিতে শীতলা দেবীর এক হাতে জলের কলস ও অন্য হাতে ঝাড়ু দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তদের বিশ্বাস কলস থেকে তিনি আরোগ্যসুধা দান করেন এবং ঝাড়ু দ্বারা রোগাক্রান্তদের কষ্ট লাঘব করেন

১.১১ জৈনের পরেশনাথ দেবালয়— কলকাতার উত্তর-পুবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাগোয়া বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে (গৌরীবাড়ি) জৈনতীর্থ শ্রী পার্শ্বনাথ জৈন উপবন মন্দির। নামে পরেশনাথ মন্দির হলেও আসলে ১৮৬৭ সালে রায় বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুরের হাতে তৈরি ২৪ জৈন তীর্থঙ্করের অন্যতম শীতলানাথজির (১০ম) মন্দির এটি। আর পরের বছর সুখলাল জহুরী গড়ান জৈন শ্বেতাম্বর মন্দির। মন্দিরে রয়েছে আরও অনেক কিছু। শ্বেতমর্মরের বিগ্রহ, ক্রিস্টাল, ডায়মন্ড, রুবি, মুক্তা, কোরাল ছাড়াও মূল্যবান সব রত্ন, রঙিন কাচ আর মন্দির স্থাপত্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। শিল্পী গণেশ মুসকরের আঁকা ছবিগুলিও সুন্দর। সারা মন্দির জুড়ে রয়েছে বাগিচা। ভক্তদের বিমোহিত করে ফোয়ারা, জলাশয়, রঙিন মাছ, মর্মরমূর্তি। সরোবরের পাড়ে রয়েছে শান্তি ও অহিংসার প্রতীকী মূর্তি, বাঘে-গোরুতে জল খাচ্ছে। বাঁদিকে পবিত্র প্রান্তিক শিলা। মন্দিরের মূল মূর্তি শীতলানাথজির কপালের ডায়মন্ডটি দর্শকদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। রাসপূর্ণিমায় জাঁকালো উৎসব হয়। ঝলমলে মিছিল বেরোয়। প্রতি দিন সকাল ৬টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মন্দির খোলা।

১.১২ চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী— আকবরের অর্থমন্ত্রী রাজা টোডরমলের গোমস্তা মনোহর ঘোষ ১৬১০ সালে কলকাতার গঙ্গাতীরবর্তী এই অঞ্চলে চিত্তেশ্বরী দুর্গার মন্দির স্থাপন করেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল হুগলির (অধুনা হাওড়ার) বালি। এই 'চিত্তেশ্বরী' নামটি থেকেই অপভ্রংশের ফলে 'চিৎপুর' নামটির সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। কেউ কেউ আবার 'চিৎপুর' নামটির পিছনে জনৈক 'চিতে' ডাকাতের হুংকার আছে বলে মনে করেন। চিৎপুর রোড (বর্তমান রবীন্দ্র সরণি) কলকাতার অতি প্রাচীন একটি রাস্তা। পরবর্তীকালে চিতু ডাকাত ও চিত্তেশ্বরীর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয় চিৎপুর। কলকাতার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা যায়, একেবারে শুরুর সময়েই উত্তরের চিৎপুর থেকে দক্ষিণে গোবিন্দপুরের কালীঘাট অবধি একটি রাস্তা বিস্তৃত ছিল। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিলেন 'রোড টু কালীঘাট' বা 'পিলগ্রিম পাথ' (Pilgrim Path)। চিৎপুর থেকে দক্ষিণমুখে সুতানুটি ছাড়িয়ে একটা কাঁচা রাস্তা সোজা কালীঘাটের দিকে চলে গেছিল। এই রাস্তাই চিৎপুর রোড। মূলত এই রাস্তা ধরেই পুণ্যার্থী তথা ভক্তরা চৌরঙ্গীর গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালীঘাটে তীর্থ করতে যেত। অনেকের ধারণা রবীন্দ্র সরণি বা পূর্বতন চিৎপুর রোডের আশপাশের অঞ্চলটিই শুধু চিৎপুর। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, চিৎপুরের ব্যাপ্তি অনেকটা এলাকা জুড়ে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী-র 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসার ভাসান'-খ্যাত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়'-এ চিৎপুরের উল্লেখ আছে। যদিও তা প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তীকালের সংযোজন বলেই মনে হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'চিত' শব্দের প্রধান অর্থ দেওয়া হয়েছে 'চন্দনাদিরচিত চিত্র বা লেখা'। যে-কোনো শাক্ত বা বৈষ্ণব মন্দিরে তীর্থ করতে যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীরা কপালে ও হাতে চন্দনের ছাপ নিতেন। তিলক কাটা তো একটি স্বাভাবিক প্রথা। শ্বেতচন্দনের জায়গায় শাক্তরা আবার রক্ততিলক কাটতেন। অর্থাৎ চিৎপুর ছিল কালীঘাটমুখী ভক্তস্রোতের গায়ে-হাতে-কপালে শ্বেতচন্দন ও রক্ততিলক নেওয়ার এক প্রধান হল্ট। 'চিত্রপুর' নামেও পরিচিত ছিল 'চিতপুর'। চক্রপাণি নামে বাংলার নবাবের এক চিত্ররসিক সেনাপতি নাকি এখানে বাস করতেন। এটি ছিল শিল্পীদের এক বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। চিত্রপুর হোক, চিতপুর হোক, বা চিৎপুরই হোক– চিৎপুরের যাত্রাশিল্প কিন্তু এখনও পুরোনো 'মেকআপ ম্যান'-দের স্মৃতি উসকে দেয়। গায়ে, হাতে ও কপালে চন্দন ছাপ নেওয়া ও তিলক কাটার প্রাচীন অভ্যাস সহজে যাওয়ার নয়।

CHITTAPORE ROAD, CALCUTTA.
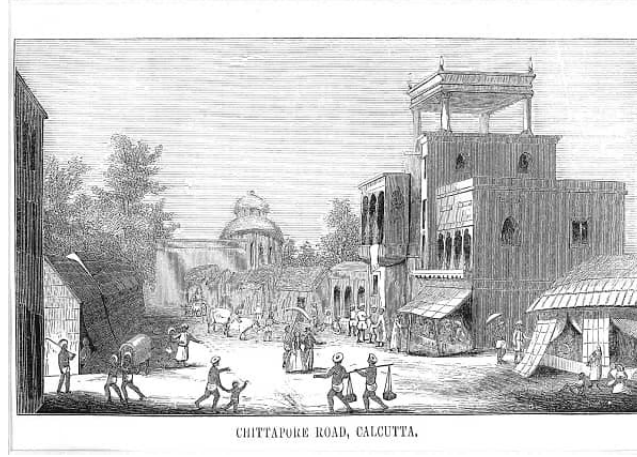
চিৎপুর রোড ছিল কলকাতার প্রাচীনতম রাস্তা। ধনী মানুষের পাশাপাশি এই অঞ্চলে অনেক সাধারণ মানুষের বসবাস ছিল। বাংলা প্রাচীন পঞ্জিকা এখান থেকে ছাপা হত। চিৎপুর রোডই ছিল বটতলা বইবাজারের কেন্দ্র। চিৎপুর রোডের পান, আড্ডা, যাত্রা ও অনুষ্ঠান কলকাতার বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বিবাহের অনুষ্ঠানে 'হি ইজ আ জলি গুড ফেলো' গাওয়া ব্রাস ব্যান্ডের কেন্দ্র ছিল এই রাস্তা। চিৎপুর রোডের একটি অংশ লোয়ার চিৎপুর রোড দিল্লির চাঁদনি চকের সমতুল্য ছিল। সঙ্গে ১৮৫৭ সালে অঙ্কিত চিৎপুর রোড (উডকাট)।

১.১৩ কালীঘাটের কালিকা দেবী— কালীঘাট একটি বহু প্রাচীন কালীক্ষেত্র। কোনও কোনও গবেষক মনে করেন, "কালীক্ষেত্র" বা "কালীঘাট" কথাটি থেকে "কলকাতা" নামটির উদ্ভব। জনশ্রুতি, ব্রহ্মানন্দ গিরি ও আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে দুই সন্ন্যাসী কষ্টিপাথরের একটি শিলাখণ্ডে দেবীর রূপদান করেন। ১৮০৯ সালে বড়িশার সাবর্ণ জমিদার শিবদাস চৌধুরী, তাঁর পুত্র রামলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মীকান্তের উদ্যোগে আদিগঙ্গার তীরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। কালীঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গা দিয়ে চারশো বছর আগে ছোটো ছোটো জাহাজ চলত। ভক্তেরা পুণ্যস্নান করে মা কালীর থানে পুজো দিতেন। মন্দিরের সামনেই ছিল স্নানের ঘাট।
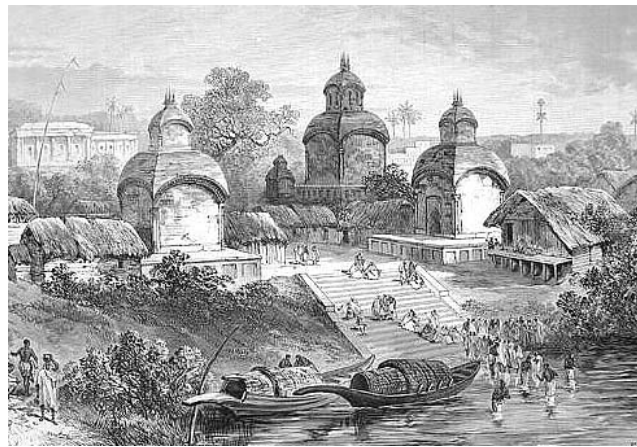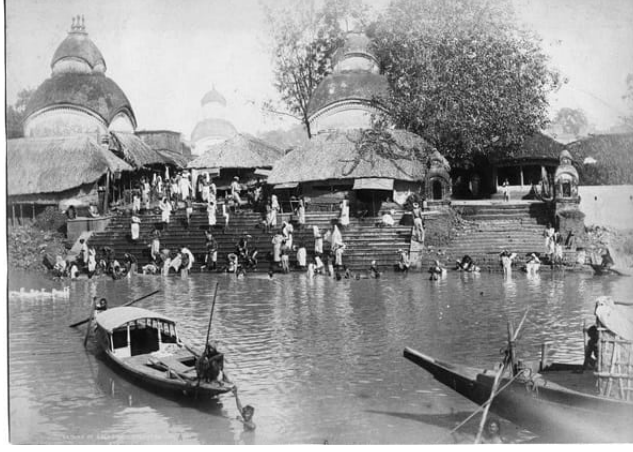
লোকমুখে অন্য একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায়চৌধুরী একদিন হুগলি নদীতে ভ্রমণকালে অলৌকিক আলো দেখে আকৃষ্ট হন এবং সেখানে গিয়ে তিনি একইরকম ভাবে আঙুলের আকারের পাথর খুঁজে পান। সেটিকে তুলে নিয়ে তিনি একটি ছোটো মন্দির স্থাপন করেন। বর্তমানে এই মন্দির কালীঘাট মন্দির নাম পরিচিত। প্রথমে মন্দিরটি একটি কুঁড়েঘরের মতো ছিল। পরে সেটিকে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়। মন্দিরটি সন্তোষ রায়চৌধরী বানানো শুরু করেছিলেন ১৭৯৯ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাতি রাজীবলোচন রায়চৌধুরী ১৮০৯ সালে মন্দিরের কাজ সম্পন্ন করেন। বর্তমান এই মন্দিরটি নব্বই ফুট উঁচু। এটি নির্মাণ করতে আট বছর সময় লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। মন্দির সংলগ্ন জমিটির মোট আয়তন ১ বিঘে ১১ কাঠা ৩ ছটাক; বঙ্গীয় আটচালা স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মূল মন্দিরটির আয়তন অবশ্য মাত্র ৮ কাঠা। মূল মন্দির সংলগ্ন অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি দেবতা পূজিত হন। কালীঘাট মন্দিরের নিকটেই পীঠরক্ষক দেবতা নকুলেশ্বর শিবের মন্দির। ১৮৫৪ সালে তারা সিং নামে জনৈক পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী বর্তমান নকুলেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। শিবরাত্রি ও নীলষষ্ঠী উপলক্ষ্যে এই মন্দিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। কালীমন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে শ্যামরায়ের মন্দির। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাওয়ালির জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখানে রামনবমী ও দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬২ সালে শবদাহের জন্য মন্দিরের অদূরে নির্মিত হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশান। বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে এই শ্মশানে। এখানকার শ্মশানকালী পূজা বিখ্যাত। সঙ্গের ছবিতে ১৮৮৭ সালের আদিগঙ্গা ও ঘাটের মন্দিরসমূহ।

দ্বিতীয় দৃশ্য : কলকাতার পথ

২.১ গ্যাসের আলো— সেই সময়ে চোর, ডাকাত, গুন্ডাদের স্বর্গরাজ্য ছিল শহরের রাজপথ। কলকাতা শহরেও শুরুর দিকে বিপদে না পড়লে মানুষ রাতে খুব একটা বাইরে বেরোতেন না। উনবিংশ শতকের শেষ অবধি ইলেকট্রিক তো ছাড়, গ্যাসের আলোর কৌলীন্যও জোটেনি মহানগরীর কপালে। তাহলে রাস্তায় আলো কি জ্বলতই না? জ্বলত। আর তা ছিল কেরোসিনের বাতি। কিন্তু তার আগে? উনিশ শতকের গোড়ার দিকে

শহরের রাস্তায় ছিল না পথবাতি। সন্ধ্যা নামলেই দরজায় কুলুপ আঁটতেন বাসিন্দারা। ঘরের ভেতর জ্বলত রেড়ির তেলের প্রদীপ। রাতবিরেতে বাইরে বেরোনোর দরকার হলে জ্বেলে নেওয়া হত পাটকাঠির ডগায় মশাল। ওই শতকের মাঝামাঝি কলকাতার রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করে পুরসভা। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "... কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক।" তবে রাস্তায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা থাকলেও, বাড়িতে কিন্তু তখনও মহাবিক্রমে রাজত্ব করছে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ। তাই প্রতি পাড়াতেই ছিল একটা রেড়ির তেলের কল বা দোকান। কলকাতায় গ্যাসবাতির প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তবে তার আগে, ১৮০৭ সালের ১৬ অগস্ট লন্ডনের রাস্তায় জ্বলে ওঠে গ্যাসের আলো। ১৮২২ সালের ৩০ মার্চ তখনকার এক বাংলা দৈনিকের খবরে জানা যায়, "ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। ... অনুমান হয় লটারির অধ্যক্ষরাও লটারির উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন।" সংবাদপত্রের 'অনুমান' সত্যি হতে লেগে গেল আরও পঞ্চাশ বছর। ১৮৫৭ সালের ৬ জুলাই কলকাতার রাস্তায় পুরসভার লটারির টাকাতেই প্রথম জ্বলল গ্যাসবাতি। গ্যাসলাইট আসার পরেও যে অবস্থা খুব একটা বদলেছিল তা কিন্তু নয়। খুব ভালো গ্যাসবাতিও ২৫ ওয়াটের বাল্‌বের তুলনায় কম আলো দিত। সে বাতি আবার লাগানো থাকত বহু দূরে দূরে— ফলে রাস্তায় গ্যাসবাতির তলাটুকু বাদ দিলে বাকিটা ঘন অন্ধকারেই ঢাকা থেকে যেত। প্রথম গ্যাসবাতি জ্বলেছিল কলকাতার হৃৎপিণ্ড চৌরঙ্গী রোডে। গ্যাস ল্যাম্পের উচ্চতা ছিল মাটি থেকে ১১ ফুট আর দুটি পোস্টের মধ্যে দূরত্ব ১৫০ ফুট। তাতেই মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান বেঁধেছিল, "রাত্রিতে গ্যাসলাইট জ্বালো, আর অন্ধকার নাই/ অন্ধকার রাত্রে দিনের মতো চলে যাই।"

হুতোম লিখেছেন, সন্ধ্যা হলেই পুরসভার মুটে বগলে মই নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত পথে পথে আলো জ্বালতে। মই বেয়ে ল্যাম্পপোস্টে উঠে প্রথমে ন্যাকড়া বুলিয়ে পরিষ্কার করত আলোর শেডের কাচ। তারপর চাবি ঘুরিয়ে চালু করত গ্যাস। সবশেষে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাত বাতি। আলো জ্বালানো-নেভানোর সময় নিয়ে প্রচণ্ড কড়াকড়ি ছিল পুরসভার। ১৯০৮ সালের কর্পোরেশন অফ ক্যালকাটা-র অ্যালম্যানাকে দস্তুরমতো ঘণ্টা-মিনিট উল্লেখ করে বছরভর প্রতিদিনের বাতি জ্বালানো ও নেভানোর নির্ঘণ্ট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। (উদাহরণ- ডিসেম্বর মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত আলো জ্বালানোর সময় বিকেল ৫টা বেজে ৫০ মিনিট। আলো নেভানোর সময় ভোর ৫টা বেজে ৩৫ মিনিট। আবার ওই মাসেরই ১৬ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত আলো জ্বালানোর সময় বিকেল ৫টা বেজে ৪৩ মিনিট। আলো নেভানোর সময় ভোর ৫টা বেজে ৪৫ মিনিট।) বলা বাহুল্য, সাহেবি আমলে এর নড়চড় বড়ো একটা হত না। আলো জ্বালাতে ব্যবহার হত কয়লার গ্যাস। জোগান দিত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি। পাইপলাইনের সাহায্যে পরবর্তীকালে সেই গ্যাসের আলো ঢুকে পড়ে শহরের উচ্চবিত্ত বাড়িতেও। শোনা যায়, এর পথিকৃৎ শোভাবাজার রাজবাড়ি। আর গ্যাসবাতি দিয়ে অভিজাত হগ মার্কেট সাজানো হয় ১৯০৪ সালের ১ মে থেকে ১৯১১ সালের ৩০ এপ্রিল সময়কালে। শহরের রাস্তায় গ্যাসবাতির একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসাতে বৈদ্যুতিক আলোর বিকাশ ১৮৮৯ সালে। কলকাতায় প্রথম যে রাস্তা বিজলিবাতির আলোর স্পর্শ পায়, তা হল হ্যারিসন রোড, অধুনা মহাত্মা গাঁধী রোড। গোটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে লেগে যায় তিন বছর। ১৮৯২ সালে হ্যারিসন রোড জুড়ে আলোর বন্যা বয়ে যায়। সৌজন্যে কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি। তবে এরও আগে ১৮৭৯ সালের ২৪ মে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজধানীতে প্রথম বিজলিবাতির প্রদর্শন করেন পি. ডব্লিউ. ফ্লুরি অ্যান্ড কোম্পানি। তার মাত্র দু-বছর পরেই ৩০ জুন ১৮৮১ ম্যাকিনন অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির গার্ডেনরিচের সুতোকলে ৩৬টা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় দেশি সংস্থা দে শীল অ্যান্ড কোম্পানি। ১৮৯৫ সালে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং অ্যাক্ট পাশ করে তদানীন্তন বাংলার সরকার। ১৮৯৭-এর ৭ জানুয়ারি ২১ বছরের জন্য শহরকে আলোকিত করার লাইসেন্স মঞ্জুর হয় ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেডের এজেন্ট কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানির নামে। ভিক্টোরীয় যুগের গ্যাসবাতি জ্বলত পেটা লোহার কারুকাজ করা পোস্ট বা ব্র্যাকেট থেকে। বিজলিবাতির আদি যুগে রাস্তার পাশের এই পোস্টগুলোই ব্যবহার হত আলো জ্বালাতে।

তবে কাচের মনোহারি আস্তরণ বাতিল করে এনামেলের শেড থেকে ঝুলত নগ্ন বাল্ব। ১৯৫১ সাল অবধি কলকাতায় গ্যাসের আলো ছিল ১৯০০০, যা ১৯৬০ সালে হয় ৩৮০০ আর গ্যাসের আলো কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় ১৯৭০ সালে। ক্রমে ইতিহাসের পাতাতেই ঠাঁই হয় সুদৃশ্য পোস্টগুলোর।

২.২ ক্লাইভ স্ট্রীট— এখন যেখানে ক্লাইভ স্ট্রীট, ইংরেজরা আসার আগে সেটা ভাগীরথী নদীর এলাকায় ছিল। কালের প্রভাবে সেই জল ধুয়ে চর, মাটি আর পায়ে চলা পথ জেগে ওঠে। এটি কলকাতার প্রাচীনতম পথগুলির একটা। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ জেতার পর লর্ড ক্লাইভ নিজেই এই রাস্তার নাম রাখেন ক্লাইভ স্ট্রিট। তিনি নিজে এই রাস্তায় যে বাড়িটিতে থাকতেন সেটিই এখন রয়্যাল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং। এই রাস্তা এককালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কোম্পানির কাউন্সিলের সদর দপ্তর সেকালের পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে ছিল। আর কেল্লা ছিল ক্লাইভ স্ট্রিটের মাঝবরাবর প্রায় লালদিঘি অবধি। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইতে লিখছেন, "আজকাল যাহা ক্লাইভ-স্ট্রীট বলিয়া সাধারণে পরিচিত, দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, তাহাই প্রাচীন কলিকাতার 'সাহেবী-কোয়ার্টার' ছিল। প্রাসাদ-সৌন্দর্য্যময়ী চৌরঙ্গী, তখন জঙ্গলের মধ্যে শার্দ্দূল ও বন্যবরাহের ক্রীড়াভূমি, দস্যু ও চোরের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এই ক্লাইভ-স্ট্রীটই তখন সরাসরি বড়বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছিল ও ইহাই কলিকাতার প্রধান বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ইহার নাম ক্লাইভ স্ট্রীট ছিল না—কি ছিল, তাহাও প্রকাশ নাই। তবে ইংরাজেরা এই পথটিকে Road to Great Bazar বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।"

পরে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হত দরমাহাটা নামে এক এলাকায়। সেখানে দরমার মাদুর ইত্যাদি বিক্রি হত। এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল হলওয়েল মনুমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনেই। একে কেন্দ্র করে বেরিয়েছে ফেয়ারলি প্লেস, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, ক্লাইভ রো, ক্যানিং স্ট্রিট, চার্নক প্লেস ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট পুরসভার অধিবেশনে ক্লাইভ স্ট্রিটের নাম বদলে নেতাজির নামে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালের ৯ আগস্ট থেকে এই রাস্তার নাম হয় নেতাজি সুভাষ রোড। সঙ্গে ১৮৯২ সালে জন গোদারের তোলা ক্লাইভ স্ট্রিটের ছবি।

২.৩ স্ট্র্যান্ড রোড— এখন যেখানে স্ট্র্যান্ড রোড, এককালে এখানে ছিল গঙ্গার পলি আর এক বিখ্যাত ঘাট। বহু বছর আগে চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদি দোকানদার ছিলেন। যেসব ব্যবসায়ী আর দোকানদাররা এখানে নৌকা থেকে নামতেন, তাঁরা ওই দোকান থেকে জিনিস কিনতেন। তাঁর নামেই এই ঘাটের নাম হয় চাঁদপাল ঘাট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এই ঘাটেই নামলে তাঁদের সম্মানে তোপধ্বনি করা হত কেল্লা থেকে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের ঝগড়ার শুরুই হয় ১৯টির বদলে ১৭টি তোপধ্বনি করায়।

প্রথমে এই রাস্তার নাম ছিল স্ট্র্যান্ড ব্যাংক। একবার সুমাত্রা নামে একটি জাহাজ এখানে ডুবে যায় আর সেই ধ্বংসাবশেষ মিশে যায় মাটির সঙ্গে। এই নতুন গড়ে ওঠা শক্ত মাটির নাম হয় সুমাত্রা স্যান্ড। ১৮৭০ সালে এখানেই পোর্ট কমিশনারেট গড়ে ওঠে। স্ট্র্যান্ড রোডটি ১৮২৮ সালে লটারি কমিটি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ১৮২৩ সালে রাস্তার কাজ শুরু হয়। এই রাস্তাতেই আছে টাঁকশালের নকশাকার জেমস প্রিন্সেপের নামে প্রিন্সেপ ঘাট, জানবাজারের বিখ্যাত বাবু রাজচন্দ্র দাসের (রাণী রাসমণির স্বামী) নামে বাবুঘাট, ইংরেজ সেনাপতি আউট্রামের নামে আউট্রাম ঘাট। এই রাস্তার পাশেই আছে সুসজ্জিত ইডেন গার্ডেনস। সঙ্গে ফ্রান্সিস ফ্রিথের তোলা ১৮৯০ সালের স্ট্র্যান্ড রোড।

২.৪ হাইকোর্টের— ভারতের প্রাচীনতম হাইকোর্ট। ১৮৬১ সালের হাইকোর্ট আইন বলে ১৮৬২ সালের ১ জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। সেই সময় এই হাইকোর্টের নাম ছিল হাই কোর্ট অফ জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম। বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কলকাতা হাইকোর্টের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত। আন্দামান ও নিকোবরের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে কলকাতা হাইকোর্টের একটি সার্কিট বেঞ্চ আছে। কলকাতা শহরের সাম্মানিক নাগরিক শেরিফের ঐতিহ্যশালী দপ্তরটি এই আদালতের ভেতরে অবস্থিত।

হাইকোর্ট ভবনটি ইউরোপীয় গঠনশৈলীর গথিক স্থাপত্যবিশিষ্ট বেলজিয়ামের ইপ্রেস ক্লথ হলের আদলে নির্মিত। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্লথ হল ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেটি পুনর্নির্মাণের জন্য ওই শহরের মেয়র কলকাতা থেকে এক সেট প্ল্যান চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালের মার্চ মাসে ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। নির্মাণকার্য

শেষ হতে সময় লেগেছিল আট বছর। এই ভবনে একটি ১৮০ ফুট উঁচু টাওয়ার আছে। হাইকোর্ট ভবনের নকশাটি বেশ জটিল। এই প্রসঙ্গে রথীন মিত্র লিখেছেন :

একটা চতুষ্কোণীর চারধারে অবস্থিত একটি আয়তাকার স্থাপত্য। ভেতরে অনেকগুলি বিচার কক্ষ, অন্যান্য ঘর। ছাদের সঙ্গে লোহার একটি সুন্দর গম্বুজ আছে, যা ভেতরের গরম হাওয়া টেনে বের করে নিয়ে বাহিরে পাঠিয়ে দিতে পারে। বাড়ির ভেতরের বাতাস হয়ে যায় নির্মল ঠান্ডা। চারিদিকে সুন্দর বাগান, ফোয়ারা।

পরবর্তী পর্যায়ে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিকে সংলগ্ন আরও একটি ভবন নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্তী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ দিকে হাইকোর্ট ভবনের বর্তমান স্থাপত্যের সঙ্গে সমতা রেখে আর-একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। চতুর্ভুজাকার এই হাইকোর্ট ভবন দৈর্ঘ্যে ৪২০ ফুট এবং প্রস্থে ৩০০ ফুট। সঙ্গে ১৮৯০ সালে লাইফ ম্যাগাজিনের তোলা কলকাতা হাইকোর্ট।

২.৫ রাধাবাজার— 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "সাবর্ণ মহাশয়েরা, সেই পুরাকালে কলিকাতার জন-সংখ্যা বৃদ্ধি ও আংশিক উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্যামরায়জীউর উৎসব উপলক্ষ্যে, সাময়িক অনেক হাট-বাজার ও মেলার অনুষ্ঠান হইত। তাহাদের শ্যামরায় বিগ্রহের দোল-যাত্রা উপলক্ষ্যে, তৎকালের উপযোগী, একটা মেলা লালদীঘিতে বসিত। এই শ্যামরায়ের দোলের উৎসব ক্ষেত্র ছিল বলিয়াই বোধ হয় পার্শ্বস্থানগুলির লালদীঘি, রাধাবাজার, লালবাজার ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছিল।" প্রায় ৩২৫ বছর আগে এক বসন্তে, কয়েকজন ফিরিঙ্গি ছোকরা গ্রামের ভেতরে ঘুরতে বেরিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাদের কানে এল গানের সুর। সেই সুর অনুসরণ করে তারা এগোতে এগোতে পৌঁছোল এক দিঘির পাড়ে। সেখানে তারা যা দেখল, তা বিস্ময়কর! দিঘির দক্ষিণে এবং উত্তরে দুটি খাড়াই মঞ্চ। তার একটিতে গোবিন্দজি এবং অন্যটিতে শ্রীরাধিকার অধিষ্ঠান। দুই দেব-দেবীকে মাঝে রেখে চলছিল দোলখেলা। যাঁরা দোল খেলছিলেন তাঁদের পোশাকেও ছিল অভিনবত্ব। আবিরে চারদিক লাল। পিচকারিতে তরল রং নিয়ে চলছিল খেলা। কাতারে কাতারে লোক এসেছেন সেই উৎসবে। বসেছিল মেলাও। দিঘির উত্তর পাড়ে অর্থাৎ রাধাবাজারে, স্তূপ করে রাখা ছিল আবির। পথঘাটের সঙ্গে দিঘির জলও লাল হয়ে গিয়েছিল। গোপিনীদের নৃত্য, উত্তেজক চটকদারি সংগীত আর চারপাশের পরিবেশ সেই

ইংরেজ ছোকরাদের প্ররোচিত করে তোলে। এই গোপিনীরা যে আসলে সকলেই পুরুষ, তা ভাবতেও পারেনি ওই ফিরিঙ্গি ছোকরারা। প্রাচীন গ্রিসের 'স্যাটারনালিয়া'-র সঙ্গে এই রং-উৎসবের মিল খুঁজে পেয়ে তারা ভেবেছিল বুঝি 'কামোৎসব'। এরপরে তারাও অংশ নিতে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ফলে এক কাণ্ড ঘটে বসল! এটা ফিরিঙ্গিদের বেয়াদপি মনে করে নেটিভরা তাদের উৎসবে ঢুকতে বাধা দিলেন। শুধু তাই নয়! তাদের পিঠে পড়েছিল চড় থাপ্পড়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ঘটনাটির উল্লেখ মেলে।

২.৬ মুর্গাঁহাটা— আগে নাম ছিল মুরগিহাটা। এখন ব্রেবোর্ন রোড। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা প্রথম ভারতে আসেন ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বঙ্গদেশে না এলেও তাঁর আসার মাত্র উনিশ বছর পরেই, ১৫১৭-এ আর-এক পর্তুগিজ নাবিক ডি জোয়াও সিলভেরিয়া বাণিজ্যতরী নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। ইতিহাস বলে ওই নাবিক বাণিজ্য করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন তৎকালীন শাসকের কাছে। কেউ কেউ বলেন, সেই শাসক হলেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ। তথ্যটা বিতর্কিত হলেও এটা জানা যায় যে বাংলার শাসকের কাছ থেকে অনুমতি তখন মেলেনি। হতোদ্যম না হয়ে পর্তুগিজরা বছর বছর নৌবহর পাঠাতে থাকে অনুমতির আশায়। তারপর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পর্তুগিজরা শেষ পর্যন্ত বাংলায় বাণিজ্য করবার অনুমতি লাভ করে। ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার পশ্চিম অংশে এসে সপ্তগ্রাম, হুগলি, ব্যান্ডেল প্রভৃতি অংশ ঘুরে পর্তুগিজরা কলকাতায় বসতি স্থাপন করে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ইংরেজ বণিক জোব চার্নক মুঘলদের সঙ্গে বিরোধ করে যখন সুতানুটি আসেন, পর্তুগিজরা ততদিনে এই অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরি করে ফেলেছে। খানিকটা তাদের সহায়তা নিয়েই জোব চার্নক এখানে বসতি তৈরি করেন। সেখানে খড়ের চালা দেওয়া একটা অস্থায়ী উপাসনাগারও তৈরি করে তারা। প্রাচীনতম ধরলে সেটাই ছিল কলকাতার আদি খ্রিস্ট উপাসনালয়। কেউ কেউ বলেন, ১৬৯৩-এ চার্নকের মৃত্যুর পর জন গোল্ডসবরো সুতানুটি থেকে কুঠি তুলে পর্তুগিজদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে তাদের জায়গা দখল করে ঘাঁটি তৈরি করেন। সেই জায়গাটা হল এখনকার ডালহৌসির জিপিও এলাকা। বিতাড়িত পর্তুগিজরা খানিকটা দূরে এখনকার মুরগিহাটা অঞ্চলে চলে যায় এবং আর-একটা উপাসনালয় তৈরি করে। তবে সেটি ছিল অস্থায়ী কাঠামো। পরে ১৭৯৭-তে নতুন গির্জাভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। জেমস্ ড্রাইভারের পরিকল্পনায় তৈরি গির্জা তৈরিতে খরচ হয় নব্বই হাজার সিক্কা টাকা। পর্তুগিজ ধনী ব্যবসায়ী ব্যারেটো অনেক টাকা দান করেন ওই গির্জার জন্যে। নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলে রোসারি ভার্জিন মেরির নামে উৎসর্গ করে ১৭৯৯ সালের ২৭ নভেম্বর চার্চ খুলে দেওয়া হয়। দুদিকে দুটো মিনার, মাঝে ত্রিভুজাকৃতি চুড়ো দেওয়া এই উপাসনালয়কে কলকাতার অন্যতম সুদৃশ্য গির্জা বলা হয়। সঙ্গের ছবিতে জেমস বেইলি ফ্রেজারের আঁকা পর্তুগিজ চার্চ।
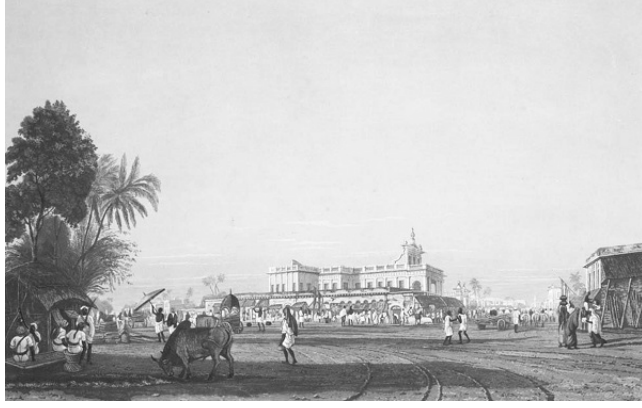
২.৭ ছ্যাকরা গাড়ি— গাড়ি টানার কাজে ঘোড়াকে নানান উপায়ে ব্যবহার করা হত। উদ্দেশ্য দ্রুতগতিতে যাতায়াত। ব্রাউনলো নামে এক সাহেব বের করলেন ‘ব্রাউনবেরি’ নামে গাড়ি। সাবেকি পালকিতেই চারটি চাকা বসিয়ে সামনে ঘোড়া জুতে দিয়ে বানিয়ে ফেললেন এক ঘোড়ায় টানা ‘ব্রাউনবেরি’ গাড়ি, ১৮২৭-এ। ব্রাউন বেরির ভাড়া ছিল প্রথম একঘণ্টায় চোদ্দো আনা, পরের প্রতি ঘণ্টায় আট আনা আর সারাদিনের জন্য নিলে চার টাকা। নানান ধরনের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সাহেবদের জন্য দামি গাড়ি, সাধারণ কর্মচারীদের জন্য আলাদা গাড়ি। নানান নামের এইসব ঘোড়ার গাড়ি। চেরট, ফিটন, ল্যান্ডো, টমটম, ছ্যাকরা গাড়ি এইরকম। অনেক বড়ো বড়ো কোম্পানি হয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করার জন্য। এক্কা গাড়ি, টমটম, ছ্যাকরা গাড়ি এসব নামগুলো প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলা বইতে লিখছেন, “আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি।” এইসব ছ্যাকরা গাড়িদের আড্ডা ছিল ধর্মতলার মোড়ে। তখন এখানে এক মস্ত পুকুর ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, “এখানে স্থূলকায় ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা সত্ত্বেও কিরূপে পরস্পরকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেন তাহা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইত।” সঙ্গে ১৮৯৫ সালে স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোং-এর ছ্যাকরা গাড়ির বিজ্ঞাপন।

STEUART & COMPANY,

(ESTABLISHED MORE THAN ONE HUNDRED YEARS.)

COACH-BUILDERS

TO

H. E. LORD ELGIN.
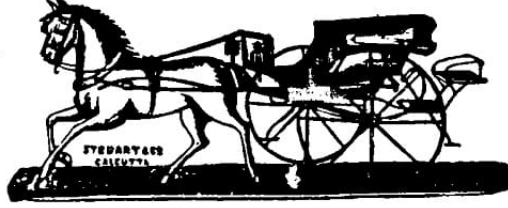
CALCUTTA.

২.৮ হেজেলিন স্নো— ১৮৮০ সালে লন্ডনে দুই আমেরিকান সাইলাস বরো এবং হেনরি ওয়েলকাম মিলে বরো ওয়েলকাম অ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন। ত্বকের যত্ন নেবার জন্য ১৮৯১ সালে উইচ হ্যাজেল গাছের রস থেকে প্রস্তুত হ্যাজেলিন তাঁরা বিক্রি করতে শুরু করেন। প্রথম বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, "Prescribed in cases of haemorrhage from the nose, lungs, womb, rectum, &c. Is a valuable agent in the treatment of bruises, sprains, inflammation, peritonitis, piles, fistula, anal fissure, ulcers, varicose veins, eczematous surfaces, tonsillitis, pharyngitis, nasal and post-nasal catarrh, stomatitis, leucorrhoea, nasal polypi, &c." এই হ্যাজেলিন ক্রিম আর স্নো একেবারে চ্যাটচ্যাটে ছিল না আর ত্বকের সুরক্ষাও দিত। এর হালকা মিষ্টি গন্ধও একে আকর্ষক করে তুলেছিল। ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায় এই হেজেলিন স্নো দারুণ জনপ্রিয় হয়। ১৯০২ সালে শ্যামাচরণ দে প্রণীত "শুশ্রূষা" বইতে তিনি লিখেছেন, "বোলতা বা ভিমরুল দংশনে দষ্ট স্থান স্ফীত বা বেদনাযুক্ত হইলে গোবর গরম করিয়া পুলটিশের ন্যায় ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শে। হেজেলিন ক্রিম (Hazeline cream) লাগাইলেও তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।" কাজী নজরুল ইসলাম নাকি খুব শৌখিন ছিলেন। স্নানের সময় ল্যাভেন্ডার গন্ধযুক্ত সাবান মাখতে ভালোবাসতেন। মুখে মাখতেন হেজেলিন-স্নো। বুদ্ধদেব বসু তাঁর তিথিডোর উপন্যাসে লিখেছেন, "শ্বেতার সামনে নামিয়ে একটু দূরে আলগোছে বসলেন খাটের উপর। মেঝেতে হাঁটু তুলে বসে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে শ্বেতা আস্তে আস্তে বের করল আলতা, সিঁদুর, পাউডার, সেন্ট, মাথার তেল, চুলের কাটা, চুলের ফিতে, সাবান, হেজলিন স্নো আর একবাক্স ডিম-সন্দেশ। কিছু বলল না, একটু দেখল তাকিয়ে, তারপর একটি একটি করে প্রত্যেকটির গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আবার তুলে রাখল সেই কাগজের বাক্সে।" সঙ্গে ১৮৯৬ সালে হেজেলিনের বিজ্ঞাপন।

২.৯ বিডন স্কোয়ার— বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বিডনের নামে এই বিডন স্কোয়ার এককালে কোম্পানির বাগান নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানটি ঐতিহাসিক। আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার চোদ্দো বছর পরে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিডন স্কোয়ার উদ্যানে (অধুনা রবীন্দ্রকানন) ডি. ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এক মহতী সভায় বন্দেমাতরম সংগীতটি গাইছেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— 'এই গীতটির একটি সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত।' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই গান শুনে মদ্রদেশীয় এক ভদ্রলোক নাকি চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। ১৯০৯ সালের ১৩ জুন এখানেই অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বিখ্যাত 'বিডন স্কোয়ার বক্তৃতা'-টি দেন। এ নিয়ে 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় লেখা হয়, "In spite of the foul weather a large number of people assembled on Sunday afternoon at Beadon Square where a big Swadeshi meeting was held under the presidency of Babu Ramananda Chatterji, Editor of the Prabasi. Several speakers addressed the meeting. We publish below an authorised version of Mr. Aurobindo Ghose's speech delivered at that meeting."

২.১০ মামার দোকান— তখন পুলিশ আর শুঁড়ি দুজনকেই 'মামা' নামে ডাকা হত। উৎস- অপরাধ জগতের ভাষা, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ১৯৭২।

২.১১ আবু হোসেন— ১৮৯৩ সালে লেখা গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা ৩ অঙ্ক ১৩ দৃশ্যের একটি হাসির নাটক। ৯টি মূল চরিত্র। প্রথম অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। মূল কাহিনি আরব্য রজনী থেকে নেওয়া। আবু হোসেন নামে এক গরিব মানুষকে এক রাতের জন্য রাজা বানিয়ে দেন বাদশা হারুন অল রসিদ। সেই এক রাতে হঠাৎ এত অর্থ আর ক্ষমতা পেয়ে আবু কী করে, তা নিয়েই এই নাটক। সেই এক রাতেই সে রাজার বাঁদি রোশনারার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়েও করে। পরদিন আবার সে আগের মতো হয়ে যায়। এই নাটকের "রাম রহিম না জুদা করো" গান এককালে মুখে মুখে ফিরত। আবুর চরিত্রে অভিনয় করতেন অভিনেতা অর্ধেন্দু মুস্তাফী। এখানে সদ্য বেতন পাওয়া কর্মচারীদের আবু হোসেনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

২.১২ দশ আনা ছ' আনা— সামনের চুল লম্বা এবং পিছনের চুল খাটো করে ছাঁটার পদ্ধতি বিশেষ।

২.১৩ ফিরিঙ্গি— পর্তুগিজ শব্দ ফ্রান্সেস (Frances) থেকেই ফিরিঙ্গি শব্দের উদ্ভব। শব্দটি দিয়ে যে-কোনো ইউরোপীয় জাতি বোঝানো হত। ইংরেজিতে ফিরিঙ্গি শব্দের চারটি বানান দেখা যায়। যেমন- feringi, firingi, feringee, feringhee। ফিরিঙ্গি শব্দের তিনটি মূল অর্থ রয়েছে। যেমন- পর্তুগিজ ও ভারতীয় মিশ্রণজাত জাতি, ইউরেশিয়ান ও খ্রিস্টান। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ফিরিঙ্গি শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হত। পরে ফিরিঙ্গি শব্দটি তুচ্ছার্থে বা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, ফরাসি franc হতে feringi, firingi, feringee, feringhee শব্দ চারটির উৎপত্তি। 'আরব ও পারসিকদিগের সঙ্গে প্যালেস্টাইন নিয়ে ধর্মযুদ্ধের (crusade) সময় ইউরোপের খ্রিস্টানগণ ফ্রাঙ্ক নামে অভিহিত হতেন। ঐ সময় সকলের বোধগম্য এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়, এর নাম ছিল Lingua Franca বা ফ্রাঙ্ক ভাষা। পারসিক বা আরবগণ শব্দটিকে ফেরঙ্গ উচ্চারণ করতেন। এ ফেরঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ ফিরিঙ্গি। পাশ্চাত্য দেশ অর্থে ফিরঙ্গ দেশ, তদ্দেশবাসি ফিরিঙ্গি।' সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যে 'ফিরঙ্গ' শব্দটি আছে। সুতরাং বলা যায়, ফিরিঙ্গি শব্দটি একেবারে নতুন নয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে 'ফিরিঙ্গি' বলতে শুধু পর্তুগিজদের বোঝানো হয়েছে। পরে ইউরোপবাসীর সঙ্গে ভারতীয়দের মিশ্রণে সৃষ্ট সংকর জাতও ফিরিঙ্গি আখ্যা পায়। ('বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গির বাচ্চা কখন রং বদলায়'- দেশে বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী)।

২.১৪ সোনাগাছি— কলকাতার তথা ভারতের বৃহত্তম পতিতাপল্লি। সোনাগাছির পথ চলা প্রথম শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। গোটা ভারতকেই তখন আস্তে আস্তে দখল করার পথে এগোচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কলকাতা তখন ব্রিটিশরাজের নয়া রাজধানী। নতুন রাজ্য শাসন করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন একদল তরুণ যুবা। তাদের বয়স কম, শরীরে তরুণ রক্ত। নতুন দেশে এসে তার জৌলুস দেখে তাঁদের তো চক্ষু চড়কগাছ। দেদার ধনদৌলতে শিগগিরই তাঁদের পকেট ভরে উঠতে লাগল। ফুর্তিতে মন দিলেন তাঁরা। বিবি-বাচ্ছা সবই তো এদিকে ইংল্যান্ডে। কী করবেন? অগত্যা এদেশি কালা নেটিভদের বিধবা মেয়েগুলোকে ধরে ধরে আনতে লাগলেন সোনাগাছিতে (তখনও অবশ্য সোনাগাছি 'সোনাগাছি' হয়নি)। কলকাতা শহরে বেশ্যাবৃত্তির বোধহয় সেই শুরু।

কেউ কেউ বলেন অবশ্য, ওই যে পুবে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ও পশ্চিমে চিৎপুর- তার মধ্যিখানের গোটা জায়গাটা নিয়ে যে বেশ্যাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, সেই জায়গাটা কিন্তু আদতে নাকি ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের। তাঁর ও স্থানীয় কয়েকজন ধনী জমিদার 'বাবু'-র উদ্যোগেই নাকি শুরু হয়েছিল সোনাগাছির ব্যবসা। সানাউল্লাহ বা সোনাগাজি নামে এক মুসলমান সাধুবাবার মাজার ছিল এখানে। তাঁর নামে তারপর একসময় জায়গাটার নাম হয় 'সোনাগাজি' ও সেই নামই আস্তে আস্তে 'সোনাগাছি' হয়ে ওঠে। কথিত আছে, প্যারিসের বিখ্যাত যৌনকর্মীরাও কলকাতার এই সোনালি অঞ্চল (Golden district)-এর খ্যাতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই সোনাগাজির প্রভাব বাংলা বটতলা সাহিত্যে কম ছিল না। ১২৮২ সালে অখিলচন্দ্র দত্ত লেখেন পয়ার ছন্দে 'সোনাগাজির খুন'। ১৮৮০ সালে 'অজ্ঞাতনামা' লেখকের হাতে রচিত হয় নাটক 'বেশ্যালীলা'। নাটকটির প্রেক্ষাপট ছিল সোনাগাছি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় অনেক সাহিত্যই লেখা হয়েছে সোনাগাছির প্রেক্ষাপটে। বর্তমানে প্রায় দশ হাজার যৌনকর্মী এখানে বাস করেন।

২.১৫ রুপোগাছি— সোনাগাছির সঙ্গে নাম মিলিয়ে গরানহাটা এলাকার পতিতাপল্লির নাম রাখা হয়েছিল রুপোগাছি। এখানের বারবনিতারা সংখ্যা ও কৌলীন্যে সোনাগাছির পরেই, তাই এই নাম। বর্তমান নাম নিমতলা স্ট্রিট।

২.১৬ এম এল সি— মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বলে স্থাপিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভা বা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ১৯২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, ডিউক অফ কনট আনুষ্ঠানিকভাবে এই সভার উদ্বোধন করেন।

২.১৭ নন কো-অপারেটর— অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী অহিংস গণ আইন অমান্য আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'গান্ধি যুগ'-এর সূত্রপাত ঘটায়।

২.১৮ কমলি কিন্তু তাঁদের ছাড়ত না— দুজন সাধু দেখলেন, গঙ্গার জলে একটা কালো কম্বল ভেসে যাচ্ছে। তাই দেখে সেটা আনার জন্য একজন গিয়ে সেই কম্বলে হাত দিয়ে যেই তুলতে গেছেন, কম্বলটা অমনি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। আসলে সেটা ছিল ভালুক। সে ভেসে যেতে যেতে আশ্রয় মনে করে সাধুকেই জড়িয়ে ধরেছে। অপর সাধুটি দেখলেন যে তিনি কম্বল নিয়ে উঠছেন না। তখন বললেন, "আরে ভেইয়া কমলি কো ছোড় দো, চলা আও।" তিনি তখন বলছেন, "ভাইয়া হাম তো কমলি কো ছোড় দেতা, লেকিন কমলি হামকো ছোড়তা নেহি।" মানে বিষয় হতে দূরে থাকতে গেলেও বিষয় তোমাকে ছেড়ে দেবে না। হিন্দি হলেও প্রবাদটি বাংলা ভাষায়ও প্রচলিত। 'বিরক্তিকর বিষয় ত্যাগ করলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়'- এমন অর্থ প্রকাশে প্রবাদটি প্রচলিত। এই গল্পটি স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বলেছিলেন।

২.১৯ চৌরঙ্গী— চৌরঙ্গী ছিল ময়দানের পুবে ছোট্ট একটা গ্রাম। একে চেরাঙ্গী বা চিরাঙ্গী-ও বলা হত। উত্তরে কলিঙ্গা, পশ্চিমে চৌরঙ্গী রোড, দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট আর পুবে ছিল সার্কুলার রোড। একে ডিহি বিরজী বলা হত। এখানে তখন গভীর জঙ্গল। বুনো শুয়োর বা বাঘের উৎপাত। সম্ভবত চৌরঙ্গী রোড শহরের প্রথম সড়কপথগুলির মধ্যে একটি, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে সড়কটি কালীঘাট ও চৌরঙ্গী গ্রামের সাথে যুক্ত ছিল। চৌরঙ্গী গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিল রহস্যময় ধর্মাবলম্বী চৌর্যঙ্গনাথের নামে, যেখানে তাঁর ঘাঁটি বা ডেরা ছিল। ইংরেজ শাসন সত্ত্বেও এই নামটি থেকে যায় এবং ভারতের স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকারের শাসনের সময় পরিবর্তিত হয়। অনেকে অবশ্য এঁর নাম জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী বলেন। উনিশ শতক অবধি তাঁর স্থাপিত ভাঙাচোরা মন্দিরটি দেখা যেত। ‘কলিকাতা সেকালের ও একালের’ বইতে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “এখন যে চৌরঙ্গী-সাহেবী-কোয়াটার, কলিকাতা নগরীর মুকুটমণি, আগে তাহা বনজঙ্গল সমাচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এই গ্রাম ও তাহার আশেপাশের স্থানগুলি গভীর জঙ্গলপূর্ণ ছিল। দিনের বেলায় লোকে সাহস করিয়া গোবিন্দপুর বা সুতানুটি যাইতে পারিত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে, বা গভীর রাত্রে ডাকাতের ভয়ে কেহই চৌরঙ্গীর এ জঙ্গল পার হইত না। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী নামক এক সন্ন্যাসী এই জঙ্গলে বাস করিতেন। তাঁহার নাম হইতেই এই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম চৌরঙ্গী হইয়াছিল। জঙ্গলগিরি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি। চৌরঙ্গী একটা গ্রামের বা স্থানের নাম। এই গ্রামের নাম হইতেই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। ১৭১৪ খৃঃ অব্দেও চৌরঙ্গীর নাম শোনা যায়। হলওয়েল সাহেবও চৌরঙ্গীর রাস্তাকে ‘কালীঘাটের রাস্তা’ ‘Road to Colligot’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজ কাল যাহা বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও সেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট যেখানে ধৰ্ম্মতলায় মিশিয়াছে, তাহা ইংরাজদের কলিকাতার আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই একটা সরু রাস্তা ছিল। এই সরু রাস্তার দুই ধারে গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গল মধ্যবর্তী পথ দিয়াই, যাত্রীগণ চিত্তেশ্বরীর মন্দির হইতে কালীঘাটে যাইত। পুরাতন ম্যাপ, সমূহে চৌরঙ্গ একটা স্থানের নাম বলিয়াই উল্লিখিত। পরে এই চৌরঙ্গী নাম, রাস্তাকে দান করা হইয়াছে।

সেকালের চৌরঙ্গীর কথা এস্থলে একটু বলা প্রয়োজন। অনেকের মতে, জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী হইতেই, এই চৌরঙ্গী নাম হইয়াছে। দলগিরি চৌরঙ্গীর প্রবাদ, কেহ বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন— কেহ বা অনাস্থা প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন— জঙ্গলগিরি বর্তমান কালীমূর্তির মুখের প্রস্তরখানি কুড়াইয়া পান। পোস্তা হইতে কালীগ্নি অংশভুক্ত যে প্রস্তরখণ্ড কাপালিকগণ কর্তৃক গভীর জঙ্গল মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল— একটা প্রবাদ মতে চৌরঙ্গী সন্ন্যাসীর আবিষ্কৃত মুখপ্রস্তরখানি তাহা বই আর কিছুই নহে। হঠ-প্রদীপ গ্রন্থে চৌরঙ্গীগিরির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলসন সাহেবও তাঁহার ‘হিন্দুধৰ্ম্ম সম্প্রদায়’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন— ‘আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গী, ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য ও ভক্ত কবীরের সমকালবৰ্ত্তী। এই কবীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা সম্যক রূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল।’ ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে সম্ভবতঃ শেঠ-বসাকের গোবিন্দপুরে আগমন করেন। বাবু গৌরদাস বসাকের মতে—দশনামা শৈবসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীগিরি, সশিষ্য গঙ্গাসাগর যাইতেছিলেন। গঙ্গাতীরে কালীর প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত ইষ্টয়, উক্তস্থানে কুটীর বাধিয়া পূজা প্ৰবৰ্ত্তন করেন। কিয়ংকাল পরে জঙ্গলগিরি নামক তাঁহার এক শিষ্যের হস্তে কালীপূজার ভার দিয়া তিনি গঙ্গাসাগরে চলিয়া যান। প্রস্তর-ফলক প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই, যে চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী একদিন দেখিতে পাইলেন, যে গভীর বনমধ্যে একটা নির্জন স্থানে এক পয়স্বিনী গাভী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বাঁট চইতে অজস্র দুগ্ধধারা নিম্নস্থ একটা স্থানের উপর পড়িতেছে। ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, সন্ন্যাসী সেই স্থান খনন করিতে করিতে কালীর প্রস্তরময় মুখ প্রাপ্ত হন। উহাই কালীঘাটের কালীমন্দিরের মাতৃমূর্তি।”

১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশরা ফোর্ট এলাকার বাইরে তাদের বসতি সম্প্রসারণ শুরু করে, চৌরঙ্গীর চারপাশের এলাকাটি প্রথম সম্প্রচারের একটি অংশ এবং ১৯৪৭ সালে তাদের প্রস্থান পর্যন্ত একই এলাকা তাদের গর্ব ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। চৌরঙ্গী এলাকার ব্রিটিশ উন্নয়নকালে প্রায়শই তারা রাস্তার পূর্বপাশে বিশাল বাংলো এবং ঘর নির্মাণ করে, এইভাবে কলকাতা নগরটি পরিণত হয় প্রাসাদনগরীতে। এই সময়টি ছিল কলকাতার একটি চমৎকার যুগ এবং এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শহর হয়ে উঠেছিল। সড়কটির পশ্চিম প্রান্ত বরাবর বাগান এলাকা দ্বারা গঠিত এবং বিশাল প্রাসাদের সারি সহ একটি বিশাল খোলা এলাকা, যাকে বলা হয় ময়দান। ফোর্ট উইলিয়ামের নিরাপত্তার কারণে ময়দানে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা এলাকা তৈরি করা হয়েছিল এবং এলাকাটি উন্নয়নমুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের পশ্চিম দিকের

অংশ (এখন এক্সাইড ক্রসিং) থেকে এসপ্ল্যানেডের কার্জন পার্ক পর্যন্ত রাস্তাটির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র একটি এখন বিদ্যমান- মনোহরদাস তড়াগ, পার্ক স্ট্রিট এবং চৌরঙ্গীর জংশনে রয়েছে। পুনরুদ্ধারকৃত জলাধারগুলির মধ্যে একটি ছিল যেখানে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টার এবং ময়দান পুলিশ স্টেশন এখন দাঁড়িয়ে আছে, অন্য আর-একটি স্থান যেখানে মেট্রো স্টেশন এখন দাঁড়িয়েছে, এবং যেখানে এখনও এসপ্ল্যানেড বাস-টার্মিনাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তৃতীয়টি ছিল। বর্তমানে রাস্তার সৌন্দর্য আর নেই এবং কেবলমাত্র যুগ যুগের অঙ্কন এবং স্কেচ দেখতে পাওয়া যাবে। ট্রামের আবির্ভাবের ফলে, টালিগঞ্জের সঙ্গে এসপ্ল্যানেডের সংযোগ স্থাপনের জন্য চৌরঙ্গীর পশ্চিম প্রান্ত বরাবর ট্রাম ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছিল। এই ট্র্যাকগুলিও বর্তমানে আর নেই। সঙ্গের ছবিটি ১৮৭০ সালে বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডের তোলা চৌরঙ্গী রোডের।

২.২০ কার্জন পার্ক— রাণী রাসমণি রোডের ঠিক গায়েই অবস্থিত সুরেন্দ্রনাথ পার্ক আগে কার্জন পার্ক নামে পরিচিত ছিল। ১৮৩৬-৪২ অবধি ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড অকল্যান্ড। তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত এই পার্ক। কার্জন পার্কের ভাষা উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে শহরের একটি উল্লেখযোগ্য 'হেরিটেজ' স্থাপত্য, পানিঅটি ফাউন্টেন। জয়পুর মার্বেলে তৈরি এই সৌধটি তৈরি হয়েছিল ১৮৯৮ সালে, তদানীন্তন ভাইসরয়ের সচিব দেমেত্রিউস পানিঅটির স্মরণে। এই পানিঅটি ছিলেন গ্রিক; চার পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারের অনেকেই ছিলেন কলকাতাবাসী। 'পরশপাথর' ছবিতে পরেশবাবুর ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তীকে দেখা গিয়েছিল বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে ওই সৌধের নিচে আশ্রয় নিতে। শংকরের 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের শুরুও এই পার্কে, "ওরা বলে— এসপ্ল্যানেড্। আমরা বলি— চৌরঙ্গী। সেই চৌরঙ্গীরই কার্জন পার্ক। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত শরীরটা যখন আর নড়তে চাইছিল না, তখন ওইখানেই আশ্রয় মিলল। ইতিহাসের মহামান্য কার্জন সায়েব বাংলাদেশের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন। সুজলা সুফলা এই দেশটাকে কেটে দুভাগ করবার বুদ্ধি যেদিন তার মাথায় এসেছিল, আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নাকি সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগেকার কথা। বিশ শতকের এই মধ্যাহ্নে মে মাসের রৌদ্রদগ্ধ কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আমি ইতিহাসের বহুধিকৃত সেই প্রতিভাদীপ্ত ইংরেজ রাজপুরুষকে প্রণাম করলাম; তাঁর পরলোকগত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করলাম। আর প্রণাম করলাম রায় হরিরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর কে টি, সি আই ই-কে। তাঁর পায়ের গোড়ায় লেখা- Born June 3, 1862. Died February 28, 1935." সঙ্গে ১৯০২ সালে তোলা কার্জন পার্ক।

২.২১ ইডেন গার্ডেন— ইংরেজ পার্ক কালচারের একটি যদি হয় কার্জন পার্ক, তবে অপরটি অবশ্যই ইডেন গার্ডেন। এর ইতিহাসের শুরু ভারতের গভর্নর জেনারেল, মানে বড়োলাট অকল্যান্ডের সময়ে। তিনি ১৮৩৬ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ছিলেন এ দেশে। তাঁরা ছিলেন ১৪ জন ভাইবোন। তাঁর দুই বোন এমিলি ও ফ্যানি ভারতে এসে বেশ কিছুদিন ভাইয়ের কাছে ছিলেন। তখন কোম্পানি আমল, ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। স্বভাবতই তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন। ছোটো থেকেই বাগানের খুব শখ ছিল এমিলির, তাঁর ইচ্ছাতেই শুরু হয় বাগান তৈরির কাজ। স্থপতি ক্যাপ্টেন ফিটজেরাল্ড তাঁদের ভাবনা বাস্তবায়িত করেন। ১৮৪০ সালেই তৈরি হয়ে যায় অকল্যান্ড সার্কাস গার্ডেন, পরে অবশ্য নাম বদলে তা করা হয় ইডেন গার্ডেন্স।

লর্ড অকল্যান্ডের আসল নাম জর্জ ইডেন, তিনি ছিলেন অকল্যান্ডের প্রথম আর্ল, তাই তিনি লর্ড অকল্যান্ড নামেই খ্যাত। তাঁর বাবার নাম উইলিয়াম ইডেন। কলকাতা হাইকোর্টের অদূরে ও ক্রিকেট মাঠ ইডেন গার্ডেন লাগোয়া এই উদ্যানে লোকের আনাগোনা নেই বললেই চলে। বাগান খোলা থাকে দুপুরে, তখন ভিতরে ঘুরে বেড়াতে বাধা নেই। প্যাগোডার দুপাশে একটি করে জলাশয় আছে, অত্যন্ত মনোরম। প্যাগোডা থেকে একটি জলাশয়ে যাওয়ার পথে বর্মা মুলুক থেকে আনা মূর্তি সাজানো হয়েছে। তাজং স্টাইলে তৈরি এই সদ্যসমাপ্ত প্যাগোডাটি লর্ড ডালহৌসির চোখে পড়ে যখন তিনি প্রোম শহর দখল করেন। এমন সুন্দর কারুকাজ করা স্থাপত্য তো রাজধানীর বুকেই মানায়! ডালহৌসির নির্দেশেই সেই স্থাপত্য খুলে ফেলে কলকাতায় আনা হল এবং পুনর্নির্মাণ করা হল। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ামে খণ্ডাংশগুলি রাখা ছিল, তারপরে বর্মা মুলুক থেকে আনা কারিগররা এটি স্থাপন করেন ইডেন গার্ডেনের ভিতরে। মূল প্যাগোডাটি তৈরি হয়েছিল ১৮৫২ সাল নাগাদ, প্রোমের প্রয়াত শাসক মং হননের স্ত্রী মা কিন এটি স্থাপন করিয়েছিলেন। খরচ পড়েছিল তৎকালীন সময়ে দেড় হাজার টাকা। বাগানের ভিতরে একটি নহবতখানাও রয়েছে। তবে পুরোনো কলকাতার নহবতখানার মতো এখানে সানাই বাজত কি না জানা নেই, সম্ভবত পাশ্চাত্য সংগীতের আসরই এখানে বসত। রয়েছে একটি সুন্দর ফোয়ারাও।

১৮৬৪ সালে, এই স্থানে, আজকের ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত, ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ও ফুটবল দুটোই খেলা হত। ১৯৩৪ সালে, এই স্টেডিয়ামে প্রথমবারের জন্য টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয় ও ১৯৮৭ সালে, এই স্টেডিয়ামে প্রথমবার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়। এই স্টেডিয়ামে প্রথম কোনও বড়ো ফুটবল ম্যাচ খেলা হয় ১৯৬৭ সালে, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে। সঙ্গে ১৮৬০ সালে তোলা ইডেন গার্ডেনের ছবি।

২.২২ গড়ের মাঠ— কলকাতা রেড রোডের পাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ‘কলকাতা ময়দান’। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে হারানোর পর এই অঞ্চলে তৈরি করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। এই দুর্গ রক্ষার্থেই দুর্গের

আশেপাশের অঞ্চলের জঙ্গল কেটে তৈরি হয় এই বিশাল মাঠ। এটা ছিল 'ফোর্ট উইলিয়াম'-এর সম্পত্তি।' ফোর্ট' শব্দটির বাংলা শব্দ 'দুর্গ' এবং এর প্রতিশব্দ 'গড়' থেকেই এই মাঠের নাম হয় 'গড়ের মাঠ'। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের এক বছর পর ১৭৫৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুর গ্রামের কেন্দ্রস্থলে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণকার্য শুরু করে। উক্ত গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং তালতলা, কুমারটুলি ও শোভাবাজার অঞ্চলে জমি দেওয়া হয়। ১৭৭৭ সালে দুর্গনির্মাণের কাজ শেষ হয়। "যে ব্যাঘ্র-সংকুল জঙ্গলটি চৌরঙ্গী গ্রাম থেকে নদীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেই জঙ্গলটি কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এরই ফলে কলকাতার গৌরব ময়দানের বিস্তৃর্ণ তৃণক্ষেত্রটির সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত প্রাঙ্গণের উদ্ভব এবং দক্ষিণের বসতি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা খালটি বুজিয়ে দেওয়ার ফলে ইউরোপীয় বাসিন্দারা দুর্গের আবদ্ধ সংকীর্ণ পরিমণ্ডল পরিত্যাগ করতে শুরু করেন। অবশ্য ১৭৪৬ সাল থেকেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসিন্দাদের সরে আসা শুরু হয়েছিল।" (কটন, ১৯০৯)

১৯০৯ সালে এইচ. ই. এ. কটন আরও লিখেছেন, "The great Maidan presents a most refreshing appearance to the eye, the heavy night dew, even in the hot season, keeping the grass green. Many of the fine trees with which it was once studded were blown down in the cyclone of 1864. But they have not been allowed to remain without successors, and the handsome avenues across the Maidan still constitute the chief glory of Calcutta. Dotting the wide expanse are a number of fine tanks, from which the inhabitants were content in former days to obtain their water-supply."

১৮৫৯ সালে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলে রক্ষণশীল কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখেন:

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,

এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;

আর কিছুদিন থাক রে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,

আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

এর কিছুকাল পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীকে ময়দানে নিয়ে গিয়ে অশ্বচালনা শিক্ষা দেন। এতে বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলতায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং বাঙালি সমাজে এক অভূতপূর্ব সংস্কার সাধিত হয়। ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজ সেনারা ময়দানে বাঙালি ছেলেদের দেখলেই লাথি মারত। বাঙালিরা এতটাই ভীরুস্বভাবের ছিল যে এর কোনও প্রতিবাদই করত না। সরলা দেবী চৌধুরানী এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি দুর্গাপূজায় বীরাষ্টমী ব্রতের সূচনা করেন। এই ব্রতে যুবকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শপথ নিতে হত। এই ঘটনা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। টেনিদা তো গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ান।

ময়দানে একাধিক ক্ষুদ্রাকার সবুজ বাংলো অবস্থিত। এগুলি বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। খেলাধুলোর জন্য ময়দানে ছোটো ছোটো খেলার মাঠও রয়েছে। বড়ো বড়ো ক্লাবগুলির নিজস্ব মাঠ কাঠের গ্যালারি দিয়ে বাঁধানো। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানের প্রধান ক্রীড়াসংস্থা। এ ছাড়াও

অনেক ছোটো ক্লাবের তাঁবুও ময়দানে অবস্থিত। ১৯০১ সালে জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান বায়োস্কোপ নিয়ে এলে ময়দানে একটি তাঁবুতে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। পরে ম্যাডান বায়োস্কোপ নামে একটি ছবিঘর খোলেন। এই ম্যাডান-ই পরবর্তীকালে এনফিলস্টোন বায়োস্কোপ নাম নেয়। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবির শ্যুটিং-ও ময়দানে হয়েছে। এমনকি তাঁর শেষ ছবি "আগন্তুক"-এও এই গড়ের মাঠকে দেখতে পাই।

২.২৩ ঘোড়দৌড়ের মাঠ— এই মাঠ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রেসকোর্স (১৮১২ সালে) এবং এখনও পোলোর সঙ্গে সমকালীন ভারতে অশ্বারোহী কার্যকলাপের বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কলকাতার রেসকোর্স ভারতের এক বৃহত্তম রেসকোর্স। ভারতে হর্স রেসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল ব্রিটিশ আমলে। প্রথম ঘোড়ার দৌড় শুরু হল মাদ্রাজে, সালটা ১৭৭৭। আর ১৭৯৯ সাল নাগাদ ঘোড়ার দৌড়ের জন্য তৈরি করা হল আলাদা রেস ট্র্যাক। ১৮০০ সালে বোম্বাইতে চার্লস ফোবস, জি হল প্রমুখেরা মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন বোম্বাই টার্ফ ক্লাবের। ১৮১৯ সালে পুনেতে প্রথমবারের মতো ঘোড়ার দৌড় আয়োজন করা হয়েছিল। বাঙ্গালোর টার্ফ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা অবশ্য অনেকটাই দেরিতে, ১৯২০ সাল নাগাদ। ১৮৪৬ সাল নাগাদ আগা খানের পরিবারে ছিলেন তখনকার দিনে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত একাধিক ঘোড়সওয়ার, যাঁরা ভাইসরয় কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন। ইন্দোরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ নিজেই ছিলেন তৎকালীন যুগে দেশের বিখ্যাত ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে একজন।

পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই বাংলায় ইংরেজদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেনাবাহিনীর জন্য বেস ক্যাম্পও তৈরি করা হয়। এই সেনাবাহিনী অবসর সময়ে বিনোদনের জন্য ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। কলকাতার নিকটে আকরা নামক জায়গায় মোটামুটিভাবে ১৭৬৯ সালের জানুয়ারি নাগাদ একটা ঘোড়ার দৌড় আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু এটা ছিল শুধুমাত্র খেলার ছলে। এরপর এইভাবেই প্রায় চার দশক ধরে হর্স রেস চলতে থাকল, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকল। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় এলেন গর্ভনর জেনারেল হয়ে। ১৭৯৮ সাল নাগাদ পশুপ্রেমী ওয়েলসলি ঘোড়ার দৌড়ের যবনিকা টানলেন। বন্ধ হল ঘোড়ার দৌড়। কিন্তু বন্ধ বললেই কি বন্ধ করা যায়? খেলাপ্রেমী মানুষের কাছ থেকে খেলা কেড়ে নেওয়া কি অতই সহজ ব্যাপার? না। ১৮০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হল বেঙ্গল জকি ক্লাব এবং এরা নিজেদের অনুশীলনের জন্য ময়দান চত্বরটা বেছে নিল। বেঙ্গল জকি ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইংল্যান্ডের জকি ক্লাবের। ১৮১২ সাল নাগাদ নতুনভাবে রেসকোর্স গড়ে তোলা হল বর্তমান রেসকোর্সের জায়গাতেই। কিন্তু কলকাতার রেসের ক্ষেত্রে সবথেকে যুগান্তকারী ঘটনা সম্ভবত তখনই হল, যখন প্রতিষ্ঠা করা হল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব। সালটা ১৮৪৭, ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক একশো বছর আগে। পাঁচ কমিটির সদস্য ক্লাব পরিচালনা করার দায়িত্বে ছিলেন। আর রেস তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন পাঁচজন স্টুয়ার্ড। এখনও পর্যন্ত অবশ্য এই স্টুয়ার্ডরাই রেস পরিচালনা করে আসছেন। ১৮৫৬ সালে ক্যালকাটা ডার্বি বন্ধ করে চালু করা হল ভাইসরয় কাপ। তখন এই কাপ দেখার সুযোগ পেতেন শুধুমাত্র তাঁরাই, যাঁদের আমন্ত্রণ করা হত। কিন্তু কলকাতায় হর্স রেসের এক ব্যাপক পরিবর্তন হল ১৮৬০ সাল নাগাদ। লর্ড উলরিখ ব্রাউন, অনেকের কাছেই এই নামটা অজানা। তৎকালীন সময়ে তিনি ছিলেন আইসিএস অফিসার। যাঁর একার উদ্যোগে কলকাতায় ঘোড়ার দৌড় এক অন্য মাত্রা লাভ করল। ১৮৭২ সাল নাগাদ প্রথমবার টোটে উপস্থাপিত করা হল এবং সেই বছরই প্রথম

মনসুন রেসও চালু হল। ১৮৮০ সাল থেকে সকালের বদলে দুপুরে রেস করার সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ আর তার সঙ্গে সেই বছরই প্রথমবারের মতো পোলো খেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্যর উইলিয়াম ম্যাকফেরসন, রেসের মাঠে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

সালটা ১৮৮৯, ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের অধীনে চলে এল নয় নয় করে দেশের প্রায় বাহান্নটি রেসের মাঠ। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের রেসের মাঠগুলো দেখাশোনা করত বোম্বাই টার্ফ ক্লাব। ইতিমধ্যে ভারতীয়দের জন্যও খুলে দেওয়া হয়েছিল রেসের মাঠের দরজা। ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের মুকুটে আরও একটি স্বর্ণপালক যুক্ত হল ১৯০৫ সালে, যখন ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ প্রথমবারের মতো ক্লাবে এলেন। এর ঠিক বছর সাতেক পরে ১৯১২ সালে আবার রানি মেরিকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে এসেছিলেন রাজা স্বয়ং। আর সেই বছরই ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের নামের আগে যুক্ত হল ‘রয়্যাল’ শব্দটি। ক্লাবের নতুন নাম হল ‘রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব’। এরপর সময় গড়িয়েছে নিজের গতিতে। দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে, রেসের মাঠেরও উত্থান-পতন ঘটেছে। প্রথমদিকে অবশ্য সমাজের এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোড়ার রেস জনপ্রিয় ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন হয়েছে। কথায় আছে, কলকাতার অলিতে গলিতে ইতিহাস রয়েছে, আর এই রেসের মাঠ তো ইতিহাসের আঁতুড়ঘর। রেসের মাঠে গেলে আপনার ইচ্ছে করবেই ঘোড়ার উপর বাজি ধরতে। যদি এমনটা হয়, আপনার মন সায় দিল না বাজি ধরতে, তখন? তখন নাহয় রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে ইতিহাসের গন্ধ মাখা সুবর্ণ অতীতটা অনুভব। না, কলকাতা রেসকোর্স দুশো বছরেও বুড়ো হয়নি, চাকচিক্য কিছু কমলেও, রেসকোর্স তার নীরব ইতিহাস আর আভিজাত্য আজও বহন করে চলেছে মাত্র। বাংলা সিনেমায় ‘শুধু একটি বছর’, বা সত্যজিতের ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতে রেসকোর্সকে দেখা গেছে। কেসের ব্যাপারে স্বয়ং ফেলুদাকেও রেসের মাঠে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে ১৮৬০ সালে ভাইসরয় কাপের দিন তোলা রেসকোর্সের ছবি।

২.২৪ বিধি ডাগর আঁখি—

সম্পূর্ণ গান

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল

সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥

দুটি অতুল পদতলে রাতুল শতদল

জানি না কী লাগিয়া পরশে ধরাতল,

মাটির ‘পরে তার করুণা মাটি হল— সে পদ মোর পথে চলিবে না?

তব কণ্ঠ ‘পরে হয়ে দিশাহারা

বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।

যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম

নীরবে অতি ধীরে ভ্রমরগীতিসম

দু কথা বল যদি 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম', তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।

হাসিতে সুধানদী উছলে নিরবধি,

নয়নে ভরি উঠে অমৃতমহোদধি—

এত সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি আমারি তৃষাটুকু পুরাবে না॥

রাগ: ভৈরবীতাল: ত্রিতালরচনাকাল (বঙ্গাব্দ): ১০ আশ্বিন, ১৩০৪রচনাকাল (খ্রিস্টাব্দ): ১৮৯৭

পর্যায়- প্রেম ও প্রকৃতি

২.২৫ গ্যাঁড়াতলা— কলুটোলার পাশের রাস্তা। জলধর সেনের স্মৃতিতর্পণ-এ এই জায়গার গোটা মানচিত্র পাই। "এক দিন রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার সময় উপেনদাদা সেই বারান্দায় বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি 'হিতবাদী' আপিসের দিকে পড়লো। তিনি দেখলেন– আমি একলা বসে কী লেখাপড়া করছি। তখনই লোক পাঠিয়ে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেবেনদাদা তখন সেই বারান্দায় বসেছিলেন। আমি যেতেই উপেনদাদা বল্লেন– জলধর, তুমি এখনও বাড়ী যাওনি। আমি বললাম – এখনো ত সময় হয় নি, আমি ১২/১টার কমে যাইনে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন– রাত ১২/১টা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাক? আর তার পর? এই গ্যাঁড়াতলা দিয়ে বাসায় যাও? ভয় করে না? আমি বিনীতভাবে বললাম– অনেক দিনই রাত্রে অনাহারে কাটাতে হয় দাদা। আর, পথের কথা যা বলছেন,- আমি গ্যাঁড়াতলা দিয়ে যাইনে, বরাবর কলুটোলা দিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে কলেজ স্ট্রীট ও সেখান থেকে বরাবর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে হেদোয় যাই।"

২.২৬ মেছোবাজার স্ট্রীটের— বুদ্ধদেব বসু তাঁর "যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন" গল্পে এই জায়গার কথা বলেছেন, "আমি তখন আমহার্স্ট স্ট্রিট-এর সেই মেসটায় থাকি। সেই যে বাসি পাউরুটির রংয়ের তে-তলা লম্বা বাড়িটা;— মেছোবাজার আর আমহার্স্ট স্ট্রিট-এর মোড়ের কাছাকাছি; একটু এগুলেই সেন্ট পলস স্কুল.."। লেডি অবলা বসু তাঁদের নিজস্ব জলিবোট বেয়ে চন্দননগর থেকে প্রায় প্রতিদিন বিকালে নৈহাটি ঘাটে যেতেন জগদীশচন্দ্রকে আনতে। তাঁদের বিয়ের প্রথম বছরটি এভাবেই কেটে যায়। এরপর চন্দননগর থেকে তিনি চলে আসেন মেছোবাজার স্ট্রিটে। বোন সুর্বণপ্রভা বসুর সঙ্গে শেয়ারে বাসা ভাড়া নেন। এই বাড়ির সামনে ছিল বাগান, খেলার মাঠ ও পুকুর। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত তাঁরা এই বাড়িতে ছিলেন। পরে ইন্টালির কনভেন্ট রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নেন।

ফেলুদার সোনার কেল্লায় মক্কেল সুধীর ধরের বাড়ি ছিল সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রিট, রাস্তার ওপরেই।

তৃতীয় দৃশ্য : চীনেপাড়া

৩.১ চীনেপাড়া—

"যাহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে, এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার একদিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়ওয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্যদিকে খোলার বস্তি, ও তৃতীয় দিকে তীর্যকচক্ষু পিতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ।"— সত্যান্বেষী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে কথা। ইটালিয়ান সাহিত্যিক ক্যাসানোভার প্রিয় বন্ধু ছিলেন এদোয়ার্দো তেরিত্তি। কিন্তু বিধি বাম, তাঁকে দেশছাড়া হতে হল রাজনৈতিক কারণে। নানান জায়গাতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলেন এই কলকাতায়। সুপারিন্টেনডেন্ট অফ স্ট্রিটস অ্যান্ড বিল্ডিং-এর চাকরি জুটিয়ে ফেললেন তিনি! আর সেই টাকায় কিনে ফেললেন একটা গোটা বাজার। নাম দিলেন তেরিত্তিবাজার, যা আজকের টেরিটিবাজার। আর বিয়ে করে ফেললেন এক ফরাসি কাউন্টের মেয়ে, পরমাসুন্দরী এঞ্জেলিকাকে। অগাধ পয়সা আর সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী... আর কী চাই!

কিন্তু এখানেও বিধি বাম! দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল বাজার, আর ১৭৯৬ সালে মারা গেলেন এঞ্জেলিকা। প্রথমে শিয়ালদা বৈঠকখানার এক পর্তুগিজ কবরখানায় ওঁকে কবর দেবার পরে, ওখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তেরিত্তির বিবাদ হওয়ায়, সেই কবর তিনি তুলে নিয়ে আসেন, নিজের কেনা জমিতে কবর দেন। প্রতিষ্ঠা হয় তেরিত্তি কবরখানা বা ফ্রেঞ্চ বেরিয়াল গ্রাউন্ডের। সাউথ পার্ক কবরখানার কোনাকুনি ছিল এই কবরখানা, যা সবার জন্য খোলা ছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত ছিল প্রায় একশো আটজন। আজকের তারিখে, সেই কবরখানার কোনও অস্তিত্ব নেই। বহুদিন আগেই তার লিজ শেষ হয়ে যাওয়ায়, সেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু বাড়ি। এরপর থেকে তেরিত্তি সাহেবের আর-কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি দেশে চলে গেছিলেন।

একসময় ব্রিটিশরা এখান থেকে প্রচুর আফিম রপ্তানি করত চিনে। সেই সূত্র, আর বাণিজ্যের সূত্রে কলকাতায় চিনেরা আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে টং আছু-র নাম উল্লেখযোগ্য, যাকে কলকাতার একজন চীনে শিল্পপতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বজবজের কাছের যে অছিপুর জায়গাটা, সেটা তো ওঁর নামেই! ধীরে ধীরে তারা ছড়িয়ে পড়ে ট্যাংরা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর এই টেরিটিবাজারের অঞ্চলে।

সেকালের টেরিটি আর একালের টেরিটির মধ্যে অনেক তফাত। এখন এই জায়গাটা একটা ট্রান্সপোর্ট হাব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, এখানে হিন্দু মুসলিম ও চীনারা মিলেমিশে থাকত। বেশির ভাগ বাড়িগুলোর মালিকানা ছিল বাঙালিদের। আর এই পাড়াতে বাঙালি মেস ছিল অনেক। এরকম একটা মেস থেকেই তো সূত্রপাত ব্যোমকেশের প্রথম গল্পের! রাস্তার ধারে প্রচুর চিনে দোকান, অনেক চীনে রেস্তোরাঁ, আর সকালে রাস্তার ধারে বসা চীনে ব্রেকফাস্ট! এখন সেই বাড়িগুলোর মালিকানা বেশির ভাগ চলে গেছে অবাঙালি মুসলিমদের হাতে, আর ট্রান্সপোর্ট হাব হবার জন্য রাস্তাঘাট হয়ে উঠেছে নোংরা। এ পাড়ায় এখন নতুন প্রজন্মের চীনেদের দেখাই যায় না। হয় তারা কলকাতার অন্য জায়গায় চলে গেছে, নাহয় পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। এখানে রয়েছে শুধু কিছু চীনে বুড়ো-বুড়ি, তাদের পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে। হাতে গোনা কয়েকটা চীনে দোকান আর রেস্তোরাঁ দেখা যায় এখন। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস এখনও রয়েছে, সেটা হল চীনে ব্রেকফাস্ট। সকাল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিক্রি হয়। সংখ্যাতে অনেক কমে গেলেও, নিজেদের এই ব্রেকফাস্টের কালচারটা তারা ধরে রেখেছে।

৩.২ চণ্ডুখোরের আস্তানা— চণ্ডু হল আফিং থেকে প্রস্তুত মাদকবিশেষ। হুতোমের আমলে যুবকরা বেশ্যাসক্ত ছিলেন, কিন্তু মদ্যপান করতেন না, গাঁজা, চরস বা আফিম খেতেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে পুরোনো নেশা চণ্ডু, গুলি, আফিম বা কালাচাঁদ, তড়িতানন্দ বা গাঁজা বিদায় নিল নতুন জাতে ওঠা অভিজাতদের কাছ থেকে। আগে নেশাখোর বোঝাতে 'গুলিখোর', 'গাঁজাখোর', 'চণ্ডুখোর', 'আফিমখোর', প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হত। ইংরেজিশিক্ষিতদের কল্যাণে জন্ম হল নতুন শব্দ 'মদখোর'।
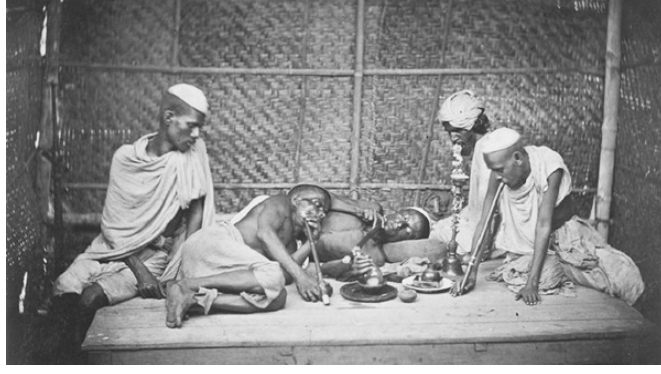
চণ্ডু তৈরি করতে দুখানা চকচকে মাজা সরা লাগত। মিঠে আঁচে সরা চড়িয়ে তাতে আফিম গলিয়ে নিতে হত। আফিম টলটলে হয়ে গেলে আর-একখানা মাজা সরায় ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। সেই ছাঁকা তরলের সঙ্গে কচি পেয়ারাপাতা মিশিয়ে যখন বেশ ঘন কাই হয়ে যাবে, সেটিকে আবার ছেঁকে ছোটো ছোটো গুলি পাকাতে হবে অল্প গরম থাকতে থাকতে। এরপর সেটা চলে যেত আড্ডায়। আড্ডায় আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী চণ্ডুখোরদের সুবিধার তারতম্য হত। যারা কম পয়সার খাবে, তাদের বসার একটা পিঁড়ে আর ঠেস দেবার একটা পিঁড়ে। একটু বেশি পয়সা হলে ঠেস দিতে বালিশ। আরও বেশি হলে বসার জন্য তুলোভরা তোশক আর ঠেস দেবার জন্য বড়ো মাথার বালিশ। সবটাই তেলচিটচিটে।

চণ্ডু টানতে হত পাইপ দিয়ে। পাইপের একটা দিক লম্বা আর অন্যদিক তিনটে প্যাঁচ খেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এই মুখটা একটা ছোটো কলকের মতো। এখানে চণ্ডুর গুলি পুরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। যিনি গুলি খাবেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে টান মেরেই ঘুরে পড়বেন। তখন আড্ডার লোকেরা চিনির জলে ভেজানো শোলার টুকরো তাঁর মুখে গুঁজে দেবেন। একটু বেশি পয়সা দিলে তিনি পাবেন বাতাসা, আর সবচেয়ে বেশি পয়সার খদ্দেররা পাবেন রসমুন্ডি। নেশা করে উঠে দাঁড়াতে দেড় দুই ঘণ্টা তো লাগতই। সঙ্গের ছবিতে ১৮৯২ সালে তোলা চণ্ডুখোরের আস্তানা।

৩.৩ দুটো কাঠি দিয়ে— চপস্টিক। চিনের এক উপকথা থেকে জানা যায়, গরম খাবার সহজে মুখে পুরে দেওয়ার জন্যই নাকি প্রাচীন এক ব্যক্তির মাথা থেকে এসেছিল এই চপস্টিকের ধারণা। উপকথা অনুযায়ী, একবার একজন লোকের নাকি খুব খিদে পেয়েছিল। অথচ, তাঁর জন্য রান্না করা মাংস ছিল বেজায় গরম। কাজেই, গরম পাত্র থেকে মাংস তুলে মুখে দেওয়ার জন্য তিনি বেছে নেন সরু দুটো কাঠি। তারপর সেই কাঠি দিয়ে মাংস তুলে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে খুব দ্রুত খাওয়া শেষ করেন তিনি। আর এ থেকেই এতদঞ্চলের লোকেদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে চপস্টিক।

আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই চপস্টিকের ব্যবহার পরিচিত হয়ে ওঠে বৃহত্তর চিন থেকে শুরু করে মঙ্গোলিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। মজার বিষয় হলে, আমাদের কাছে কিংবা ইংরেজিতে যে বস্তুটি চপস্টিক নামে পরিচিত, জাপানে সেই চপস্টিককেই বলা হয় 'হাসি', যার অর্থ হল সাঁকো। চপস্টিক খাবার পেট আর মুখের মাঝে সাঁকোর মতো কাজ করে বলেই এমন নাম। অন্যদিকে চিনে এর প্রচলিত নাম হল 'কু আই-জি' বা চটপটে বন্ধু। চপস্টিকের মাধ্যমে খাওয়া দ্রুত শেষ করা যায় বলেই সম্ভবত এর এমন

একটি নাম দিয়েছিল চিনারা। অন্যদিকে, নামের প্রকারভেদের মতো দেশে দেশে চপস্টিক দিয়ে খাবার গ্রহণকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা সংস্কারও। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে চপস্টিক দিয়ে খাবার পাশের জনকে দেওয়া বারণ। কেন-না, দেশটিতে মৃতদেহের সৎকারের সময় চপস্টিক দিয়ে মৃতের অস্থি-ভস্ম আত্মীয়দের মাঝে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, চিনে যেমন হোস্ট যতক্ষণ না তাঁর চপস্টিক ভাতের প্লেটে রাখছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরা চপস্টিকে হাত দেন না। একইভাবে খাওয়া শেষে প্লেটের উপর পাশাপাশি চপস্টিক দুটি শুইয়ে দেওয়াও চিনা রীতি।

৩.৪ পাঁচ সিকা— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বোধোদয় বইতে লিখছেন, "সকল দেশেই নানাবিধ মুদ্রা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্ম্মিত; দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত। আর, ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণনির্ম্মিতও আছে। স্বর্ণনির্ম্মিত টাকাকে স্বর্ণ ও মোহর বলে।

৪ পয়সায় ১ আনা ;

৮ পয়সায় ১ দুআনি ;

৪ আনায় ১ সিকি;

৮ আনায় ১ আধুলি ;

১৬ আনায় ১ টাকা।

সিকি, পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু এক সিকির মূল্য ১৬ পয়সা ; ইহার কারণ এই যে, রৌপ্য তাম্র অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য রৌপ্যের মূল্য তাম্র অপেক্ষা এত অধিক। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বে এক মোহরের মূল্য ১৬ টাকা অথবা ১০২৪ পয়সা ছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে।"

৩.৫ কোকো— কোকো বা কোকোয়া দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন উপত্যকার উদ্ভিদ। যার বীজ থেকে চকোলেট তৈরি হয়। মধ্য আমেরিকার আরও কয়েকটি দেশে এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে ক্রমান্বয়ে। তারপর আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া, আইভরি কোস্ট ও ক্যামেরুনে এর চাষ শুরু হয়। এরপর এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নিউগিনিতে সূচনা হয় এর চাষ। দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যা রাজ্যেও এর চাষ দেখা যায়। ১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৫০ সালের দিকে এর চাষের বেশি প্রসার ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি কোকোয়া উৎপাদিত হয় আইভরি কোস্ট, ব্রাজিল ও ঘানা থেকে।

আমাদের দেশেও অনেক ভেষজ বা শৌখিন বাগানে কোকোয়ার গাছ দেখা যায়। এই কোকোয়া ফলের বীজ থেকেই তৈরি হয় আমাদের অতি প্রিয় চকলেট। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, কোকোয়া ফল কলম্বাস ১৪৯৫ সালে মধ্য আমেরিকা থেকে ইউরোপে নিয়ে এসেছিলেন। তবে স্প্যানিশ জেনারেল কোরেটজ্ ১৫২০ সালের মাঝামাঝি এই স্বর্গীয় ফল স্পেনে আমদানি করেন। পরে ফরাসিরা এই গাছের সন্ধান পায়। ১৬৫৭ সালে এক ফরাসি নাগরিক লন্ডনে 'চকোলেট হাউস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চকোলেট জনপ্রিয় করে তোলেন। কোকোয়ার বৈজ্ঞানিক নাম Theobroma cacao। গ্রিক ভাষায় Theos মানে ভগবান আর broma মানে খাদ্য, অর্থাৎ ভগবানের খাদ্য।

এখানে কোকো মানে হট চকোলেট- এর কথা বলা হয়েছে। শক্ত চকোলেট, গলানো চকোলেট বা কোকো, উত্তপ্ত দুধ বা জল এবং চিনির সমন্বয়ে তৈরি এক ধরনের উত্তপ্ত পানীয়। গলানো চকোলেট দিয়ে তৈরি এই হট চকোলেটকে কখনও কখনও বেভারেজ চকোলেট বা পানীয় চকোলেটও বলা হয়।

৩.৬ ক্যান্টন, চাঙ্গুয়া— দুটি চিনা রেস্তোরাঁই প্রায় ১২৫ বছরের পুরোনো। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর উপরে অবস্থিত চাঙ্গুয়া কলকাতার প্রাচীনতম বার। সেই উত্তমকুমারের যুগের বাংলা সিনেমার 'কেবিন'-কালচার বজায় রয়েছে এখনও। বাংলার দিকপাল কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের প্রিয় ঠেক ছিল চাংওয়া। শিবরাম চক্রবর্তী থেকে জহর রায়, সবার প্রিয় ছিল এই খাবার জায়গাটি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "একদিন দেশ পত্রিকার অফিসে একজন লেখক এসে জানালেন, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর ফুটপাথে শিবরামবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরদা আমাকে ডেকে বললেন, ওর তো আজ লেখা দিতে আসার কথা। ফুটপাথে শুয়ে আছে কেন! দেখে এসো তো। আমি গিয়ে দেখি, 'চাংওয়া'র সামনে তিনি আরামে শুয়ে আছেন। একটা হাত কপালে, আর একটা হাত সিল্কের পাঞ্জাবির পকেটে। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। ডান হাতটা পাঞ্জাবির পকেটে। পকেট থেকে তেলেভাজা বের করে মাঝে মাঝে মুখে দিচ্ছেন। এই বার আমি গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলুম, এইখানে এইভাবে শুয়ে আছেন কেন! আমাকে নিচু হতে ইশারা করলেন। ফিসফিস করে বললেন, চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে কোঁচা জড়িয়ে পড়ে গেছি। একটা ধেড়ে মানুষের পড়ে যাওয়াটা লজ্জার, না শুয়ে থাকাটা লজ্জার! আমি বললুম, এর উত্তর দেবেন সাগরদা। আপনি এখন উঠুন। সিল্কের পাঞ্জাবির পিছনে ধুলো। মাথার পিছনে ধুলো। আমি ঝাড়ার চেষ্টা করতেই বললেন, তুমি কিছুই জানো না। একসময় কলকাতার বাবুরা ভোরবেলায় খানা থেকে উঠে প্রাসাদে প্রবেশ করত। পাঞ্জাবির পিছনে ধুলো এটা একটা অ্যারিস্টোক্রেসি।"

ক্যান্টন রেস্টুরেন্টটি অবশ্য এখন আর নেই।

চতুর্থ দৃশ্য : গণিকা পল্লি

৪.১ সোনাগাছি….. মালাপাড়া গলি— এই অংশে সরাসরি তারাপদ সাঁতরাকে উদ্ধৃত করি, "নন্দরাম সেন স্ট্রিট পেরিয়ে একটু এগুলেই শোভাবাজার মোড়। দোকান-বাজারে জনাকীর্ণ এই স্থানটিতে অসংখ্য অটো রিকশা যেন হাট বসিয়ে দিয়েছে। একদা হুতোম চিৎপুর রোডে সেকালের নানাবিধ 'গাড়ির হররা' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, '…বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা সোজা কর্ম নয়।' হালের শোভাবাজারের এই মোড়ে দেখা গেল, অটো রিকশা ও মিনি বাস যেন সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

শোভাবাজার স্ট্রিট, পশ্চিমে গঙ্গার ঘাট অবধি প্রসারিত। এ রাস্তায় বাঁ-হাতি পড়বে বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা বটকৃষ্ণ পালের তিনতলা বাড়ি, যেটিকে দেশি ও বিদেশি স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে গঠিত এক অভিনব অট্টালিকা বলা চলে। পালমশায়ের নির্মিত অনুরূপ স্থাপত্যের আর একটি দোকান বাড়ি দেখা যায় বনফিল্ডস লেনে। আরও একটু এগিয়ে গেলে বাঁ-হাতি পড়বে সুর পরিবারের প্রতিষ্ঠিত উনিশ শতকের এক নবরত্ন মন্দির। শোভাবাজার মোড় থেকে রবীন্দ্র সরণি ধরে দক্ষিণে সামান্য এগিয়ে গেলে কথিত

বটকৃষ্ণ পালের নামাঙ্কিত বি. কে. পাল অ্যাভেনিউ রবীন্দ্র সরণির উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে প্রসারিত। বলতে গেলে, এখান থেকেই বাঁ-হাতি দক্ষিণ-পুবে শুরু হল সেকালের 'বটতলা' এলাকা। সরণি দিয়ে সামান্য এগিয়ে গেলে সামনেই পড়বে চারদিক বাড়ি ঘেরা একফালি জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে জয় মিত্র পার্ক। তারপরেই বাঁ ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে গেলে আয়রন চেস্ট, মাটিতে গেঁথে রাখার প্রয়োজনে সাবেকি লোহার ছোট-বড় সিন্দুক আর লোহার আলমারি তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা সেকালের তস্করোধক বিত্ত সঞ্চয়ের স্মৃতিকে আজও টিকিয়ে রেখেছে। এ সব পেরিয়ে বাঁ-হাতি এবার সোনাগাজি পীরের গলি; দূরে পীর সাহেবের মাজার ইত্যাদি ধর্মস্থানটির স্থাপত্যটিকে দেখা যাচ্ছে। তবে সোনাগাজির গলি আজ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট নামাঙ্কিত হলেও, কলকাতার সুবৃহৎ রূপবিলাসিনীদের আখড়া হিসেবে চিৎপুরের 'সোনাগাছি' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সেকালের বটতলা এলাকার শুরু থেকে চলে আসা গেল বটতলার বইপাড়ায়। আঠারো শতকের শেষ দিকে এই এলাকাতেই ছোটখাটো ছাপাখানা গজিয়ে ওঠার সুবাদে ছাপা শুরু হয়েছিল নানাবিধ ধর্মীয়, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও সমাজধর্মী প্রহসন এবং আদিরসাত্মক পুস্তকাদি। তাই ছাপাখানা যখন এল তখন ওই সব বিষয়ে বিবিধ পুস্তক পাইকারি ও খুচরো বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে এই বটতলাই ছিল কলকাতার আদি বইপাড়া। আজ হয়তো সেকালের মতো অত বইয়ের দোকান আর নেই, তবুও যে'কটি দোকান আজও আছে তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে, 'নৃত্যলাল শীলস লাইব্রেরী', 'মহেন্দ্র লাইব্রেরী', 'কলকাতা টাউন লাইব্রেরী', 'ডায়মন্ড লাইব্রেরী', 'তারাচাঁদ দাস অ্যান্ড সন্স', 'অক্ষয় লাইব্রেরী', 'তারা লাইব্রেরী', 'ক্রাউন লাইব্রেরী' প্রভৃতি। হুতোম তাঁর নকশায় এই এলাকাকে কেন্দ্র করে একদা লিখেছিলেন, 'হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে....' ইত্যাদি। যদিও আজ হাফ বা ফুল আখড়াই, তরজা, কবিগান ও পাঁচালীর দলেরা তেমন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নেই, কিন্তু যাত্রাপালার সদর দফতর আজও চিৎপুরে রয়ে গেছে। বটতলার বইপাড়ার ডানহাতি নিমু গোস্বামীর গলি। যাঁর নামে এই রাস্তা সেই নিমাইচরণ গোস্বামীর বৃহৎ বসতবাটিতে একসময়ে বলরামের রাস হত চৈত্র মাসে। সেজন্যই লোকেরা গান বেঁধেছিল, 'জন্ম মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস/ আলোর সঙ্গে খোঁজ নেইকো, বোঝা বোঝা বাঁশ।' এ গলি পেরিয়ে আর একটু এগোলেই ডানদিকে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট। একসময় এখানেই ছিল এক বিখ্যাত টাইপ ফাউন্ড্রির কার্যালয়। কাছেই নিমতলার কাঠগোলার দৌলতে ছাপাখানার প্রয়োজনে কাঠের অক্ষর ডালা ও গ্যালি তৈরির কারুশালা এখনও এখানে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া এই বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটের সঙ্গে নিমু গোস্বামী লেনও গরাণহাটার মেয়ে বউদের দিয়ে বটতলার বইয়ের ফর্মা ভাঁজাইয়ে দফতরির কাজ করানোর এক বড় কেন্দ্র। এ রাস্তার ১৯/এ নম্বরে শোভারাম বসাকের পৌত্রবধূ হরসুন্দরী দাসীর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত রাধাকান্তের সাবেক মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ায়, শিল্পী সুনীল পালের পরিকল্পনায় সেখানে আধুনিক স্থাপত্যের একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এবারে গরাণহাটায় পৌঁছে যাওয়া গেল। একসময়ে নদীপথে সুন্দরবন থেকে আসত সরু ও লম্বা ধরনের লালচে রঙের গরানকাঠ— যা সেকালের অল্পবিত্তদের ছিটেবেড়ার দেওয়ালযুক্ত ঘর নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হত। এই মজবুত কাঠের প্রয়োজনে এখানে একটি হাট ও আড়ত গড়ে ওঠার কারণে এলাকার সেই গরাণহাটা নামটি আজও থেকে গেছে। রবীন্দ্র সরণির বাঁ পাশের ফুটপাত থেকে শুরু হয়েছে গরাণহাটা স্ট্রিট, যা সোজা চলে গেছে দক্ষিণ-পুবে। খানিক এগুলে এ রাস্তার বাঁ পাশের বাঁকে দেখা যাবে দত্ত পরিবারের ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জোড়া আটচালা শিবমন্দির, যা পুরাকীর্তি হিসাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তবে গরাণহাটা এলাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিন্তু বহুধাবিস্তৃত। এই এলাকার একটি বিখ্যাত শিল্পকর্মের ট্র্যাডিশন এখনও এখানে অব্যাহত রয়েছে। বটতলার প্রকাশকদের উদ্যোগে বাংলায় সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদে যে কাঠখোদাই করা ছবির ব্লক প্রস্তুত করা হত, সে সব শিল্পীদের একটা কেন্দ্রীভূত বসতিও গড়ে উঠেছিল এই এলাকার আশেপাশে। কালীঘাটের পটের ছবি যেমন তুলিতে আঁকা, বটতলার ছাপাই ছবি তেমন কাঠের উপর লোহার বুলি দিয়ে এচিং করে আঁকা। বহু ক্ষেত্রে আবার কালীঘাটের দেশি পাটের ছবির ঢং-এ এখানের শিল্পীরা কাঠে খোদাই করেছেন, এবং তা ছাপার পরে প্রয়োজনীয় রং লাগিয়েছেন সস্তায় বেশি কাটতির আশায়। সেকালের বটতলার বইতে ছাপা এমন অসংখ্য ছবির নমুনা এখানকার ছাপাই ছবির কারিগরদের মুনশিয়ানার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। গরাণহাটা ও জোড়াসাঁকো এলাকার কাঠখোদাই কাজের সে ঐতিহ্য বেশ কিছুটা ম্লান হলেও, পুরোপুরি তা কিন্তু লুপ্ত হয়নি। আজও ছাপাখানার চাহিদা মেটানোর তাগিদে ছোট-বড় কাঠের অক্ষর, ভারতীয় মনীষীদের মূর্তির লাইন ব্লক বা বিশেষ করে স্বাক্ষরের অবিকল প্রতিরূপযুক্ত রবার স্ট্যাম্প তৈরির প্রয়োজনে কাঠের ফ্যাকসিমিলি ছাঁচ বা ডিজাইন অনুযায়ী হরেক রকম কাঠের ব্লক সরবরাহে চিৎপুরের গরাণহাটা ও জোড়াসাঁকোর ছোট-বড় কাঠের ব্লক নির্মাণের দোকান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।” সঙ্গের ছবিতে সেকালের গরাণহাটা।

৪.২ প্রাচীন গ্রিসের মত— ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত হেরোডেটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ - খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০/২০)- এর লেখায় এই পতিতাবৃত্তির বহু নমুনা পাওয়া যায়, যেটি প্রথম শুরু হয়েছিল ব্যাবিলনে। সেখানে প্রত্যেক নারীকে বছরে অন্তত একবার করে যৌনতা, উর্বরতা ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে যেতে হত এবং সেবাশুশ্রূষার নমুনা হিসেবে একজন বিদেশির সঙ্গে নামমাত্র মূল্যে যৌনসংগম করতে হত। একই ধরনের পতিতাবৃত্তির চর্চা হত সাইপ্রাস এবং করিন্থেও। এটি বিস্তৃত হয়েছিল সার্দিনিয়া এবং কিছু ফিনিশীয় সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে ইস্টার দেবতার সম্মানে। প্রাচীন গ্রিস, এথেন্স ও রোমে বহু বছর আগেই পতিতাবৃত্তি চালু হয়েছিল। এমনকি সেসময় অনেককে বাধ্য করা হত পতিতাবৃত্তি করতে। ইউস্তিয়ানের স্ত্রী রোমকসম্রাজ্ঞী থেওডেরো প্রথম জীবনে

বেশ্যা ছিলেন। পৃথিবীতে প্রথম বেশ্যাবৃত্তিতে কোনও পেশার মতো লাইসেন্স বা নিবন্ধন দেওয়া ও কর ধার্য করা হয় রোমান আমলেই।

৪.৩ মাঠকোঠা— মাটির তৈরি একতলা বা দোতলা, একচালা বা দোচালা বাড়ি। সুবল চন্দ্র মিত্র তাঁর অভিধানে লিখছেন, "বাঁশ, কাঠ, খড় ও মৃত্তিকাসহায়ে নির্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে 'মাঠকোঠা' বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।"

৪.৪ মাছি মারা কেরানি— এমন এক লোক, যার কাজ হল অন্ধ অনুকরণ করা। কোম্পানির শাসন আমল, মানে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে কোনও একটি সময়ের কথা। সেসময় মাত্র অফিস-আদালতের ধারণাটা গড়ে উঠছিল। প্রযুক্তিও এখনকার মতো এত সমৃদ্ধশালী ছিল না। তাই এখনকার মতো স্ক্যানার বা ফটোকপি মেশিনও ছিল না, তাই কিছু লোকের কাজ ছিল কপি করা। মানে হয়তো একটা ছাপানো বই আছে, সেটি দেখে দেখে হুবহু বইটি বা এর কিছু অংশ লিখতে হত। এভাবে একবার একজন বই লেখা শুরু করলেন। নিজে তো আর বুদ্ধি করে লেখেননি, আর-একজনের লেখাটা হুবহু তুলছিলেন। প্রথম পাতার পর দ্বিতীয় পাতা, দ্বিতীয় পাতার পর তৃতীয় পাতা, এভাবে লিখেই যাচ্ছেন। শব্দের জায়গায় শব্দ, অক্ষরের জায়গায় অক্ষর, দাঁড়ি কমা সেমিকোলন থাকলে তাই, একটার পর একটা কপি করেই যাচ্ছিলেন।

ঝামেলা লাগল একটু পরেই, কিছুদূর এভাবে কপি করার পর একটা লাইনে এসে দেখেন একটা মাছি মরে পরে আছে। এখন এটা কি আদৌ কোনও সমস্যা হওয়ার কথা? ওই কেরানি লোকটি কিন্তু এটাকে বিরাট সমস্যা বানিয়ে দিলেন। তিনি মনে করলেন, মূল বইয়ে যেহেতু একটা মাছি পড়ে আছে, তার কপিতেও থাকতে হবে, না হলে কপি কীভাবে হবে! একবারও তাঁর মাথায় এল না, আরে মাছিটা কি আর বইয়ের অংশ! সেটা তো পরে এসেছে। সেই কেরানি ব্যক্তি যা করলেন, তিনি তারপর মাছি সন্ধানে বের হলেন, কোথায় তিনি একটি মাছি পান? অবশেষে তিনি একটি মাছির সন্ধান পেলেন, তাকে মারলেন। কিন্তু এই মাছিটা দেখা যাচ্ছে সাইজে অনেক বড়ো। তারপর তিনি অনেকগুলো মাছি মারলেন। পছন্দমতো একটা সাইজ নিলেন, সেটা তিনি তাঁর কপি করা বইয়ের ওই অংশে জুড়ে দিলেন। এভাবেই নাকি একটা বই হুবহু কপি হয়ে গেল।

মূল বিষয়টা হল, ভালো মন্দ বিচার না করে অন্যের নির্দেশ মানাটা আসলে ঠিক নয়। অবস্থা বুঝে তোমাকে নিজেকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনটা করবে আর কোনটা বাদ দেবে। মাছি মারা কেরানি এই প্রবাদটি লোকমুখে চলতে চলতে এতই জনপ্রিয়টা পেয়ে গেছে যে, যে-কোনো কাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটলেই এটা বলা হয়। কাছাকাছি অর্থের এরকম আর-একটি প্রবাদ আছে। প্রবাদটি হল, 'গড্ডল প্রবাহ'। এখানেও একটা মজার ব্যাখ্যা আছে। ভেড়ারা নাকি সামনের জনকে দেখে এগিয়ে যায়। একজন যেদিকে যায়, বাকিরাও কোনও কিছু না ভেবে পুরো পাল ধরে আগে পিছে না দেখে সামনে এগিয়ে যায়।

৪.৫ পানের দোনা— পানের খিলি রাখবার ঠোঙা

৪.৬ বাসুকী— মহাভারতে উল্লিখিত সর্পকুলের রাজা অর্থাৎ নাগরাজ বাসুকি। বাসুকি শিবের সর্প, মনসা তাঁর বোন। শিবের গলায় তাঁর অবস্থান। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দেবতারা সমুদ্র মন্থনের জন্য বাসুকিকে রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। বৌদ্ধ পুরাণেও ধর্মীয় আসরে শ্রোতা হিসেবে বাসুকির উল্লেখ দেখা যায়।

কশ্যপ ও তাঁর স্ত্রী কদ্রুর জ্যেষ্ঠ নাগ-পুত্র (অনন্তনাগ, শেষনাগ ও বাসুকি- তিন নামেই ইনি পরিচিত)। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল তুষ্টি। ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার লেজের বর্ণ নিয়ে কশ্যপের দুই স্ত্রী কদ্রু ও বিনতার তর্ক হলে, কদ্রু অশ্বের লেজ কালো বলেন। তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্য, কদ্রু তাঁর সর্পপুত্রদের উচ্চৈঃশ্রবার সাদা লেজে অবস্থান করতে বলেন। অনন্ত ও আরও কয়েকজন মায়ের এই আদেশ অগ্রাহ্য করায় কদ্রু নাগদের শাপ দেন যে, তারা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হয়ে মারা যাবে। এরপর তিনি কঠোর তপস্যায় প্রাণ ত্যাগ করতে চান, যাতে এই দুর্জন ভাইরা পরলোকে তাঁর সঙ্গে না থাকে। তাঁর এই কঠোর তপস্যার কারণ জেনে ব্রহ্মা তাঁকে বলেন পাতালে গিয়ে পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করতে। সেই আদেশ অনুসারে তিনি পাতালে গিয়ে পৃথিবী ধারণ করেন। এই সময় পাতালের নাগগণ তাঁকে নাগরাজ বাসুকিরূপে বরণ করলেন। ব্রহ্মা নাগদের শত্রু গরুড়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ঘটিয়ে দেন। মায়ের অভিশাপ থেকে তাঁর অন্যান্য ভাইদের রক্ষা করার জন্য তিনি উপায় অন্বেষণ করতে থাকেন। এই সময় এলাপত্র নামক এক নাগ অনন্তকে বলেন যে, অভিশাপদানকালে তিনি মায়ের কোল থেকে শুনেছিলেন— জরৎকারুর সন্তান আস্তিক মুনি সাপদের রক্ষা করবেন। এরপর অনন্ত জরৎকারু মুনিকে খুঁজে বের করেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজের বোনের বিবাহ দেন। অনন্তের এই বোনের নামও ছিল জরৎকারু।

অনন্ত শব্দটির আর-এক অর্থ- অন্তহীন [অ (ন) অন্ত], অর্থে— ব্রহ্ম, বিষ্ণু। এঁর ফণার সংখ্যা মোট ছয়টি এবং তা পদ্মফুলের মতো বিস্তৃত। পুরাণ মতে— নাগদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি পৃথিবীকে তাঁর স্কন্ধে ধারণ করে আছেন। ইনি যখন পৃথিবীকে তাঁর এক স্কন্ধ থেকে অন্য স্কন্ধে ধারণ করেন তখন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হয়।

অমর হওয়ার জন্য দেবতা ও অসুররা যখন সমুদ্র মন্থন করেন, তখন রজ্জু হিসাবে অনন্তকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হওয়ার পরও তাঁরা আবার সমুদ্র মন্থন করতে থাকেন। কিন্তু সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনের পর অনন্ত হলাহল নামক তীব্র বিষ উদগিরণ করতে লাগলেন। এই বিষের প্রভাবে জীবজগৎ বিপন্ন হলে, দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব সমস্ত হলাহল পান করে ফেলেন। কালিকাপুরাণ মতে— প্রলয় শেষে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে এই সাপের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন এবং এর ফণাগুলো বিষ্ণুকে ছাতার মতো আচ্ছাদিত করে রাখে। এঁর দক্ষিণ ফণায় বিষ্ণুর উপাধান ও উত্তর ফণায় পাদপীঠ। বিষ্ণুপুরাণের মতে- ইনি বলরামের অবতার।

পঞ্চম দৃশ্য : নিমতলার শ্মশান

৫.১ নিমতলার শ্মশান— আজ থেকে ৩০০ বছর আগে গঙ্গা বইত আরও প্রায় দুশো মিটার ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ আজ যেখানে আনন্দময়ী কালী মন্দির সেইখান দিয়ে। চার্নকের কলকাতায় পদার্পণের ইতিহাস বলছে তিনি নেমেছিলেন সুতানুটি ঘাটে, যার পরে নাম হয় হাটখোলা ঘাট। মার্ক উডের তৈরি ১৭৮৫ সালের কলকাতার ম্যাপে দেখা যায় যে

সুতানুটি আর হাটখোলা কিন্তু আদতে একই ঘাটের নাম, এবং এর প্রায় তিনশো মিটার দক্ষিণে একটি ঘাটের নাম নিমতলা ঘাট। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী, বর্তমান আনন্দময়ী কালী মন্দির বয়সে নবীন হলেও বিগ্রহের বয়স প্রায় ৩৫০ বছর। গঙ্গার ধারের শ্মশানে নাকি পূজিত হতেন দেবী, তাই শ্মশানকালী। কিন্তু এই শ্মশানই কি নিমতলা শ্মশান? বিগত ৩০০ বছরে নিদেনপক্ষে তিনবার স্থান পরিবর্তন হয়েছে নিমতলা শ্মশানের। এখন আমরা যা দেখতে পাই তা হল চতুর্থ সংস্করণ। চার্নকের সময় গঙ্গা আজকের থেকে প্রায় ২০০ মিটার ভিতর দিয়ে বইলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসে নদী। ১৮২৩ নাগাদ লটারি কমিটি তৈরি করে স্ট্র্যান্ড রোড, ফলে প্রথমবারের জন্য স্থান পরিবর্তন করে শ্মশান, আজ যেখানে চক্ররেলের লাইন, আন্দাজ তার পাশেই পূর্বদিকে তৈরি হয়, ১৮২৮য়ের মার্চ নাগাদ। ১৮৭৫-এ পোর্ট কমিশনের আপত্তিতে, রেল চলাচলকে বাধামুক্ত করার জন্য, আরও পশ্চিমে সরে শ্মশান। প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে, ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানি নির্মাণ করে তৃতীয় নিমতলা শ্মশান, যার ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায় গঙ্গার ধারে। আটের দশকে যোগ হয় বৈদ্যুতিক চুল্লি এবং শেষ অবধি ২০১৫ সালে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় সামান্য দক্ষিণে তৈরি নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লিযুক্ত নিমতলা মহাশ্মশান।

তাহলে নিমতলা ঘাট বা নিমতলা শ্মশানের নামকরণের উৎস যে নিমগাছ, সেটা কোথায়? 'Chuttanuttee Diary and Consultations' অনুযায়ী ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট চার্নকের জাহাজের ক্যাপ্টেন ব্রুক সুতানুটির কাছে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছের কাছে নোঙর করেন। এই নিমগাছটি ছিল বর্তমান আনন্দময়ী কালীবাড়ির সামান্য উত্তরে, যেটি ১৮৮০ নাগাদ আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

কিন্তু শুধুই কি নিমগাছ থেকেই জায়গার নাম নিমতলা, নাকি আছে অন্য ব্যাখ্যাও?

জোড়াবাগান চৌমাথা থেকে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ধরে গঙ্গার দিকে যেতে আনন্দময়ী কালী মন্দিরের ঠিক আগেই বাঁদিকে পড়বে একটি মসজিদ, রাস্তা থেকে প্রায় দোতলা উচ্চতায়, নয় গম্বুজবিশিষ্ট। নাম নিয়ামৎউল্লাহ্ মসজিদ। ১৭৮৪ সালে, স্থানীয় জমিদার মহম্মদ রমজান আলি এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ নিয়ামৎতুল্লাহ্‌র নামে। দোকানের ছাদগুলো সমান নয়, বরং অর্ধবৃত্তাকার, ঠিক যেন মসজিদের তলায় কোনও গোপন কক্ষের প্রবেশপথ! আগে নাকি মসজিদের তলা দিয়ে গঙ্গায় যাওয়ার সুড়ঙ্গ ছিল। রমজান আলির পূর্বপুরুষ নিয়ামৎতুল্লাহ্ নির্মাণ করিয়েছিলেন একটি ঘাট, পরবর্তীকালে ঠিক তার ধারেই তৈরি হয় মসজিদ। এই সুড়ঙ্গটি ছিল আসলে ঘাটে যাওয়ার পথ, যা বর্তমানে বন্ধ। মসজিদ অত উঁচুতে তৈরি করার কারণও হল সেই গঙ্গাই, যাতে জোয়ারের জলে প্লাবিত না হয় ধর্মস্থান। তবে নিয়ামৎতুল্লাহ্ ঘাট নিয়ে প্রচলিত আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বিস্ময়কর কিংবদন্তি। এই ঘাট নাকি ব্যবহার করতেন হিন্দু ও মুসলিম, দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ। একদিন কিছু ব্রাহ্মণ ঘাটে পুজো করার সময় কয়েকজন মুসলিম বাচ্চা ছেলের স্নানের জল ছিটকে এসে লাগে তাঁদের গায়ে। নিজেরা 'অপবিত্র' হয়ে গেছেন এই কুসংস্কার থেকে ব্রাহ্মণরা বলাবলি করতে থাকেন যে তাঁরা আর এই ঘাট ব্যবহার করবেন না। এই কথা রমজান আলির কানে গেলে তিনি রীতিমতো সেপাই বসিয়ে এই ঘাট শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্যই নির্দিষ্ট করে দেন। নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে এই নির্দেশ সত্যিই অভূতপূর্ব!

এখন কয়েক শতক পরে নিমগাছ থেকে নাম নিমতলা নাকি নিয়ামৎতুল্লাহ্ ঘাট বা মসজিদ থেকে অপভ্রংশ হয়ে নাম নিমতলা, সেই প্রশ্নের উত্তরও হারিয়ে গেছে কালের গর্ভেই। সঙ্গে ১৯০২ সালে তোলা নিমতলা শ্মশানের ছবি।

৫.২ কাশী মিত্রের ঘাট— 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইতে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখছেন, "কাশীপ্রসাদ, মিত্র, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর, গবর্ণমেণ্টের তোষাখানায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইঁহার অন্যতম পুত্র, বাবু গোপাল লাল মিৎৰ হাইকোটের উকীল ছিলেন। কাশী মিত্র মহাশয়ের নামে আজও একটা ঘাট কলিকাতা সহরে বর্তমান। এখানে শবদাহ হইয়া থাকে। এই ঘাট 'কাশী মিত্রের ঘাট' বলিয়া সাধারণে পরিচিত।"

৫.৩ মেডিক্যাল কলেজের গাড়ি— শব বহনকারী গাড়ি। ১৮২২ সালের ৯ মে, মেডিক্যাল বোর্ডের আলোচনায় উঠে এল, নেটিভদের চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঠ দেওয়ার কথা। সেই প্রস্তাব লিখিত আকারেই ভারতের তৎকালীন মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল উইলিয়াম কেসমেন্টকে পাঠালেন সদস্যরা। অনুমতি মিলল। সে বছরের ২১ জুন শুরু হয়ে গেল THE SCHOOL FOR NATIVE DOCTORS (পরবর্তী সময়ে ১৮২৪-এর অক্টোবরে নাম পরিবর্তন হয়ে THE NATIVE MEDICAL INSTITUTION)। মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস রচয়িতা পূর্ণচন্দ্র দে লিখছেন, 'মনে হয়, মহাত্মা রামকমল সেনের বাটীতেই (পুরাতন এলবার্ট কলেজের গৃহেই) এই স্কুল বসিয়াছিল।' অর্থাৎ লর্ড ময়রার বদান্যতায় আজকের কফি হাউসের বাড়ি থেকেই কলকাতার তো বটেই, দেশের প্রথম ডাক্তারি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু।

১৮২৩-এ মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'আমাদের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যত ছাত্র লইবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল। আমরা কেবল ২০ জন বুদ্ধিমান ছাত্রকে ভর্ত্তি করিয়াছি। অবশিষ্ট ছাত্রগণকে বলিয়া রাখিয়াছি যে, খালি হইলেই তোমাদিগকে ভর্ত্তি করা যাইবে।' নেটিভ ডাক্তারি স্কুলের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার জেমস জেমিসন। তিনি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করতেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসার বেশ কয়েকটি বই তিনি ছাত্রদের জন্য অনুবাদ করেছিলেন দেশীয় ভাষায়। তবে প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ৭ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয় তাঁর। জেমিসনের জায়গায় আসেন জন ব্রেটন, রীতিমতো দেশীয় ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা দিয়ে। বেতন ১ হাজার ৬০০ টাকা। তিনিও দেশীয় ভাষায় বেশ কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। সরকারি রিপোর্টে সে কথা লেখা হচ্ছে— 'Surgeon Breton immediately undertook the compilation of a vocabulary of the names of the different parts of the human body, and of medical and technical terms in Roman, Persian, and Nagree characters : and also submit copies of demonstrations of the brain, thoracic and abdominal viscera, and of the Structure of the eye, in the Persian and Nagree character...'

THE SCHOOL FOR NATIVE DOCTORS কেমন ডাক্তার তৈরি করতে পারল? দেশের চিকিৎসাব্যবস্থারই বা হাল কী? আরও কীভাবে উন্নতি করা যায়? এ প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে দেশীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ২০ অক্টোবর, ১৮৩৪ কমিটি সুপারিশ করে—অবিলম্বে একটি মেডিক্যাল কলেজের

প্রয়োজন। কমিটির সুপারিশ মেনেই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ২৮ জানুয়ারি, ১৮৩৫-এ শুরু হয় মেডিক্যাল কলেজ, বেঙ্গল। দেশ তো বটেই, এশিয়ার মধ্যেও এটিই প্রথম ডাক্তারি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি তো বটেই, দেশীয় ভাষাতেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এই প্রতিষ্ঠানে।
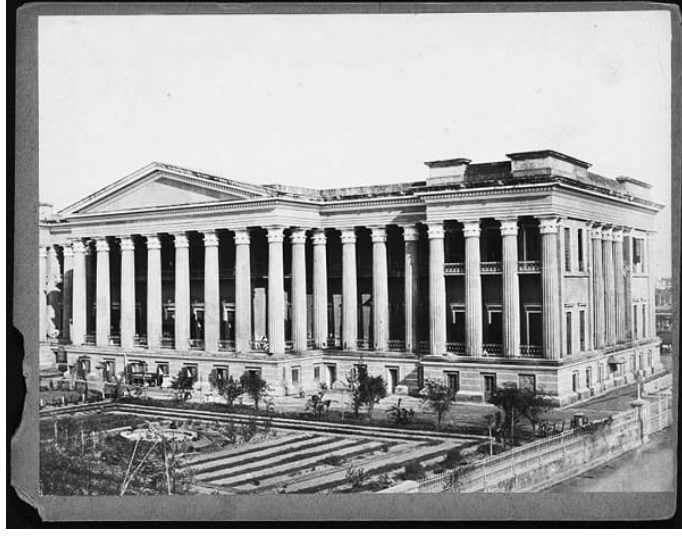
মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন— জুন, ১৮৩৫, প্যারীচাঁদ মিত্র লিখছেন— ০১.০২.১৮৩৫। আবার প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিকী ক্রোড়পত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার দিন ২০.০২.১৮৩৫। 'সমাচার দর্পণ'-এ লেখা হচ্ছে ৯ জ্যৈষ্ঠ (অর্থাৎ মে মাসের শেষ)। আবার 'সমাচার দর্পণ' পরের বছর মার্চ মাসে লিখছে, 'গত বৃহস্পতিবার নতুন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য আরম্ভ হয়।'একই দিনের উল্লেখ করছে ২৬ মার্চ ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকাও। 'আদি কলকাতায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চা' প্রবন্ধে পীযূষকান্তি রায় এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন — 'আগে পরে প্রতিষ্ঠা বছরের এ গরমিল হওয়ার কারণ হল ইংরেজি ও দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দুটি বিভাগের আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা।' যাঁদের সহায়তা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হত না, তাঁরা হলেন— প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্যামচরণ লাহা, ইহুদি ব্যবসায়ী এজরা পরিবার এবং অবশ্যই ডেভিড হেয়ার। ডাক্তার এম.জে রামলি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। তবে সামান্য জ্বরেই মৃত্যু হয় এই বিখ্যাত চিকিৎসকের। কলেজের দায়িত্ব নেন ডেভিড হেয়ার। তিনি ছিলেন কলেজের সচিব এবং কোশাধ্যক্ষ। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম তিন বছর মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২ হাজার টাকা অর্থসাহায্য করেন। ১৮৪৪-এ তিনি ঘোষণা করেন, মেডিক্যালের কয়েকজন কৃতী ছাত্রকে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠাবেন। দ্বারকানাথের প্রস্তাবে চার বাঙালি ছাত্রের বিদেশ যাত্রা সম্ভব হল— ভোলানাথ বসু, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু এবং গোবিন্দলাল শীল। তবে দ্বারকানাথ বসু ও গোবিন্দলাল শীলের ব্যয়ভার বহন করেছিল তৎকালীন সরকার। সঙ্গে তখনকার মেডিক্যাল কলেজের ছবি।

৫.৪ আমহার্স্ট স্ট্রিট— পুরোনো কলকাতা শহরে শুরুতে তিনটে হাসপাতাল ছিল, জেনারেল হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল এবং নেটিভ হাসপাতাল। ১৭০৭-এ প্রতিষ্ঠিত জেনারেল হাসপাতাল আজকের এসএসকেএম, ১৭৮৯-এ স্থাপিত পুলিশ হাসপাতালে পুলিশ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের চিকিৎসা। যে দেশে গেঁড়ে বসতে চলেছেন, সে দেশের মানুষদের কি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করলে চলে ! এতটাও অবিবেচক ছিলেন না ব্রিটিশরা। তাই ১৭৯৪ সালে নেটিভ হাসপাতালের যাত্রা শুরু। এই পুলিশ হাসপাতাল ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে, যা বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই বন্ধ হয়ে যায়।

৫.৫ শ্মশানেশ্বরের মন্দির— নিমতলা ঘাটের পাশের শিবমন্দির। প্রাচীনত্বে প্রায় ঘাটের সমান।

৫.৬ শ্মশান ভালো বাসিস...— পুরো গানটি এই রকম :

শ্মশান ভালো বাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।

শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি।

আর-কোনো সাধ নাই মা চিতে, সদাই আগুন জ্বলছে চিতে।

(ওগো) চিতাভস্ম চারিভিতে, রেখেছি মা আসিস যদি,

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে চরণতলে।

নাচ দেখি মা তালে তালে দেখি আমি চরণ মুদি।

রচয়িতা অজ্ঞাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গান। সারদা মায়ের মাতাল ভক্ত বিনোদবিহারী সোম বা পদ্মবিনোদকেও এই গান শোনাতে দেখা যায়।

৫.৭ স্টেটসম্যানে— দ্য ইংলিশম্যান এবং দ্য ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া উভয়ই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। দ্য ইংলিশম্যান ১৮১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্য স্টেটসম্যান, কলকাতা শুরু হয় দ্য স্টেটসম্যান এবং নিউ ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া নাম থেকে। খুব শীঘ্রই এর প্রকৃত নাম সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং এই সংবাদপত্র দ্য স্টেটসম্যান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য স্টেটসম্যান, কলকাতায় ১৮৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পর এই সংবাদপত্রের কর্তৃত্ব ভারতীয়দের স্থানান্তরিত করা হয়। এই পত্রিকার বিক্রি কমতে থাকে যখন আনন্দবাজার গোষ্ঠী এম জে আকবরের সম্পাদনায় দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা বের করতে শুরু করে। এরপর টাইমস অফ ইন্ডিয়া কলকাতা সংস্করণ শুরু করলে স্টেটসম্যানের হাল আরও খারাপ হয়। এরপর তারা স্টেটসম্যানের বাড়ির কিছু অংশ প্রথমে বিক্রি করে দেয়। তারপর হাতবদল হয় স্টেটসম্যানের। কিন্তু অবশেষে ২০১৯ সালে তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

এই পত্রিকার মাস্টহেডটি খুব বিখ্যাত ছিল। সত্যজিৎ তাঁর চারুলতা ছবিতে কাল্পনিক পত্রিকা The Sentinel-এর মাস্টহেড স্টেটসম্যানের মতো করেন। (সঙ্গে ছবি)।

ষষ্ঠ দৃশ্য : হোটেল

৬.১ স্টার থিয়েটারের সামনে মিনার্ভা গ্রিল— সে যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীকে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য তাঁর নামে নতুন থিয়েটার খুলতে আগ্রহী হন গুর্মুখ রায়। গুর্মুখ ছিলেন হোরমিলার কোম্পানির 'বেনিয়ান' গণেশদাস মুসাদ্দির ছেলে।
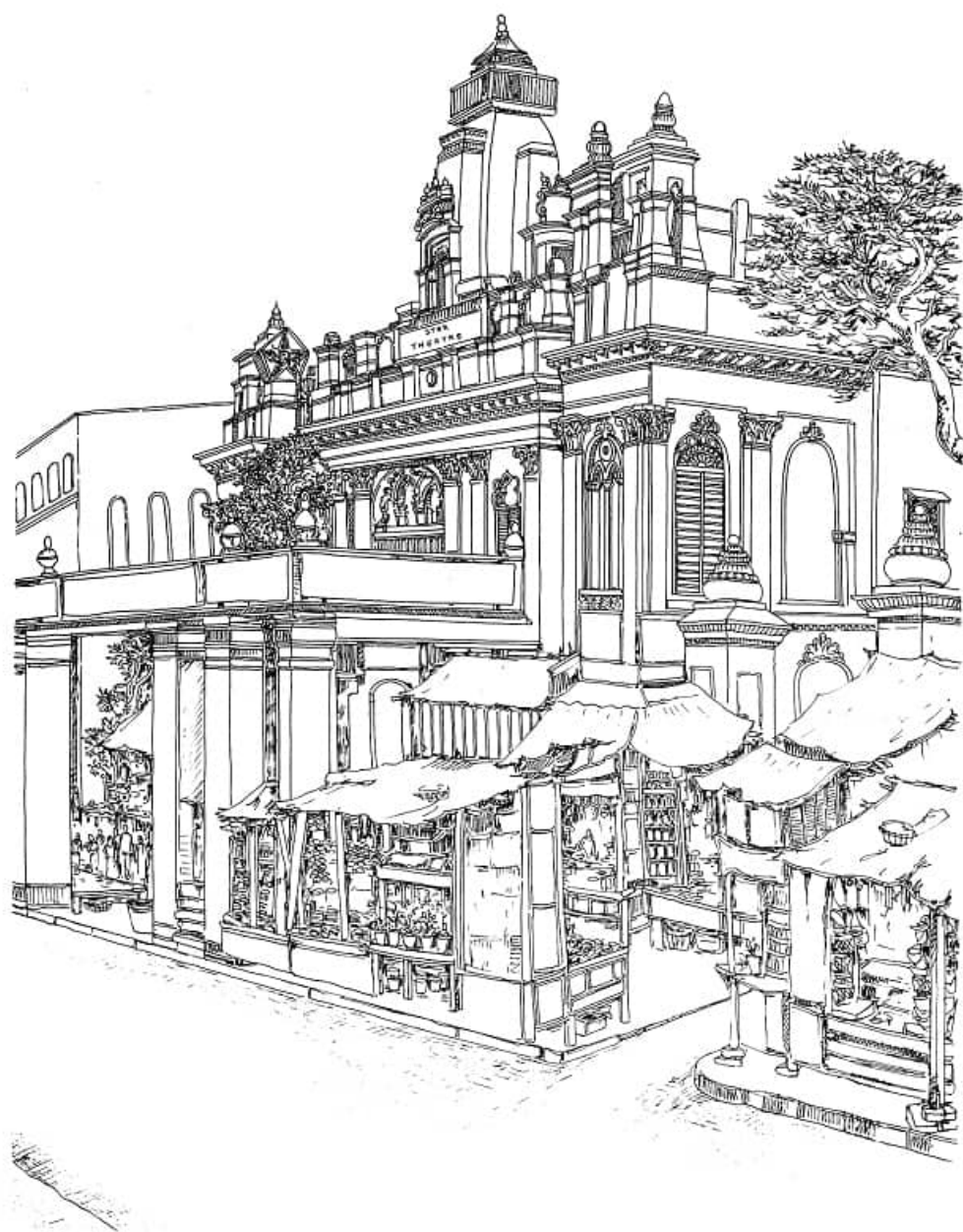
স্টার থিয়েটার,শিল্পী রথীন মিত্র, ১৯৮৮

তাঁর থিয়েটার-প্রীতির কারণও ছিলেন বিনোদিনী। ৬৮, বিডন স্ট্রিটের ফাঁকা জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের টাকায় থিয়েটার খোলা হয় বটে, কিন্তু বিনোদিনীর নামে নয়। বারাঙ্গনার নামে থিয়েটার হলে সামাজিক বাধা আসবে— এই যুক্তিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্যদের চক্রান্তে থিয়েটারের নাম হয় 'স্টার থিয়েটার'। ৩১ জুলাই, ১৮৮৩ গিরিশচন্দ্রর লেখা নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে উদ্বোধন হয় প্রেক্ষাগৃহটির। তবে কয়েক বছর পরে পারিবারিক চাপে গুর্মুখ থিয়েটারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মাত্র ১১ হাজার টাকার বিনিময়ে স্টারের মালিক হন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাশুচরণ নিয়োগী। বিনোদিনী অবশ্য থেকে গেলেন স্টারের দলেই। তাঁর জীবনের সেরা অভিনয়গুলি ওই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলেও দলাদলি ও অপমানের কারণে তিনি অবসরও নেন ওখান থেকেই। ১ জানুয়ারি, ১৮৮৭-এ 'বেল্লিকবাজার' নাটকে রঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন তিনি। এরই মাঝে, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪-এ 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখতে এসে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করে যান শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার অল্প দিন পরে স্টার থিয়েটারও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মালিকপক্ষ তখন ৩০ হাজার টাকায় তা বিক্রি করে দেয় ধনকুবের গোপাললাল শীলকে। ওই প্রেক্ষাগৃহে 'এমারেল্ড থিয়েটার' নামে নতুন নাট্যদল গঠন করেন গোপাললাল। সেটিও অবশ্য বেশিদিন চলেনি। পরে নানা হাতবদলের মধ্যে দিয়ে একসময়ে তার নাম হয় 'মনমোহন থিয়েটার'। ১৯৯১ সালে এটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং ২০০৪ সালে আবার পুনর্নির্মিত হয়। সঙ্গে রথীন মিত্র অঙ্কিত স্টার থিয়েটার।

৬.২ ব্রাহ্ম মহিলাদের নকলে— মুসলমান, পারসিক ও শিখদের পোশাক লক্ষ করে আধুনিকভাবে পোশাক পরার প্রচলনের পথপ্রদর্শক বলা যায় কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবীকে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু মহিলা সমাজ এবং ব্রাহ্ম ও বাঙালি খ্রিস্টানেরা পর্যন্ত পাঁচমিশালে পোশাক পরতেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পোশাকের উন্নত সংস্করণ বের হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কোনও এক বিশেষ পোশাক পরার নিয়ম চালু হয়নি। সুন্দর আধুনিক পোশাক সৃষ্টির গোড়াতে হিন্দু মহিলাদের মধ্যে যখন নানা বাধা দ্বিধা আসছিল, তখন প্রথমে এগিয়ে আসে বারাঙ্গনাসমাজ। তাতে ভদ্রলোকেরা একটু মুশকিলে পড়ে যান। বেশ্যাদের প্রচলিত ওই পোশাক পরলে তাঁদের মেয়েদেরও হয়তো কেউ কেউ বেশ্যা ভাবতে পারে, সেইজন্য শাড়ির ওপর একটি বাড়তি চাদর গায়ে দেওয়ার নিয়ম চালু হয়।

ঠাকুরবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী মহিলাদের পোশাক নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। এতদিন মহিলাদের স্থান ছিল অন্তঃপুরে, তখন একটা শাড়ি জড়িয়ে নিলেই যথেষ্ট হত; কিন্তু বাইরে বের হতে গেলে তো পোশাকের পরিবর্তন দরকার। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে তিনি মহিলাদের বাইরে যাবার পোশাকের রূপ ও প্রকার নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। শাড়ির সঙ্গে সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজের প্রচলন করলেন তিনি; সঙ্গে জুতো ও মোজা জুড়ে দিয়ে তিনি 'ব্রাহ্মিকা শাড়ি'-র প্রচলন করেন। ১৮৭১ সালে তিনি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-য় তাঁর পরিকল্পিত পোশাকের কথা নিয়ে লেখা প্রকাশ করেন। চারিদিকে বিতর্ক ও ধিক্কার উঠলেও জ্ঞানদানন্দিনী স্ত্রী-স্বাধীনতার চিন্তা থেকে সরে আসেননি।

চিত্রা দেব তাঁর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে লিখেছেন, বোম্বাই থেকে আনা বলে ঠাকুরবাড়িতে এই শাড়ি পরার ঢংয়ের নাম ছিল বোম্বাই দস্তুর, কিন্তু বাংলাদেশে তার নাম হল ঠাকুরবাড়ির শাড়ি। জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাই থেকে ফিরে এ ধরনের শাড়ি-পরা শেখানোর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মিকা এসেছিলেন শাড়ি-পরা শিখতে, সবার আগে এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী। অবশ্য তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, অন্যান্য ব্রাহ্মিকারাও বাইরে বেরোবার সাজের কথা ভাবছিলেন। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী সরাসরি গাউন পরতেন। ঠাকুরবাড়িতেও ইন্দুমতী পরতেন গাউন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশি পোশাক তৈরি করবার জন্যে পাজামাতে কোঁচা আর শোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী মেমসাহেবদিগের গাউনের উপরিভাগে আঁচল জুড়ে একপ্রকার আধা বিলিতি আধা দেশী পরিচ্ছদ সৃষ্টি করেন। বোম্বাই দস্তুর নতুনত্বের গুণে সবাইকে আকৃষ্ট করল। তবে এতে মাথায় আঁচল দেওয়া যেত না বলে প্রগতিশীলারা একটি ছোটো টুপি পরতেন। তার সামনেটা মুকুটের মতো, পিছনে একটু চাদরের মতো কাপড় ঝুলত। মাথায় শাড়ির আঁচলে ছোট্ট ঘোমটা টানা প্রবর্তন করেন জ্ঞানদানন্দিনীর মেয়ে ইন্দিরা, তখন সাবেকি ধরনে শাড়ি পরার গৌরব আবার ফিরে এসেছে।

এখনকার আধুনিকারা যে ভাবে শাড়ি পরেন সেই ঢংটি জ্ঞানদানন্দিনীর দান নয়। বোম্বাই দস্তুর-এ যেসব অসুবিধে ছিল সেগুলো দূর করবার চেষ্টা করেন কুচবিহারের মহারাণী কেশব-কন্যা সুনীতি দেবী। তিনি শাড়ির ঝোলানো অংশটি কুঁচিয়ে ব্রোচ আটকাবার ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে তিনি মাথায় পরতেন স্প্যানিশ ম্যাটিলাজাতীয় একটি

ছোট্ট ত্রিকোণ চাদর। তার বোন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী দিল্লীর দরবারে প্রায় আধুনিক শাড়ি পরার টংটি নিয়ে আসেন। এটিই নাকি তার শ্বশুরবাড়ির শাড়ি পরার সাবেকী ঢং। বাস্তবিকই উত্তর ভারতের মেয়েরা, হিন্দুস্থানী মেয়েরা এখনও যে ভাবে সামনে আঁচল এনে সুন্দর করে শাড়ি পরে তাতে ঐ ধরনটিকেই বেশি প্রাচীন মনে হয়। বাঙালী মেয়ের অধিক স্বাচ্ছন্দ্যগুণে এটিকেই গ্রহণ করলেন তবে জ্ঞানদানন্দিনীর আঁচল বদলাবার কথাটি তারা ভোলেননি তাই এখন আঁচল বাঁ দিকেই রইল। কিছুদিন মেমেদের হব স্কার্টের অনুকরণে হব করে শাড়ি পরাও শুরু হয় তবে অত আঁটসাট ভাব সকলের ভাল লাগেনি। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে উঠল নানান। ফ্যাশানের লেস দেওয়া জ্যাকেট ও ব্লাউজ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বিলিতি দরজীর দোকান থেকে যত সব ছাঁটকাটা নানা রঙের রেশমের ফালির সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত।

এই বিচিত্রবেশিনীরা সাধারণ হিন্দু সমাজের চোখে ছিলেন যোগেন বসুর মডেল ভগিনীর মতো বিচিত্র জীব। জ্ঞানদানন্দিনী নিজে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি তবে তার দুই ননদ সৌদামিনী আর স্বর্ণকুমারীর রচনা থেকে জানা যায় তাদের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তারা যখন সেমিজ, জামা, জুতো, মোজা পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরোতেন তখন চারদিকে ধিক্কারের ঘূর্ণীঝড় উঠত। শুধু ধিক্কার নয়, শাড়ির সঙ্গে জ্যাকেট পরে বাইরে বেরোলে তাদের বিলক্ষণ হাস্যভাজন হতেও হত। হিন্দুদের সেলাই-করা জামা পরে কোন শুভ কাজ করতে নেই। তাই পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আরো কিছুদিন গণ্ডগোল চলেছিল। তবে যুগ বদলেছে, তাই মুসলমানী পোশাককে তাঁরা যেমন অন্তঃপুরে ঢুকতে দেননি তেমনি করে ব্রাহ্মিকাদের পোশাককে বাধা দিতে পারলেন না। নতুন ধরনের শাড়ি পরার ঢংএর নামই হয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মিক। শাড়ি। তবে বিয়ে-টিয়ের সময় সনাতন নিয়মই চলত। গগনেন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে যখন তাঁর ন বছরের মেয়ে সুনন্দিনীকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছেন তখনও বরপক্ষের একজন আপত্তি জানিয়ে বলেন, সেলাই-করা কাপড় পরে তো মেয়ে সম্প্রদান হয় না। গগনেন্দ্র যখন গৌরীদানই করছেন তখন আর নিয়মটুকু মানতে দোষ কি? গগনেন্দ্র জানতেন সে কথা। ঠাকুরবাড়ির ছেলে হলেও তাঁর বাড়িতে সনাতন হিন্দু নিয়মই চলে আসছে। তাই তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারভঙ্গিতে হেসে বলেছিলেন, দেখুন মেয়ের গায়ে কোন জামা নেই। সত্যিই তো! সমবেত বরযাত্রীরা দেখলেন মেয়ের গায়ে জামা নেই বটে তবে শাড়িটা এমন কায়দায় পরানো হয়েছে যে জামা নেই বোঝাই যায়নি। শিল্পী গগনেন্দ্র নিজস্ব পরিকল্পনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়েছিলেন। কনে সাজাবার এই ঢংটি সবার খুব পছন্দ হয়েছিল। সঙ্গে ব্রাহ্মিকা শাড়ি পরিহিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

সপ্তম দৃশ্য : কলকাতার উৎসব রাত্রি

৭.১ দুর্গাপূজা— বারোয়ারি বা বারো-ইয়ারি দুর্গাপুজোর উৎপত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। শ্রীরামপুরের ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া কাগজ ১৮২০ সালের মে মাসে লেখে যে, শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়ায় প্রায় বিশ বছর আগে একদল ব্রাহ্মণ সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বজনীন বা বারো-ইয়ারি পুজো শুরু করেন। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী ১৭৯০ সালে বারোয়ারি পুজো শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতকে কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপুজোর ছবির মতো বিবরণ পাই হুতোম প্যাঁচার নকশা-য়। আর বারোয়ারি পুজোর কথা বললে সবার আগেই মনে আসে চাঁদা

আদায়ের কথা। হুতোম এই চাঁদা আদায়কারীদের "দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা" বলেছেন। তখনকার দিনে অষ্টম আইনে খাজনা উশুলের পেয়াদাদের মতোই নিষ্ঠুর ছিল তারা। তবে অনেকেই "চোটের কথা কয়ে বড় মানুষদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।" চোটের কথায় তুষ্ট করার গল্পটি ভারী মজার— "আর একবার একদল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। সিংগি বাবু সে সময় আফিস বেরুছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে 'ধরেছি', 'ধরেছি' বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো— সিংগি বাবু অবাক, ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বললেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গেছে; সুতরাং তিনি আর আসতে পারবেন না, সেইখানে রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে যদি আর কোন সিংগি যোগাড় কত্তে পার তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ একমাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না— চলুন! মার যাতে আসা হয়, তাই তদবির করবেন।' সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য করলেন।" সমাচার দর্পণে ১৮৪০ নাগাদ প্রায়ই খবর বার হত, বেহালা অঞ্চলে নাকি বারোয়ারি পান্ডাদের চাঁদার জুলুমে পথ চলা দায়। তাদের পান্ডা স্বয়ং সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ির ছেলেরা, "মান্য সাবর্ণ মহাশয়দিগদের যুবা সন্তানেরা বারোয়ারী পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন.. স্ত্রী লোকের ডুলি পালকি দৃষ্টি মাত্রই বারোয়ারীর দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহাদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না।" শেষে চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেটন নারীবেশ ধরে এদের পাকড়াও করেন ও জেলে পোরেন। তবে পূজা শেষে ঝামেলাও কম হত না। চুঁচড়োতে একই মূর্তি বৈষ্ণব আর শাক্ত মতে পূজা হয়। প্রথমে বৈষ্ণব, পরে শাক্ত। কিন্তু ঝামেলা বাধল বিসর্জন দেবার সময়ে। বৈষ্ণবরা বলে তারা তো ঘট বিসর্জন দিয়েই দিয়েছে— মূর্তি বিসর্জনের খরচা শাক্তদের। আর "এই বিষয়েতে দুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত হইল।" পরে অবশ্য শাক্ত ও বৈষ্ণব দুর্গা আলাদা হয় সিংহের গঠনে, শাক্তের সিংহ সাধারণ ও বৈষ্ণব সিংহ ঘোড়ামুখো হত। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, বড়োবাজারে এক বাড়িতে ছোট্ট এক দুর্গামূর্তির পুজো হত— যাকে সবাই পুতুল দুর্গা বলত। ডাকের গয়না তখনও চালু হয়নি। মাটির গয়নাই সর্বত্র চলত। অনেকে সন্ধিপূজায় নাপিত দিয়ে বুক চিরে রক্ত সোনার বাটিতে নিয়ে পূজা দিত। ঢুলিরা নীল কোরা কাপড় পরে 'কাঁইনানা, কাঁইনানা, গিজদা গিজোড়, গিজোড় গিজোড়' বোল তুলে নাচত, নিয়ম ছিল অনেক। পাত পেড়ে খাওয়াতে হবে অন্তত দশজনকে। ঝি-চাকরকে সন্ধের সময় দিতে হবে জলপান। বিজয়াতে সন্দেশ বা মিষ্টি চলত না— শুধু নারকেল ছাবাই গ্রাহ্য ছিল। সঙ্গে ১৯০৭ সালে দি এমপ্রেস পত্রিকায় ছাপা হয় শোভাবাজার রাজবাড়ির বড়ো তরফের এই দুর্গার ছবি।

৭.২ পাথুরে-ঘাটায়— নাম ছিল নুড়িঘাটা। কালেদিনে নুড়ি হয়ে গেল পাথর। সেই থেকে পাথুরিয়া। বর্ধমান থেকে ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় এসে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে বাড়ি তৈরি করেন রামরাম ঘোষ। আনুমানিক ১৭৮৪ সালে বাড়িটি তৈরি হয়। কলকাতাবাসের সূচনা করলেও, পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামরামের ছেলে রামলোচন ঘোষ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। হেস্টিংসের আমলে দেওয়ানও হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ৪৬ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। রামলোচনের তিন পুত্র— শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ এবং আনন্দনারায়ণ। রামলোচনের মেজো ছেলে দেবনারায়ণের ছেলে খেলাৎচন্দ্র ঘোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৪৬ সাল নাগাদ পুরোনো বাড়ির পাশেই ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে দুর্গাদালান সহ নতুন বাড়ি তৈরি করে উঠে যান এবং সেখানে দুর্গাপুজো শুরু করেন। দুর্গার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। এখন সেটাই পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ি। এই বাড়িতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। এই ভবনেই দেহত্যাগ করেন রামকৃষ্ণ। সেই সময় বাড়ির কর্তা ছিলেন খেলাত ঘোষের ছেলে রামনাথ ঘোষ। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িতে আসতেন। মার্টিন অ্যান্ড বার্নের তৈরি এই বাড়িতে মঠচৌরি চালের মহিষাসুরমর্দিনী প্রতিমায় পুজো হয়। পরানো হয় রুপোলি ডাকের সাজ। রুপোলি তবকে মোড়া সিংহাসনে দেবীর অধিষ্ঠান। পুজোয় ব্যবহার করা হয় রুপোর বাসন। ডাকের সাজের একচালা মা দুর্গার পায়ের কাছে সিংহের বদলে থাকে ঘোটক সিংহ। লুচি-মিষ্টি-মন্ডা ভোগের সঙ্গে থাকে চিনির মঠ। আগে কাশী থেকে এলেও, এখন স্থানীয় মঠই দেওয়া হয় ভোগে। সেই রীতির মতোই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানো। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও এই জায়গার অঙ্গাঙ্গি যোগ। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা গোবিন্দপুরে নতুন কেল্লা তৈরির জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের অন্যত্র জমি দেয়। এদিকে তার আগের বছরে সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ফলে জয়রামের ধর্মতলার বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে যা পেলেন তাই দিয়ে জয়রামের পুত্র নীলমণিরাম বা নীলমণি ঠাকুর উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে জমি নিয়ে বাড়ি করে সপরিবারে উঠে এলেন। প্রতিষ্ঠা হল পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশের। নীলমণি বাড়ি করলেও আবার তিনি ওড়িশায় চলে যান চাকরি করতে। বাড়ি, পরিবার রইল পরের ভাই দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম ঠাকুরের জিম্মায়। দর্পনারায়ণের পুত্ররা ও তাঁদের পরিবারবর্গ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ নামে পরিচিত।

এই বংশে অনেক কৃতবিদ্য মানুষ জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। টেগোর ক্যাসল, টেগোর প্যালেস, মরকতকুঞ্জ প্রভৃতি ভবন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন সদস্য নির্মাণ করেন। এর বেশ

কিছুকাল পরে, সম্পত্তি নিয়ে নীলমণি ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বিরোধ হলে, নীলমণি এক বস্ত্রে স্ত্রী-পুত্র ও গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়ালে বৈষ্ণবচরণ শেঠের দেওয়া মেছুয়াবাজারের জমিতে কুঁড়েঘর তৈরি করে বসবাস আরম্ভ করলেন। পরে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পেয়ে ১৭৮৪-তে নতুন বাড়ি করলেন। সেই বাড়িই আজ জোঁড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির রামভবন।

৭.৩ নিমা— টিউনিক জাতীয় পোশাক। প্রাচীনকালে রোমের অধিবাসীদের সাধারণ পোশাক ছিল টোগা। টোগার আকৃতি ছিল বৃত্তের একটি কাটা অংশের মতো। গ্রিকদের হিমেশন যেমন এক কাঁধের ওপর ফেলা থাকত, রোমানদের টোগাও তেমনিভাবে পরা হত ভাঁজ করা অবস্থায়। টোগার তলায় রোমানরা টিউনিক পরত। গরিবরা শুধু টিউনিক পরত। কালক্রমে প্যালিয়াম পরার ফ্যাশন দেখা দিল। এর অপর নাম ক্লোক। প্যালিয়াম ছিল শিক্ষিত রোমানদের পরিচ্ছদ। এটা একরকম আলখাল্লার মতো ঢিলা পোশাক। গ্রিকরা যেমন তলায় কিটন ও ওপরে হিমেশন পরত, রোমক মেয়েরা তেমনি স্টোলা ও পালা পরত। বাইরে বেরুবার সময় স্ত্রী-পুরুষ সবাই বুট পরত আর বাড়িতে পরে থাকত স্যান্ডাল।

৭.৪ কাপ্তেন সমাজে— কলকাতার নিচুতলার সাহেবদের মধ্যে প্রধান ছিল নাবিকরা। আচার আচরণে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। নানা অছিলায় ঢুকে পড়ত শহরে। মাতলামি, খুন, ডাকাতি, নানা অপরাধ করত হামেশাই। তাদের বেলাগাম জীবনের জন্য প্রায়ই যৌন ব্যাধির শিকার হতে হত। যা উপার্জন হত, গোটাটাই উড়িয়ে দিত ফুর্তিতে। আর সেখান থেকেই এই ধরনের জীবনযাত্রা কাপ্তেনি নামে পরিচিত হয়।

৭.৫ বিন্ধ্যবাসিনীর মতো— বিন্ধ্যবাসিনী মানে সিংহবাহিনী পার্বতী। ঊনবিংশ শতকে রামধন স্বর্ণকারের খোদিত একটি অদ্ভুত ছবি আমাদের চোখে পড়ে। একটি পঞ্চশাখ মন্দির, গির্জার আদলে, পাশের দুটি মন্দিরের উচ্চতা কম আর তার পাশের দুটির আরও কম। মন্দিরগুলো উঁচু পিঁড়ার ঊপর আছে। দেবী দুর্গা আছেন, সঙ্গে কাত্যায়নী আর

ইন্দ্রাণী। নিচে এক ঋষিমশাইও আছেন বটে, কিন্তু গোটা ছবিতে বিদেশি ট্যাপেস্ট্রির ভাব স্পষ্ট। আছে ডানা মেলা অ্যাঞ্জেলরা, আছে ইউনিকর্ন, আছে উপর থেকে ঝোলা শ্যান্ডেলিয়র, মাথায় আছে ব্রিটিশ সিংহ আর তলায় চাবুক হাতে সাহেব আর দুই সিপাই। অ্যাঞ্জেলরা ঠিক তেমনি হাত জোড় করে বসে, যেমনটি চার্চে থাকে। দেবীর সিংহ অবশ্য বৈষ্ণবদের মতাবলম্বী ঘোড়ামুখো। দেবীর তলায় শিব বসে রয়েছেন। শিবের পরে প্ল্যাটফর্মের গা বেয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই সিঁড়িতে প্রথমে দেবীর নাম, পরে খোদাই ছবি নিয়ে শিল্পীর বক্তব্য।
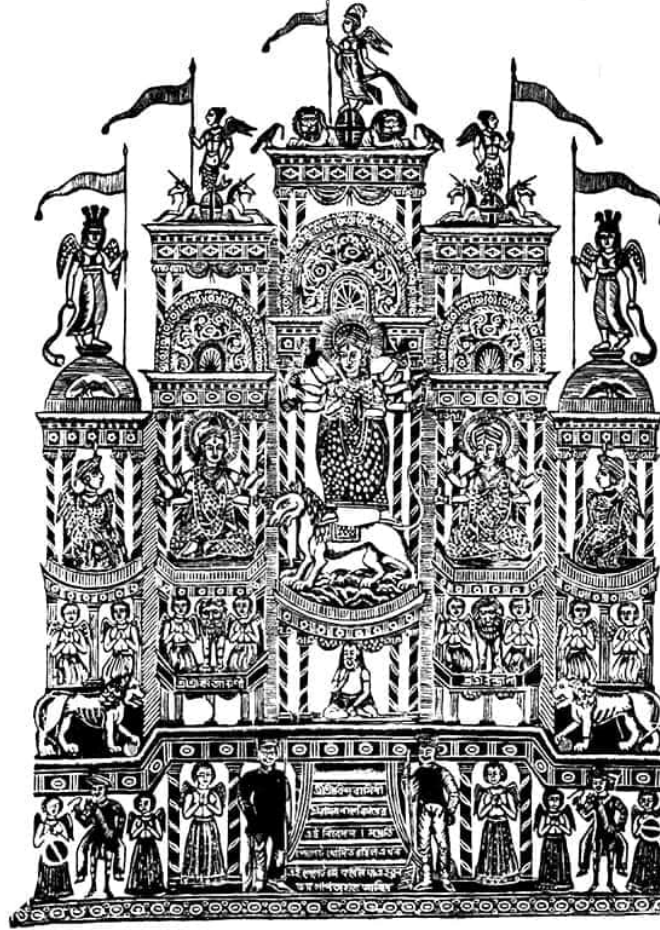
শ্রী শ্রী বিন্দুবাসিনী

শ্রী রামধন স্বর্ণকারের

এই নিবেদন। সম্প্রতি

পেলেট খোদিত রহিল এখন

এই পেলেট যে করিবে মাত্র হরণ

ভয় পাপ তাহারে আসিবে।

সুকুমার সেন তাঁর “বটতলার ছাপা ও ছবি” বইতে লিখেছেন, “ছবি খুঁটিয়ে দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে এই ছবির পরিকল্পনায় সেকালের (অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর) চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের সবচেয়ে খ্যাতিমান দেশী বিদেশী দু ধরনের ছবি আঁকতে দক্ষ রামধন স্বর্ণকারের মৌলিক শিল্পচিন্তার পরিচয় রয়ে গেছে। মহাদেবীকে তিনি দেখাতে

চেয়েছিলেন সমসাময়িক ভাবনায় ব্রিটিশ সিংহবাহিনী রূপে। তুলনা করতে ইচ্ছে হয়, স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা ছবি আঁকার প্রচেষ্টার সঙ্গে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার চিত্রশিল্পীদের আঁকা সবচেয়ে বিশিষ্ট মৌলিক প্রচেষ্টার নিদর্শন বলে রামধন স্বর্ণকারের এই ছবিটির সমধিক মূল্য আছে।”

৭.৬ লোহাপটির বারোয়ারি সঙ— কলকাতাতে সঙের আবির্ভাব হয় বাবু-কালচারের সময় থেকে। নানারকম পোশাক ও রঙিন সাজে সেজে, গান, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টি করা হত হাস্যরস। মূলত গ্রামীণ লোকেদের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের হাত ধরে এটি চলে আসে শহরাঞ্চলে। অন্যান্য পূজা-পার্বণে সং দেখা গেলেও, গাজন উপলক্ষ্যে এদের সবথেকে বেশি দেখা যেত। প্রথমদিকে প্রান্তিক সমাজের সংস্কৃতি বলে, শহুরে সমাজ এটাকে নিচু চোখে দেখত। পরে ফুর্তিবাজ জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সং-সংস্কৃতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সেই সময়ে কলকাতার এলাকা বা পাড়াগুলোয় বসতি গড়ে উঠেছিল একই জীবিকা বা একই জাতের মানুষের একত্রিত হওয়ার ভিত্তিতে। যেমন ডোমতলা, কুমোরটুলি, বেনিয়াটোলা, আহিরিটোলা, কাঁসারিপাড়া, জেলেপাড়া, লোহাপটি ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতক থেকেই কলকাতা ও হাওড়াতে এই পাড়াগুলো থেকে, অঞ্চলভিত্তিক সঙের শোভাযাত্রা বেরোতে থাকে। কাঁসারিপাড়া অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি তারকনাথ প্রামাণিক, এবং হিন্দু পেট্রিয়ট-এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের পরিচালনায় বের হত কাঁসারিপাড়ার প্রসিদ্ধ সং যাত্রা, প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন। পরবর্তীকালে অবশ্য আহিরিটোলা, খিদিরপুর, বেনিয়াপুকুর, তালতলা, জেলেপাড়া প্রভৃতি এলাকা থেকেও শুরু হয় সং বেরোনো। হাওড়ার শিবপুর, খুরুট, মেদিনীপুর, ঢাকা, হাওড়ার রাধাপুর, শ্রীরামপুর থেকেও বের হত এই সং। বিচিত্র সঙের ফিরিস্তি দিয়েছেন হুতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহ। হুতোমের লেখা পড়লে মনে হয় সেকালের কলকাতার সংস্কৃতি যেন সঙের রং ঢং-এ মেতে উঠেছে। রঙ্গময় এই বঙ্গদেশে উনিশ শতকে সঙের মিছিলে, এবং সঙের গানে রস পরিহাস ও কৌতুকে সমাজের অসংগতিকে তুলে ধরা ছিল মুখ্য কথা।

সেই দিনে কলকাতার গলি ও রাজপথের বাড়ির বারান্দায়, ছাদে ও জানালায় আবালবৃদ্ধবনিতা সঙের শোভাযাত্রা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। কলকাতা হয়ে উঠত মিলনমেলার নামান্তর। গৃহস্থঘরে অতিথির জন্য তৈরি হত শরবত। থাকত পান তামাকের ব্যবস্থা। দর্শকের জন্য পথের উপর শামিয়ানা টাঙানো হত।

১৯১৭ সালে চুরি গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। জেলেপাড়ায় রচিত হল –

"বিদ্যার মন্দিরে এ সিঁদ কেটেছে কোন চোরে

সখীরা নেকী নাকি পড়ল ফাঁকি

কেউ দেখেনি ঘুমের ঘোরে

বিদ্যা সর্ববিদ্যা অধিকারী

দেবের প্রসাদে গুমোর গো ভারী

বিদ্যা নিত্য পূজে আশুতোষে"

ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষক বাঙালি বাবুদের উদ্দেশ্যে লেখা-

"ডাণ্ডা ধরে গাধা পিটলে

ঘোড়া কভু হয় না

ধরে যখন কান মলা দেয়

তখন বাঁকা থাকতে পারে না।"

তথাকথিত ইঙ্গবঙ্গ যুবককে নিয়ে লেখা সঙের গান —

"এখন ছেলেরা এক নতুন টাইপ

চোদ্দ না পেরতে পাকা রাইপ

মুখে আগুন ঢুকিয়ে পাইপ

একমাত্র life ধারণ wife এর চরণ কর্ত্তে ধ্যান

এরা নতুন অর্থ করেন গীতার

ভুল ধরেন পরম পিতার

নৈলে কি তার trial বিনা in হয়।”

হাসির, হাসানোর নানা রং ঢং দেখিয়ে সং ছড়া কাটত —

“হাসি হাসব না তো কি

হাসির বায়না নিয়েছি

হাসি ষোল টাকা মণ

হাসি মাঝারি রকম

হাসি বিবিয়ানা জানে

হাসি গুড়ুক তামাক টানে

হাসি প্যরা গুড়ের সেরা

হাসি হুজুর করে জেরা।”

তৎকালীন বাঙালি সমাজে বছরভর যেসব ঘটনা, দৃশ্য বা কথা দাগ কেটেছে, তা আলোকিত হত সঙের ছড়ায় আর গানে। এরকম তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি বিদ্রুপ করার জন্য একটা সামাজিক ঝড় ওঠে, এবং এই সং-সংস্কৃতিকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপে এবং কলকাতাতে প্লেগের মহামারির জন্য, এই সং-যাত্রা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে, ১৯৯৩ সালে আবার নতুন উদ্যোগে জেলেপাড়ার সং শুরু হলেও, সেটা আর আগের মতো প্রসিদ্ধি পায়নি, কারণ সময়টা বদলে যেতে শুরু করেছিল অনেকটাই। বিশ্বায়নের যুগে, এই সং-সংস্কৃতির আর-কোনো চাহিদা তৈরি হয়নি।

এই সং-সংস্কৃতি কলকাতা থেকে প্রায় হারিয়ে গেলেও, তাদের ছড়া-গানের এবং যাত্রার নামের অনেকগুলো কথা এখনও আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন-

‘এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই’,

‘বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন’,

‘ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে’,

‘খ্যাঁদা পুত্রের নাম পদ্মলোচন’,

‘মদ খাওয়া বড়ো দায় জাত থাকার কী উপায়’।

এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কলকাতা তথা জেলেপাড়ার সং আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আটের দশকে ‘কলিকাতা কৈবর্ত সমিতি’ আবার নতুনভাবে উপস্থাপিত করে জেলেপাড়ার সংকে। প্রতিবাদ জানানো হয় দাঙ্গা লাগিয়ে বস্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। ১৯৯৩ সালে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উদ্যোগে আবার শুরু হয় জেলেপাড়ার সং

সমিতি সংঘ, মিছিল বের করেন শঙ্করপ্রসাদ দে। এঁদেরই মতো কিছু মানুষের উদ্যোগে আজও বেঁচে আছে বাংলা লোকবিনোদনের এই মৃতপ্রায় মাধ্যমটি। সঙ্গে মাদাম বেলানসের তুলিতে সেকালের সং।

অষ্টম দৃশ্য : অন্ধকূপের বাসিন্দা

৮.১ জোড়াবাগান— জোড়াবাগান পুরোনো সুতানুটি জনপদের অংশ ছিল। ১৬৯০ সালে এখানকার সুতানুটির ঘাটে জোব চার্নক পদার্পণ করেছিলেন। বেনিয়াটোলা ও শোভাবাজার ঘাটের মাঝে মোহনটনের সেই ঘাটটি এখন আর নেই। এখানে একটি বিরাট গাছের তলায় জোব চার্নক বিশ্রাম করেছিলেন বলে মনে করা হয়। জোড়াবাগান অঞ্চলের নিমতলা মহাশ্মশান কলকাতার অন্যতম প্রধান শ্মশানঘাট।

নবম দৃশ্য : রঙ্গালয়

৯.১ রঙ্গালয়— ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। বাগবাজারের কতিপয় নাট্যামোদী যুবক সেদিন এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন। বাংলা থিয়েটারের সেদিন থেকে শুরু হল এক নতুন গন্তব্যে পথচলা। পেশাদার রঙ্গালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল বাংলা থিয়েটার।

কলকাতায় বাংলা নাট্যশালার জন্ম হয়েছিল ১৭৯৫ সালে। সে নাট্যশালার জন্ম দিয়েছিলেন একজন রাশিয়ান মানুষ, হেরাসিম লেবেদেফ। যিনি পর্যটক হিসেবে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৫ সালে। সদ্য শতবর্ষ অতিক্রান্ত কলকাতা শহরবাসীকে তিনি উপহার দিলেন বাংলা নাটক। তিনি দুটো বিদেশি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। একটা The disguise, বাংলা রূপান্তরে নাম হয়েছিল 'কাল্পনিক সংবদোল'। আর-একটি Love is the best doctor। প্রথম নাটকটির দুটি অভিনয় হয়েছিল বলে শোনা যায়। সে থিয়েটার টিকিট কেটে দেখতে হয়েছিল। এবং তাতে বাঙালিরাই অভিনয় করেছিলেন, এবং নাটকের স্ত্রী-চরিত্রেও অভিনয় করেছিলেন বাঙালি মহিলারাই। এই নাট্যশালার ঠিকানা ছিল ২৫ নম্বর ডোমতলা, আজ যেটা এজরা স্ট্রিট। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছিলেন গোলোকনাথ দাস নামে এক বাঙালি। ভাবা যায়, কলকাতার বুকে বাংলা নাটকের জয়যাত্রা শুরু হল যার হাত ধরে, তিনি বাঙালি তো ননই, ভারতীয়ও নন! সেসময় কলকাতায় থিয়েটার বলতে ছিল ব্রিটিশদের থিয়েটার। মনে করা হয় ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই লেবেদেফের থিয়েটারে আগুন লাগানো হয়েছিল। এই অগ্নিকাণ্ডে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়, প্রচুর দেনা হয়ে যায় তাঁর, শেষে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরুতেই ঘটে যবনিকাপতন।

বাঙালির উদ্যোগে তৈরি প্রথম নাট্যশালা ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। তাঁর নারকেলডাঙা বাগানবাড়িতে ছিল এই রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু সেখানে কোনও বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি। ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়। তাঁর পরিচালিত এই বিদ্যাসুন্দর নাটকে স্ত্রী-চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করেছিলেন।

লেবেদেফের পর অনেকদিন বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছে ধনী ব্যক্তিদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। এসব থিয়েটারের দর্শকরা ছিলেন প্রায় সকলেই অভিজাত শ্রেণির এবং সকলেই আমন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনই এক অভিজ্ঞতার পর কিছু মধ্যবিত্ত যুবক স্থির করেন, থিয়েটারকে আর ধনীগৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পৌঁছে দিতে হবে সকলের মধ্যে। তাঁদের একজন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি পরামর্শ দিলেন, মাইকেলের (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) কথামতো সবাই মিলে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলার চেষ্টা করো। তাঁরা প্রথমেই যান পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের সুযোগ্য সন্তান নাট্যামোদী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটার টেগোর ক্যাসেলে ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম মঞ্চস্থ হয়েছে। কিন্তু চাঁদার কথা শুনে চাঁদাসংগ্রহকারীদের উদ্দেশে কিছু ব্যঙ্গোক্তি করলেন যতীন্দ্রমোহনের ভগ্নীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁদের। আরও কয়েকজন ধনী ব্যক্তির কাছে যাওয়া হল চাঁদার জন্য। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হল না। শেষে ঠিক হল বড়োলোকদের কাছে আর হাত না পেতে বরং পাড়ার গৃহস্থদের কাছে যাওয়াই ভালো। আর পাশাপাশি উদ্যোক্তারা ঠিক করলেন নিজেরাই সাধ্যমতো টাকা দিয়ে তাঁদের স্বপ্নটাকে সাকার করে তুলবেন। এইভাবে সর্বসাকুল্যে আদায় হল মাত্র আড়াইশো টাকা।

অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে দৃশ্যপট আঁকা আর প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ যখন অর্ধেক এগিয়েছে, তখন খবর পাওয়া গেল কে যেন এইসব আগুনে পুড়িয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে। তখন ধর্মদাস সুরের পরামর্শে সবকিছু খুলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। ঠিক হল রাজেন্দ্রনাথের বাড়ির উঠোনেই মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হবে। এই সময় চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে। তবে সে নাটকে কাটাছেঁড়া করেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র। তা বিশেষ মনঃপূত না হলেও মেনে নিয়েছিলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বাগবাজারও সেই সময়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল একই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য। ১৮৭২ সালের ১১ই মে রাজেন্দ্রনাথের বাড়ির উঠোনে অভিনীত হল লীলাবতী। সেদিন বৃষ্টিতে সবকিছু ভিজে গেলেও ভেজা চেয়ারে বসেই দর্শকরা লীলাবতীর অভিনয় দেখলেন। যদিও নিমন্ত্রিত ছাড়া খুব কম সংখ্যক মানুষই লীলাবতী দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে যান। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র খুব খুশি হয়ে গিরিশচন্দ্রকে জানান, তাঁদের অভিনয়ের সাথে চুঁচুড়ার অভিনয়ের কোনও তুলনাই হয় না, তিনি চিঠি লিখবেন 'দুয়ো বঙ্কিম' বলে। পরপর তিন শনিবার একই জায়গাতে 'লীলাবতী' অভিনয় হয়েছিল। সেই সময় বাগবাজারের দলের নাম ছিল, শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। 'লীলাবতী' অভিনয়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এতে উৎসাহ আরও বেড়ে গেল সকলের। শুরু হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা। এবার স্থির হল, টিকিট বিক্রি করে তৈরি হবে স্থায়ী নাট্যশালা। আর নতুন নাট্যশালার নাম হবে, ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু গিরিশ ঘোষ বেঁকে বসলেন। তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ছাড়া সাধারণের কাছে টিকিট বিক্রি করার পক্ষপাতী নন। শেষে 'নীলদর্পণ' নাটকের মহলা শুরু হল ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়ির দোতলার হলঘর আর একটা ছোটো কুঠুরিতে। একটা টেবিল হারমোনিয়ামও দিলেন তিনি। অবশেষে কতিপয় জেদি বাগবাজারের যুবকের অদম্য ইচ্ছে পূরণ হল। চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোন ভাড়া নেওয়া হল মাসিক চল্লিশ টাকার বিনিময়ে। যে বাড়িটা আজ রবীন্দ্র সরণিতে ঘড়িওয়ালা মল্লিক বাড়ি নামে পরিচিত। সেখানেই মঞ্চ তৈরি হল। বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল নীলদর্পণ নাটকের। টিকিট বিক্রি করে

উপার্জন হয়েছিল দুশো টাকা। এ নাটকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী একাই চারটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ চন্দ্র কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ও মহেন্দ্রলাল বসু। এভাবেই শুরু হয়েছিল মৌলিক বাংলা নাটকের পেশাদার অভিনয়ের জয়যাত্রা।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। তিনি 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়কে সমালোচনা করে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় দুটি চিঠি (১৯ এবং ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭২) লেখেন। এ ছাড়াও তিনি অভিনেতাদের নামে শ্লেষাত্মক ছড়াও লিখেছিলেন।

৯.২ বিদ্যাসুন্দর— বিদ্যাসুন্দর মধ্যযুগের একখানা প্রণয়কাব্য; বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী এর উপজীব্য। কাব্যটির উৎস এগারো শতকের সংস্কৃত কবি বিলহনের চৌরপঞ্চাশিকা। রূপবান ও গুণবান রাজকুমার সুন্দর কালিকাদেবীকে আরাধনায় তুষ্ট করে সুন্দরী বিদুষী রাজকন্যা বিদ্যার পাণিলাভের বর পায়। পরে দেবীপ্রদত্ত শুকপাখি নিয়ে সুন্দর বিদ্যার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হয়। রাজপ্রাসাদের মালিনীর মাধ্যমে চিত্র ও প্রণয়লিপি প্রেরণ করে সুন্দর বিদ্যাকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের প্রণয় ঘটে। পরে সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার শয়নগৃহে প্রবেশ করে এবং তাদের মিলন হয়। ক্রমে বিদ্যার শরীরে গর্ভলক্ষণ ফুটে উঠলে রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং সুন্দরকে শূলদণ্ডের আদেশ দেন। সুন্দর তখন স্তব দ্বারা দেবীকে পুনরায় তুষ্ট করে প্রাণে রক্ষা পায় এবং বিদ্যাকে লাভ করে। বিদ্যা ও সুন্দরের এই প্রেমকাহিনি অবলম্বনে প্রথমে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন ষোলো শতকের কবি শাহ বিরিদ খান ও দ্বিজ শ্রীধর। পরে কৃষ্ণরাম, বলরাম, কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রমুখ এ ধারায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হন। তবে এঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ।

৯.৩ এম্পায়ার থিয়েটার— ১৯০৮-০৯ সালে অপেরা হাউজ হিসেবে পথ চলা শুরু করেছিল রক্সি। কিন্তু চারের দশকের শুরুতেই তার রূপ পরিবর্তন করা হয় সিনেমা হলে। রক্সিতে প্রদর্শিত প্রথম ছবি ছিল অশোককুমার অভিনীত 'নয়া সংসার'। ১৯৪৩ সালের ছবি 'কিসমৎ' ১৮৬ সপ্তাহ ধরে চলেছিল রক্সিতে। এ ছবির প্রধান চরিত্রেও ছিলেন তৎকালীন সুপারস্টার অশোককুমার এবং এই ছবি দেখতে গিয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। চৌরঙ্গী প্লেস-এর ৪-বি প্লটের উপর তৈরি করা হয়েছিল রক্সি হলটি। তখন তার নাম ছিল 'এম্পায়ার থিয়েটার'। বর্তমানে রক্সি ও তার পাশের ৪-এ, দুটো প্লটের মালিকানা রয়েছে 'বেঙ্গল প্রপারটিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর হাতে।

৯.৪ কনসার্ট— নাটক শুরুর আগে নানান বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত, যতক্ষণ না থার্ড বেল পড়ে। একেই কনসার্ট বলা হত।

৯.৫ এঙ্কোর— অভিনয় নৃত্যগীত প্রভৃতি শিল্পকলা আবার দেখাবার বা শোনাবার জন্য অনুরোধ; আবার আবার; মূল ফরাসি উচ্চারণ অঁক্র। কিন্তু শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণ অনুসারে এনকোর বাংলায় প্রচলিত হয়েছে।

৯.৬ বিনোদিনী— ১৮৬৩ সালে জন্মের পর তাঁর ঠিকানা ছিল ১৫৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। মা-দিদিমার তত্ত্বাবধানে বড়ো হওয়া। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা ছিল তাঁদের। খোলার চালের বাড়ি, তারই দু-একটি ঘর আবার ভাড়া দেওয়া অন্নসংস্থানের জন্য। পুঁটি নামে ডাকত সবাই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটিকে। মা ভাই আর দিদিমাকে নিয়ে সংসার। ঘরভাড়া আর মা-দিদিমার সামান্য অলংকার, এই ছিল আয়ের পথ। দিদিমা তারই মধ্যে পুঁটির বিয়ে দিয়ে দিলেন তারই খেলার সাথির সঙ্গে। কিন্তু সে বিয়ে স্থায়ী হল না। পুঁটির স্বামীকে তার বাড়ির লোকেরা নিয়ে চলে গেল। পুঁটিকে ভরতি করা হল কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের অবৈতনিক স্কুলে— নাম লেখানো হল বিনোদিনী দাসী।

পুঁটি থেকে বিনোদিনীতে রূপান্তরিত হওয়া শুরু হল সেই মুহূর্ত থেকে। পড়াশোনাতে তার মেধার পরিচয় পাওয়া এক আশ্চর্য কথাই! পরিবেশ তো অনুকূল ছিল না। গানের গলাও ছিল অদ্ভুতরকমের ভালো। বিনোদিনীর বাড়িতে গঙ্গাবাই নামে এক গায়িকা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে। বয়সে বিনোদিনীর থেকে অনেক বড়ো। তাও বিনোদিনী তার সঙ্গে সই পাতাল, গোলাপফুল বলে ডাকত তাকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে না পেরে বিনোদিনীর মা দিদিমা এই গঙ্গাবাইয়ের কাছেই গান শিখতে দিলেন তাকে। আশ্চর্য দরদভরা কণ্ঠ, সুর লয় তালের জ্ঞান যেন এই মেয়ের সহজাত। অল্প কদিনেই সে আয়ত্ত করে নিল সুমধুর সব গান।

এদিকে গঙ্গাবাইয়ের ঘরে গানের আসর বসত প্রায়ই। আসতেন তখনকার সমাজের গানের সমঝদার জ্ঞানীগুণীরা। বিনোদিনীর এই গান গাইবার ক্ষমতা পালটে দিল তাঁর জীবন। দারিদ্র্যদোষ যেমন তাঁর জীবন পরিবর্তনের অন্যতম কারণ, আর-এক কারণ গঙ্গাবাই। তখনকার সমাজে আসরে গান গাইতেন বারাঙ্গনারাই। গঙ্গাবাইয়ের আসরে আসতেন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর ব্রজনাথ শেঠ। তাঁরা বিনোদিনীকে ভরতি করে দিলেন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে', দশ টাকা বেতনে। মহেন্দ্রলাল বসুর উপর তাঁকে শেখানোর ভার পড়ল। পরে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়- নাট্যজগতের এইসব দিকপালেরা তাঁর শিক্ষার ভার নিলেন। ১৮৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাত্র ১১ বছর বয়সে দু-চারটি মাত্র সংলাপের মাধ্যমে অভিনয় করলেন 'শত্রুসংহার' নাটকে। মাত করে দিলেন দর্শককুল ও নাট্যজগৎকে। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। পরের নাটকে নামলেন নায়িকার ভূমিকায়, বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও। (সেই সময়ে অভিজাত ঘরের মেয়েরা নাটক-যাত্রায় অংশগ্রহণ করতেন না, তাই থিয়েটারকে বারাঙ্গনাপল্লি থেকেই স্ত্রী-ভূমিকার জন্য মেয়ে জোগাড় করতে হত।) বিনোদিনী লিখেছেন, 'আমাকে সাজাতে বেশকারীর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, ছোট ছিলাম তো, কিন্তু সাজতে হত যুবতী।'

তারপর থেকেই অবিসংবাদিত নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ও প্রতিভাবলে স্বর্ণশিখরে আরোহণ। ১৮৭৫ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরোয়। বিনোদিনীই ছিলেন দলের প্রধান অভিনেত্রী। 'নীলদর্পণ' নাটক শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় আর-এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে 'বেঙ্গল' থিয়েটারে যোগ দিলেন। ১৯ মাস কাজ করেছিলেন এই দলে। এই সময়কালের অভিনয়ই তাঁকে থিয়েটারে উচ্চাসনে বসাল। তাঁর জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও রচিত হল এই সময়েই। ১৩ বছর বয়সকে একালে আমরা বলি 'টিন এজ', কিশোরী থেকে যুবতিতে রূপান্তরিত হবার প্রথম ধাপ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মনস্কতায় তিনি তখন পূর্ণযুবতি। গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী

বিনোদিনী অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ চরিত্রগুলিকে বোঝার ক্ষমতা যেমন সহজাত বুদ্ধিতে আত্মস্থ করেছিলেন, তেমন অভিনয়দক্ষতায় পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেইসব চরিত্রগুলিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রগুলিতে তিনিই অভিনয় করেছেন। তখন তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন শরচ্চন্দ্র ঘোষ। নিজেকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরার সুযোগ পেলেন এখানে, নাটক যে কেবল প্রমোদের উপকরণ নয় তা বুঝতে শিখলেন এখানেই। এই দলে নাটকের মহড়ায় আসতেন সমসাময়িক গুণীজনেরা। সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিনোদিনীকে যে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রমাণ তাঁর চরিত্রাভিনয়।

তাঁর বেঙ্গল থিয়েটার ছাড়ার কারণ ছিলেন গিরিশ ঘোষ। 'কপালকুণ্ডলা' নাটক দেখতে এলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক কেদারনাথ চৌধুরি, সঙ্গে গিরিশ ঘোষ। মুগ্ধ ও বিস্মিত গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীকে নিয়ে এলেন ন্যাশনাল থিয়েটারে, ১৮৭৭ সালে।

ন্যাশনাল থিয়েটারে আসার পর বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সর্বত্র তাঁর অভিনয়প্রতিভা স্বীকৃতি পায়। তিনি হয়ে উঠলেন নাট্যসম্রাজ্ঞী। 'মৃণালিনী' নাটকে 'মনোরমা' চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই। আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।' ন্যাশনাল থিয়েটারে বিনোদের শিক্ষাগুরু হলেন এবার স্বয়ং গিরিশ ঘোষ। বিনোদের বাড়িতে আলোচনার আসরে আসতেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র। আলোচিত হত বিলেতের অভিনেত্রীদের অভিনয়কৌশল থেকে শেক্সপিয়র-মিলটন-বায়রন-পোপ প্রমুখ কবিদের কাব্য।

উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিনোদিনীর আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল টানা বারো বছর ধরে। তারপর কালের করাল দংশন পড়তে আরম্ভ করল বিনোদিনীর অভিনয়জীবনে। নানা কারণে অবস্থার বিপাকে পড়ে কেদারনাথ চৌধুরি ন্যাশনাল থিয়েটার বিক্রি করতে বাধ্য হন। দু-তিনবার হাতবদল হয়ে প্রতাপচাঁদ জহুরী কিনলেন ন্যাশনাল। গিরিশ ঘোষকে অধ্যক্ষ করা হয়। শুরু হয় আদ্যন্ত ব্যবসায়িক থিয়েটারের যুগ।

একবার পনেরো দিনের ছুটিতে কাশী গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিনোদিনী এক মাস অভিনয়ে যোগ দিতে পারেননি। সেই মাসের বেতন কেটে নেন প্রতাপচাঁদ। আত্মসম্মানী বিনোদিনী তখনই থিয়েটার ছেড়ে দিতে চাইলে গিরিশ ঘোষ ও অন্যরা নিজেদের থিয়েটার তৈরির কথা বলে তাঁকে শান্ত করেন। নিজেদের থিয়েটার তৈরি করার জন্য তাঁরা আশ্রয় করলেন গুর্মুখ রায় নামে এক ধনী যুবককে। বিনোদিনীকে পাওয়ার বিনিময়ে তিনি রাজি হন থিয়েটার গড়ার টাকা দিতে। গিরিশ ঘোষ ও অন্যান্যদের বারবার প্ররোচনায় এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন বিনোদিনী। বিডন স্ট্রিটে জমি নেওয়া হল। স্থির হয় 'বি থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রি হবে থিয়েটার। কিন্তু রেজিস্ট্রির পর বিনোদিনী জানলেন থিয়েটারের নাম হয়েছে 'স্টার থিয়েটার'। বারাঙ্গনার নামে থিয়েটার খুলতে রাজি হননি নাট্যজগতের মানুষেরাই।

১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে। সতীর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় সকলকে অভিভূত করে। ১৮৮৩ সালের শেষ পর্যন্ত গুর্মুখ স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'নলদময়ন্তী'-তে দময়ন্তী ও 'ধ্রুবচরিত্র'-তে সুরুচির ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আবারও প্রমাণ করল তাঁর অভিনয়দক্ষতা। কিন্তু আবার দুর্যোগের ঘনঘটা! অসুস্থ গুর্মুখ পরিবারের চাপে পড়ে স্টারের স্বত্ব বিক্রি করতে মনস্থ করেন। তিনি বিনোদিনীকে অংশীদার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বারাঙ্গনার অধীনে কাজ করতে আপত্তি উঠল নাট্যসমাজ থেকেই! গিরিশ বিনোদিনী ও তাঁর মাকে স্বত্ব গ্রহণ না

করতে রাজি করালেন। স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন অমৃতলাল মি, দাশুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু।

স্টারে তখন অভিনীত হচ্ছে 'চৈতন্যলীলা'। বিপুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই নাটকটি ১৮৮৪-র ২রা আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন "আসল নকল এক দেখলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে গ্লানিহীন, কলুষমুক্ত হলেন বারাঙ্গনা, সঙ্গে বাংলার রঙ্গালয়ও অশুচিমুক্ত হল। স্টারে বিনোদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'বিল্বমঙ্গলের' চিন্তামণি। সেই সময়েই সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে বিনোদিনীর বিরোধ আরম্ভ হয়। অনেকসময় স্টারের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা মুখ ফুটে বলে ফেলতেন— তাই বিরোধ। সহকর্মীরা এটাকে বারাঙ্গনার ধৃষ্টতা বলে মনে করতেন। গিরিশ ঘোষ এসব ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ ভাব দেখাতেন। এই অপমান বিনোদ কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ১৮৮৭-র ১লা জানুয়ারি ছেড়ে দিলেন থিয়েটার। তাঁর অভিনীত শেষ নাটক 'বেল্লিক বাজার'।

বিনোদিনী লিখেছেন, "থিয়েটার ভালোবাসিতাম, তাই কার্য করিতাম, কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই সুযোগ বুঝিয়া অবসর বুঝিয়া লইলাম।বিনোদিনীর ভাষা লক্ষ করার মতো! কতটুকুই বা পড়াশোনা করেছিলেন তিনি! নিজের বারাঙ্গনা পরিচয়কে কোনোদিন তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু মর্যাদাহীন জীবনকে সম্মানের শিখরে নেবার সাধনা তিনি করেছিলেন তাঁর সারস্বত সম্পদের নৈবেদ্য সাজিয়ে। লিখেছিলেন দুটি আত্মজীবনীমূলক বই- 'আমার কথা', 'আমার অভিনেত্রী জীবন'। যদিও দ্বিতীয়টি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর এই আত্মজীবনীমূলক লেখা তৎকালীন বাংলার সমাজ ও বাংলা থিয়েটারের এক ঐতিহাসিক দলিল- যার ভাষাও ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। তাঁর রচিত দুটি কবিতার বই—'বাসনা' ও 'কনকনলিনী'। তাঁর সময়েই বাংলা রঙ্গজগৎও রূপান্তরিত হয়েছিল মুক্তমঞ্চের যাত্রা ঢং-এর অভিনয় থেকে মঞ্চে পর্দা সহ ইউরোপিয়ান বৈশিষ্ট্যের অভিনয়ের দিকে। বিনোদিনীই ভারতীয় বা দেশজ সাজসজ্জার সঙ্গে ইউরোপীয় সাজসজ্জার (make up) সংমিশ্রণ করেন, যদিও তাঁর সামনে কোনও রোল মডেল ছিল না। Moon of The Star, Flower of the Native Stage, এইসব বিশেষণে ভূষিতা হয়েছিলেন তিনি। তবুও মাত্র ২৩ বছর বয়সে অভিনয়জীবনের মধ্যগগনে পৌঁছে তাঁকে ছাড়তে হল তাঁর ভালোবাসার পেশা ও জীবন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকটাই পর্দার আড়ালেই থেকে গেছে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসারের স্বপ্নও তিনি দেখতেন। সন্তান এসেছিল তাঁর কোলে, কিন্তু ১৯০৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর কন্যা মারা যায়। থিয়েটার থেকে বিদায় নেবার পর তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর প্রকৃত উপকারী বন্ধু ও ভালোবাসার জন রাঙাবাবুর কাছে। তিনিও পরপারে চলে গেলেন ১৯১২ সালে। সেই সময় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪২ সাল) ত্রিশ বৎসরব্যাপী জীবন কীভাবে কেটেছে ভালো জানা যায় না। সম্ভবত যে জায়গাকে ও যে পেশাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন, সেই জায়গায় যেখানে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে— সেখানেই ফিরে গেছিলেন পেটের দায়ে! মাঝে মাঝে স্টার থিয়েটারেও গিয়ে বসে থাকতেন- হয়তো ভিক্ষেও করতে হয়েছে তাঁকে। ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু তাঁকে শান্তি দিল। তবুও এই কথা বলা যায়, লেডিজ গ্রিনরুমের আড়াল থেকে বেরিয়ে তিনি নারীর অধিকার দাবি করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

বাংলা বই

অজিত বসু, কলকাতার রাজপথ, আনন্দ পাবলিশার্স

অঞ্জন মিত্র, কলকাতা ও দুর্গাপুজো, আনন্দ পাবলিশার্স

অতুল সুর, ক ল কা তা, সৃষ্টি প্রকাশন

অমৃতলাল বসু, রসরাজের রসকথন, সংবাদ

ইন্দ্রমিত্র, সাজঘর, ত্রিবেণী

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীঘাট ইতিবৃত্ত, পরশপাথর

কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা (অরুণ নাগ সম্পাদিত), সুবর্ণরেখা

ডঃ সুকুমার সেন, বটতলার ছাপা ও ছবি, আনন্দ পাবলিশার্স

তারাপদ সাঁতরা, কীর্তিবাস কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

তারাপদ সাঁতরা, কলকাতার মন্দির মসজিদ স্থাপত্য অলঙ্করণ রূপান্তর, আনন্দ পাবলিশার্স

দেবাশিস বসু (সম্পাদিত), কলকাতার পুরাকথা, পুস্তক বিপণি

নকুল চট্টোপাধ্যায়, তিন শতকের কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ

নিখিল সুর, সায়েবমেম সমাচার, আনন্দ পাবলিশার্স

পূর্ণেন্দু পত্রী, পুরোনো কলকাতার কথাচিত্র, দে’জ পাবলিশিং

পূর্ণেন্দু পত্রী, এক যে ছিল কলকাতা, প্রতিক্ষণ

পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার গল্পসল্প, দে’জ পাবলিশিং,

পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার প্রথম, দে’জ পাবলিশিং,

পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার রাজকাহিনী, দে’জ পাবলিশিং,

পূর্ণেন্দু পত্রী, কী করে কলকাতা হলো, আনন্দ পাবলিশার্স

পূর্ণেন্দু পত্রী, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

পূর্ণেন্দু পত্রী, জোব চার্ণক যে কলকাতায় এসেছিলেন, এ সি সরকার

পূর্ণেন্দু পত্রী, পুরনো কলকাতার পড়াশুনো, দে’জ পাবলিশিং

প্রাণতোষ ঘটক, কলকাতার পথঘাট, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

বিকাশ ভট্টাচার্য, পুজোর কলকাতা, সূত্রধর

বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রকাশ ভবন

বিশ্বনাথ জোয়ারদার, অন্য কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, মহেন্দ্র পাব্লিশিং কমিটি

মেঘনাদ গুপ্ত, রাতের কলকাতা, উর্বী প্রকাশন

রথীন মিত্র, কলকাতা : একাল ও সেকাল, আনন্দ পাবলিশার্স

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কলকাতার ফেরিওয়ালার ডাক ও রাস্তার আওয়াজ, আনন্দ পাবলিশার্স

রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, ২ খণ্ড, সুবর্ণরেখা

শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ

শ্রীপান্থ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

শ্রীপান্থ, বটতলা, আনন্দ পাবলিশার্স

শ্রীপান্থ, মোহান্ত এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ পাবলিশার্স

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার রাস্তা হলো কেমন করে, দে'জ পাবলিশিং

সুকুমার সিকদার, হতভাগার কলিকাতা, অনুষ্টুপ

সুকুমার সেন, কলিকাতার কাহিনী (দুই খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতার কত রূপ, কারিগর

সুনীল দাস, উপহাসের কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশন

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ

সৌমিত্র শ্রীমানী সম্পাদিত, কলিকাতা কলকাতা, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ

হরিপদ ভৌমিক, নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা, পারুল প্রকাশনী

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, পি এম বাগচি

English Books

A. P. Benthall, The Trees of Calcutta and its neighbourhood, Thacker Spink & Co, London

Ashit Paul, Woodcut Prints of 19th Century Calcutta, Seagull

Fanny Parkes, Begums, Thugs and Englishmen ; Penguin Publishers

Geoffrey Moorhouse, Calcutta, Faber and Faber

Joe Winter, Calcutta Song, Sahitya Sansad

Keith Humphrey, Calcutta Revisited, Grosvenor House Pub. Ltd

Keith Humphrey, Walking Calcutta, Grosvenor House Pub. Ltd

Krishna Dutta, Calcutta : A Cultural and Literary History, Interlink Books

Nisith Ranjan Ray, Calcutta : The Profile of a city, KPB

P. Thankappam Nair, British Beginnings in Bengal, Firma KLM Private Limited, Calcutta

P. Thankappam Nair, Streets of Calcutta, Firma KLM Private Limited, Calcutta

Pat Barr, The Memsahibs : The Women of the Victorian India, Allied Publishers

Prosenjit Dasgupta, 10 Walks in Calcutta, Harper-Collins

Ranabir Roychaudhury, A City in the Making, Niyogi Books

Sukanta Chaudhuri, Calcutta : The Living City (2 Volumes) ; OUP

Sumanta Banerjee, The Wicked City, Crime and Punishment in Collonial Calcutta, Orient Longman

W H Carey, The Good Old Days of Honorable John Company, Riddhi Publication

সম্পাদক পরিচিতি

কৌশিক মজুমদোরর জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৯৮১, কলকাতায়। কৃতি ছাত্র। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পি. এইচ. ডি. তে সেরা ছাত্রের স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। নতুন প্রজাতির এক ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কারক, যার নাম তাঁর নামে Bacillus sp. KM5 করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়ায় বৈজ্ঞানিক পদে কর্মরত।

কেতাবি পড়াশুনোর বাইরে নানা বিষয়ে পড়াশুনো ও লেখালেখি তাঁর শখ। দেশে বিদেশে গবেষণাপত্রে নানা প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি নিয়মিত লেখালেখি করেন নানা জনপ্রিয় দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায়। জার্মানী থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ Discovering Friendly Bacteria : A Quest (২০১২)। ভারতীয় ভাষায় প্রথম কমিকসের বিস্তারিত ইতিহাস 'কমিকস ইতিবৃত্ত'(২০১৫), শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা বাংলায় গবেষণা গ্রন্থ 'হোমসনামা' (২০১৮), জেনারেল নলেজ বিষয়ক 'মগজাস্ত্র' (২০১৮), জেমস বন্ডকে নিয়ে 'জেমস বন্ড জমজমাট' (২০১৯), ফেলুদোক নিয়ে গবেষণামূলক উপন্যাস 'তোপসের নোটবুক' (২০১৯) এবং মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সংকলন 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে' (২০১৯) সুধীজনের প্রশংসাধন্য। সম্পাদনা করেছেন 'সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১ম ২০১৭, ২য় ২০১৮) এবং 'ফুড কাহিনি' (২০১৯)।